সোচ্চার উচ্চারণ

আবু জাফর শামসুদ্দীন

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৭৭

অরিজিৎ কুমার, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা ৪ প্রকাশিত
বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত, বাণীশ্রী, ১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা ৬ মুদ্রিত
ও দীনেশ বিশ্বাস, ১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন, কলিকাতা ৯ গ্রন্থিত।

সূচীপত্র

রাষ্ট্র ও ভাষা

রাষ্ট্র ও ভাষা অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে ভাষার কি সম্পর্ক এ নিয়ে আলোচনার পূর্বে উভয়ের উৎপত্তির ইতিহাস এবং মানব সমাজের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক তৎসম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঐতিহাসিক। মানব সমাজ তার ক্রমবিকাশের কোন এক অধ্যায়ে এসে রাষ্ট্র স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেছে অধিকতর বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার জন্যে। বস্তুতঃ রাষ্ট্র সমাজের বিশেষ কোন অর্থনৈতিক অবস্থার বহিরঙ্গ মাত্র। কাজেই দেখা যায় যুগে যুগে রাষ্ট্রীয় সংস্থা, রাষ্ট্রীয় রূপ প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে—যেমন শাখায় শাখায় প্রতি বছর ঝরা পাতার স্থান অধিকার করে নূতন সবুজ পাতা! সম্রাট দারায়ুস বা সেকান্দর যে রাষ্ট্র শাসন করতেন আজকের রাষ্ট্র তা নয়। সেকালের বড় বড় রাষ্ট্র প্রায় সবই দাস প্রথায় উৎপাদন ভিত্তিক ছিল। দাস সংগ্রহ, লুণ্ঠন প্রভৃতির জন্য দেশ জয় তখন অপরিহার্য ছিল। এমন কি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ের রাষ্ট্রীয় রূপও আজ আর কোন সভ্য দেশে পরিদৃষ্ট হয় না। যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বর্তমান জাতীয়তাবাদী পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি। পুঁজিবাদ শোষণের উপর নির্ভরশীল বলে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তৈরী শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের লাভজনক ক্ষেত্র অধিকারের জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতার দরুন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দেশে দেশে সংগ্রাম অপরিহার্য। এ-সংগ্রাম কখনও যুদ্ধ, কখনও চাপ, আবার কখনও বা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের শাসক শোষক শ্রেণীকে লাভের অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করার রূপ নেয়। মোট কথা, আমরা বর্তমানে যে অর্থে রাষ্ট্রকে বুঝি তদর্থে মানব সমাজে রাষ্ট্রের উৎপত্তিকাল সেদিনের বলা চলে। মাতৃসত্তা, জন ও পিতৃসত্তা প্রভৃতি বহু যুগ অতিক্রম করার পর রাষ্ট্রীয় যুগের সৃষ্টি।

কিন্তু ভাষার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা কঠিন। ভারতীয় মতে 'কথা'

ঐশ্বরিক। বেদ ঐশ্বরিক কথার সমষ্টি। বেদের এক অর্থ কথাও বটে। কোরান শরিফও বলে যে সৃষ্টির কাজে স্বয়ং আল্লাহ্‌কেও অর্থবোধক কথার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। আল্লাহ্‌ যখন ভাবলেন মাখলুকাত সৃষ্টি করা প্রয়োজন তখন বল্‌লেন: 'কুন' অর্থাৎ 'হও'। এ-কথা বলার পরই সৃজন শুরু হলো।

এ-থেকে অনুমিত হয় যে ভাষার উৎপত্তি মানব জাতির উৎপত্তির সমসাময়িক অর্থাৎ অন্ততঃ দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মানুষ যেদিন পারস্পরিক সহযোগিতা করতে শিখলো অর্থাৎ সমাজ গড়ে উঠতে লাগলো ভাষারও উৎপত্তি হলো সেদিন। পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের জন্য ধ্বনির প্রয়োজন হয়েছে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি এবং বৃহত্তর সামাজিক জীবন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনির সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হয়েছে এবং তাই ক্রমে কথিত থেকে লিখিত ভাষায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন আরম্ভ করারও বহু পরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। ভাষা বিশেষ কোন উৎপাদন ব্যবস্থাধীনে জন্মলাভ করে নি। পক্ষান্তরে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় রূপেরও আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে ভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষের চিন্তাশক্তি ও ভাষাকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা তো দূরের কথা, ভাবাও যায় না। ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে চিন্তা করাই সম্ভব নয়। ভাষা ব্যতিরেকে ভাবের সৃষ্টিই হতে পারে না—তার প্রকাশ তো দূরের কথা।

ভাষার ইতিহাস তাই সম্পূর্ণ মানব জাতির ইতিহাস। লুপ্ত অবলুপ্ত সব কিছু মিলিয়ে সেই ইতিহাস। সন তারিখের ইতিহাসের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে এর আরম্ভ। ভাষার মূল কাজ ভাবের আদান প্রদান। এই ভাবের আদান প্রদান থেকেই দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সৃষ্টি—নূতন নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা, নূতন নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং তার প্রতীক নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের জন্ম। রাষ্ট্রীয় শক্তি বা রাষ্ট্রের উত্থান পতনের সঙ্গে ভাষার ভাগ্য যুক্ত নয়। ভাষা রাষ্ট্রের তোয়াক্কা রাখে না, উৎপাদন ব্যবস্থারও তোয়াক্কা রাখে না—রাষ্ট্রকেই বরং ভাষার তোয়াক্কা রেখে চলতে হয়।

জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি সেদিনের। তার পূর্বে কতকটা "জোর যার মুলুক তার" নিয়মে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় উৎপাদনভিত্তিক রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। একটি রাষ্ট্রের অধীনে তখন বহু জাতি বাস করতো, বহু দেশ শাসিত হতো। কিন্তু সে দিনের রাষ্ট্রশক্তিও কোন জাতির ভাষা ধ্বংস করতে পারে নি। কাজেই ভাষার স্থান ও রাষ্ট্রের স্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। একে অপরের স্থান অধিকার করতে সমর্থ নয়। ভাষা কোন বিশেষ শ্রেণীরও নয়। দীন-দুঃখী থেকে আরম্ভ করে রাজা-মহারাজা পর্যন্ত ভাষার উপর সকলেরই সমান অধিকার; পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকার আজ পর্যন্ত শ্রেণী বিশেষের কব্জার মধ্যে রয়েছে।

যতই অনুন্নত হউক মানুষ মাত্রেরই ভাষা আছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা সৃষ্টি করতে পারে নি আজও এরূপ মানব সমাজের অস্তিত্ব রয়েছে; কিন্তু তাদেরও ভাষা আছে। তবে যে-কোন ভাষার বিকাশ সেই ভাষাভাষীর সামাজিক জীবনের বিকাশের উপর নির্ভরশীল। সমাজ গতিশীল. বলিষ্ঠ ও উন্নত হলে, তার ভাষাও বলিষ্ঠ হয়, নূতন নূতন ভাবের প্রকাশ এবং নূতন আবিষ্কারের নামকরণ উপলক্ষে নূতন নূতন শব্দ তৈরী হয়; অন্য ভাষা থেকেও প্রয়োজন মত শব্দ আহরণ করে ভাষা পুষ্টিলাভ করে।

মানব সমাজের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অবস্থায় সামাজিক আইন কানুন তথা বন্ধনকে দৃঢ়করণ এবং ব্যক্তিক বা শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন উপলব্ধ হয়েছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য তার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজন ততদিনই যতদিন মানব-সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য বন্ধনের নিগড় বা ব্যক্তি বা শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের অপরিহার্যতা অনুভূত হবে। সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের দিনে, ভবিষ্যতের কোন এক শুভক্ষণে, রাষ্ট্রহীন এবং জাতিহীন মানব-সমাজের কল্পনা করা চলে; কিন্তু ভাষাহীন মানব-সমাজের কল্পনাও করা চলে না। পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজন যতদিন অনুভূত হবে ততদিন ভাষাও থাকবে। পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজন থাকবে না, এমন মনুষ্য সমাজের কল্পনাও করা যায় না, কারণ তদবস্থায় পশু ও মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। মানব সভ্যতা বলেও কিছু থাকবে না।

কিন্তু রাষ্ট্র ও ভাষা সম্পর্কে আরও আলোচনার পূর্বে জাতি এবং

হাল আমলের জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র সম্বন্ধেও ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমে জাতির কথাই ধরা যাক। জাতির এক ভাষা থাকা চাই, একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে তার অবস্থান চাই, এক অর্থনৈতিক সংগঠন এবং তার চিন্তাধারার মধ্যে এমন মিল থাকা চাই যাতে তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। এরূপভাবে সুসংবদ্ধ কোন বিশেষ অঞ্চলের বাসিন্দাদের একটি জাতি বলা চলে। এরূপ জাতির স্বাধীন রাষ্ট্রকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বলা হয়ে থাকে। উপরোক্ত জিনিসগুলোর কোন একটির অভাব হলেই জাতির ভিত্তিমূল শিথিল হয়। বস্তুতঃ সেরূপ সমাজকে এক জাতিভুক্ত সমাজ বলাই চলে না।

শৈল্পিক বিপ্লব সাধিত হয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ছিল না। সে সময়ে বহু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বর্তমান ছিল। বর্তমানেও অর্থনৈতিক স্বার্থ এক হ'লে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে আপোষমূলক মনোভাব বিদ্যমান থাকলে বহু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বর্তমান দুনিয়ায় সুইস্-জারল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত।

আবার শুধুমাত্র এক ভাষাভাষী বা এক ধর্মে বিশ্বাসী কোন সমাজকেই এক জাতি বলা যায় না। মার্কিন মুলুকের অধিবাসী এবং ইংরেজদের ভাষা এবং ধর্ম এক। কিন্তু তারা এক জাতিভুক্ত নয়; কারণ একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে তারা বাস করে না এবং তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থও এক নয়। আরবী ভাষা আরব ভূমি ছাড়াও প্রায় সম্পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্য এবং মিশরে প্রচলিত। এই বিরাট অঞ্চলের ধর্মও এক ইসলাম। এতদসত্ত্বেও এই অঞ্চলে অনেকগুলো জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বিদ্যমান। পারস্য এবং আফগানিস্তানেও ইসলাম ধর্ম এবং আরবী বর্ণমালা প্রচলিত। সরকারী ভাষাও সম্ভবতঃ উভয় রাষ্ট্রেই ফারসী। অধিকন্তু তারা একই হিন্দী-ইউরোপীয় অর্থাৎ আর্য মানব-গোষ্ঠি সম্ভূত। কিন্তু তারাও এক জাতিভুক্ত নয়। রাষ্ট্রও তাদের দু'টি।

রাষ্ট্র ও ভাষার উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং জাতি এবং জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা সম্বন্ধে এই সুস্পষ্ট ধারণার পর, রাষ্ট্র ও ভাষার

সম্পর্ক নিরূপণ করা কঠিন নয়। জাতির যে সংজ্ঞা দেওয়া হলো সেরূপ এক জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে ভাষার সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন বিরোধই বাধতে পারে না; কিন্তু অর্থনৈতিক সংগঠন ও স্বার্থের ঐক্য, সংস্কৃতিগত বিরোধের অভাব, বাইরের সাধারণ শত্রুর ভয় কিংবা কেবলমাত্র এক ধর্মকে সম্বল করেও অনেক সময় রাষ্ট্র স্থাপনের প্রচেষ্টা বর্তমান যুগেও সাফল্যমণ্ডিত হতে দেখা যায়। কেবলমাত্র অনুন্নতদেশেই এরূপ প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। তাছাড়া শুধুমাত্র একই প্রকার অর্থনৈতিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে স্থাপিত বহু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রেরও, বর্তমান দুনিয়ায়, একেবারে অভাব নেই।

তবে কথা এই যে কেবলমাত্র বহু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রই অর্থাৎ এক ধর্ম বা বাইরের সাধারণ শত্রুর ভয়কে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত বহু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রেই শাসকশ্রেণী এবং রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা বা অন্য কথায় বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। বিশেষ ভাষাভাষী শাসকশ্রেণী রাষ্ট্রে প্রচলিত অন্য বা অন্যান্য ভাষা দাবিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা করলে কিংবা একমাত্র নিজেদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানে অত্যুৎসাহী হলেই বিরোধের সূত্রপাত হয়। সংস্কৃতি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এরূপ জবরদস্তিমূলক মনোভাব কেবলমাত্র পুঁজিবাদী বা আধা পুঁজিবাদী আধা-সামন্ততান্ত্রিক বহু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রেই সম্ভব। ভাষা ও শাসকশ্রেণীর মধ্যে সংগঠিত সংঘর্ষের ফলাফল পরিণামে কি রাষ্ট্র কি শাসকশ্রেণী কারো জন্যে শুভ হয় না ঃ এই সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কোন জাতির সজীব ভাষা এবং উন্নত সংস্কৃতিকে কোন দিনই দাবিয়ে রাখা বা দমন করা যায় না—সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণীর দ্বারা সে প্রচেষ্টা হলে ত আর কথাই নেই।

আরবীয় মুসলমানেরা সুসভ্য পারস্যদেশ জয় করেন। কিন্তু কয়েক শত বৎসর শাসন এবং দেশের সকল অধিবাসীদের ধর্মান্তর গ্রহণ সত্ত্বেও পারসিক সংস্কৃতি ও ভাষাকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হয় নি। বরং উত্তরকালে পারসিক সংস্কৃতির অনেক কিছুর প্রভাব বিজয়ীদের উপর এমনভাবে পড়ে যে পরবর্তী বহু মুসলমান রাষ্ট্রে আরবীর বদলে ফারসীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করা হয়। মহাকবি ফিরদৌসির শাহনামা আরব বিজয় পূর্ব-কালের জাতীয় বীরত্ব গাথা ও কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই বলিষ্ঠ রচনাকে এক হিসাবে

আরব বিজয়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। রেজা শাহ্‌র সময়ে প্রাচীন পাহ্‌লবী ভাষার শব্দাদি, প্রচলিত ফারসী ভাষায়, বেশি করে আমদানী করার সরকারী প্রচেষ্টা আরম্ভ করা হয়। মুসলমান সমাজে প্রচলিত নামাজ, রোজার মত নিত্য ব্যবহৃত শব্দাদির ব্যবহার থেকেই ফারসীর প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। পূর্ব বাংলার মুসলমান চাষীর জীবনে শাহ্‌নামার বিপুল প্রভাব কিছুদিন পূর্বেও পরিদৃষ্ট হতো। সেদিনও তুর্কীরা আরবী বর্ণমালার স্থলে রোমান বর্ণমালা প্রচলন করে আরব বিরোধের পরিচয় দিয়েছে।

একটা কথা কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন। রাষ্ট্র ও ভাষার বিরোধের গোড়ায় জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। বহু জাতিভিত্তিক বা ভৌগলিক-বিচারে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে এই বিরোধের সৃষ্টি করে ধনিক-বণিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বলা বাহুল্য তারাই রাষ্ট্রের শাসক। বিশেষ ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী ভৌগোলিক অঞ্চলকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনে সমান অধিকার না দেবার দুর্লোভ যখন অপর কোন অঞ্চলের ধনিক-বণিক ও সামন্ত শক্তিকে পেয়ে বসে তখনই সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। নিজেকে সর্বশক্তিমানের মর্যাদা দেওয়ার স্পৃহা কোন এক ফেরাউনকে তৎকালীন মিশরের সমস্ত বিদ্যালয় ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে প্ররোচিত করেছিল। বর্তমান যুগেও ঠিক তেমনি এক অঞ্চলের শাসক শ্রেণী অপর অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানেঃ কারণ কোন জাতিকে পঙ্গু করার প্রধান উপায় তার ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা। আক্রান্ত অঞ্চলের ধনিক-বণিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণী তখন স্বভাবতঃই তার বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিবাদ এবং তাতে ফল না হলে পরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ বিদ্রোহ প্রথমে আক্রান্ত অঞ্চলের ধনিক-বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও উত্তরকালে তা সর্বসাধারণের মধ্যে সংক্রামকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে; কারণ ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণের নেপথ্যে যে আসলে অর্থনৈতিক শোষণের উদ্দেশ্য বিদ্যমান তা আক্রান্ত অঞ্চলের জন-সাধারণেরও বুঝতে কষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে আক্রান্ত অঞ্চলের সকল শ্রেণীর লোকের স্বার্থ এক হয়ে যায়।

অপর দিকে আক্রমণকারী অঞ্চলের জনগণকেও তথাকার শাসক-শোষক

শ্রেণী মিথ্যা প্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত করে তোলে। ফলে যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল দু' অঞ্চলের দু'টি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাতের মধ্যে তাই অনতিকাল মধ্যে রাষ্ট্রের দু'অঞ্চলের জনগণকে এক প্রবল ও আপোষহীন সংঘর্ষে লিপ্ত করে। এর পরিণামে রাষ্ট্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়; কারণ যে বিরোধে উভয় পক্ষের জনগণ অংশ গ্রহণ করে সে বিরোধ রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ভাষার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী নীতি সম্পূর্ণ অচল।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যারও বিচার করতে হবে। এ-সমস্যার তাৎপর্য নিরূপণের জন্যেই উপরোক্ত সুদীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করতে হয়েছে। কিন্তু ভূমিকাতেই এ-সমস্যার উৎপত্তি ও সমাধানের ইংগিত আছে। তবু আরও স্থূল ভাষায় বলা প্রয়োজন। কারণ এ-ব্যাপারে ইংগিতের দিন আর নেই।

মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের কথা সকলেরই মনে থাকার কথা। সে প্রস্তাবে রাষ্ট্রসমূহের উল্লেখ ছিল। যারা লাহোর প্রস্তাব রচনা এবং গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রস্তাবটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি—এই শ্রেণীর উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রস্তাব রচয়িতারা বিদ্বান-বুদ্ধিমান এবং ঝানু রাজনীতিক ছিলেন। নিশ্চয়ই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক ব্যবধান এবং ভাষাবৈষম্য প্রভৃতির কথা বিবেচনা করেই লাহোর প্রস্তাব রচিত হয়েছিল। বিভাগোত্তরকালের প্রথম দিকে স্বাধীন পাকিস্তানের উভয় অংশের শাসক-শোষক শ্রেণী ভাবলো বুঝি বা যোগসাজসেই উভয় অংশের জনসাধারণকে শোষণ করা সম্ভব হবে। এই ভেবেই তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের নীতি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু অনতিকালমধ্যেই উভয় অংশের শাসক-শোষকশ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বাধলো লুণ্ঠনের বখরা নিয়ে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীও নিজেদের স্বার্থে তাতে যোগ দান করলো।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-শোষক শ্রেণী করাচীতে কেন্দ্রীয় রাজধানীর অবস্থানের সুযোগ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে তার ন্যায্য অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে বঞ্চিত করতে লাগলো; এবং এ বঞ্চনাকে স্থায়ী করার মতলবে তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করলো। পূর্ব পাকিস্তানী বণিক

সমাজ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। ফলে বিরোধ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করলো। সে বিরোধ আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা আজ সকলেই উপলব্ধি করতে পারছেন। আরও কিছুদিন এ বিরোধ চলতে থাকলে তার যে কি ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তাও সম্ভবতঃ অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একদিকে বঙ্কিমী আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং অপরদিকে বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট আলীগড় আন্দোলনের মানস-সন্তান মুসলিম লীগ অবিভক্ত ভারতে আক্রমণমুখী (Chauvinistic & bellicose) ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করে। সেটাই ক্রমে শাখা-পল্লবে ফুলে ফসলে পল্লবিত পরিপুষ্ট হয়ে ভারত বিভাগ অনিবার্য করে তোলে। বলা আবশ্যক, যদিও পাকিস্তান আন্দোলন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন ছিল এবং শেষ পর্যায়ে গ্রাম্য শোষক শ্রেণীর অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্তি পাবার আশায় কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসাধারণও আন্দোলনে যোগদান করেছিল, তবু মুসলিম লীগ রাজনীতি ইংরেজ বিরোধের চেয়ে হিন্দু বিরোধকেই সংগ্রামের প্রধান অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করে। এর ফলে তিক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং জনমনে হিংসার বীজ রোপিত হয়। হিন্দুর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ এ তিক্ততা বৃদ্ধির সহায়তা করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হিংসাকে উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে সাফল্য লাভ করলে উত্তরকালে তাতে মারাত্মক উপসর্গাদি দেখা দিতে বাধ্য। আজকের ভাষা সমস্যাজনিত বিরোধের বীজ মুসলিম লীগের দেশ বিভাগ পূর্বকালীন রাজনীতির মধ্যেই উপ্ত ছিল। উচ্চবর্ণীয় হিন্দু শাসক শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত যে হিংসা একদিন বন্যার স্রোতের মতো সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও, জনসাধারণ শোষণ থেকে মুক্তি না পাওয়াতে, সে হিংসাই আবার পুনঃজাগ্রত এবং অন্যখাতে প্রবাহিত হলো। উভয় অঞ্চলের ধনিক বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাতে ইন্ধন যোগাতে লাগলো এবং এক অঞ্চলকে অন্য অঞ্চলের সকল দুঃখ-দুর্দশার কারণরূপে চিহ্নিত ও প্রচার করে ঐ হিংসাকে বিরোধের অগ্নিতে পরিণত [illegible] সে অগ্নি সমগ্র দেশকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

এ কথা বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকতো তাহলে এ বিরোধের সূত্রপাতই হতো না। কেননা দীর্ঘ সাত বৎসর ধরে চলতো না নির্লজ্জ শোষণ, হতো না বিরোধ ও সংঘর্ষের বীজ রোপন। শোষিত জনসাধারণ কাউকে শোষন করতে চায় না—করতে পারেও না। তারা বাঁচতে চায়। যা আছে তা সকলে মিলে সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করার মধ্যেই তাদের স্বার্থ এবং আনন্দ।

বর্তমান শাসক-শোষক শ্রেণী যতদিন ক্ষমতাশীন থাকবে ততদিন অন্যান্য বহুবিধ সমস্যার মতো ভাষা সমস্যারও সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে না। প্রথমতঃ যে কারণে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য ঠিক সেই কারণেই শোষক শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ অপরিহার্য। এ বিরোধের মধ্যেই তাদের চরম নিষ্পত্তির বীজ উপ্ত রয়েছে। তাদের এ অন্তর্বিরোধের মধ্যেই জনসাধারণের মুক্তির আশা। দ্বিতীয়ত দেশের দু' অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ জীইয়ে রাখার মধ্যেও তাদের স্বার্থ নিহিত। এ-দ্বন্দ্ব জীইয়ে রেখে জনসাধারণের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি ও সংঘর্ষ বাঁধাতে পারলে আরো বহুকাল ক্ষমতাসীন থাকা এবং শোষণ অব্যাহত রাখা সম্ভব—এই তাদের আশা।

সুতরাং যতদিন না দেশের জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসছে অর্থাৎ গণ-সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করছে ততদিন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তথা রাষ্ট্রীয় এবং ভাষা সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান হবে না। তথাকথিত গণ-পরিষদ যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাতে বিরোধ অধিকতর বৃদ্ধি পাবে, কমবে না। সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার একদিনেই এই কৃত্রিম বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারে। দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা সমান। বাংলা, উর্দু, সিন্ধী প্রভৃতি সব ভাষাকেই বিকাশের সমানাধিকার দেয়ার মধ্যেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও কল্যাণ নিহিত। ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ভিত্তিক রাষ্ট্রের সংগঠন কেবলমাত্র পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং প্রত্যেক অঞ্চলকে তার ন্যায্য পূর্ণ অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের ভিত্তিতেই সম্ভব। সে সম্ভাবনা সুদূর পরাহত নয়। জনসাধারণের কাছে তথাকথিত নেতাদের অর্থাৎ শাসক-শোষক শ্রেণীর স্বরূপ ক্রমেই দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাত্রির আঁধার কেটে

ভোরের স্নিগ্ধ আলোর উন্মেষ সমাগত: পবিত্র কোরানের কথায় দুঃখের পরই সুখ।*

---

* পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ভাষা ও সাহিত্য শাখার অধিবেশনে পঠিত।
ইত্তেফাক, জুন, ১৯৫৪।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা

সম্রাট ও সাম্রাজ্যের অবসানের পরেও বহু ভাষাভাষী মানুষের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত স্বীকৃতির উপর গঠিত বহু-জাতি রাষ্ট্র এ যুগে বিদ্যমান। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্র তার দৃষ্টান্ত। আবার এক ভাষাভাষী মানুষেরাও আলাদা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং আরব জগত তার দৃষ্টান্ত। উভয় শ্রেণীর রাষ্ট্র গঠনের পশ্চাতে রয়েছে লম্বা ইতিহাস। বহু-ভাষা-ভাষী মানুষের সমবায়ে গঠিত আধুনিক বহু-জাতি রাষ্ট্র মাত্রেই আগে ছিল সবলে গঠিত রাজ-রাজড়া শাসিত সাম্রাজ্য। একালে তার রূপরেখা, আঙ্গিক এবং চরিত্র বদল হয়েছে বটে কিন্তু অতীতের ইতিহাস মুছে যায় নি, মুছে ফেলা সম্ভবও নয়। আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। বহু ভাষাভাষী মানুষের সমবায়ে গঠিত বহু-জাতি বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাত্রেরই কাঠামো ফেডারেল। পক্ষান্তরে এক ভাষাভাষী মানুষের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রের ফেডারেল কাঠামো হওয়ার আবশ্যকতা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনফেডারেল কাঠামোর ঐতিহাসিক কারণ অনেকেরই জানা আছে, সুতরাং তার উল্লেখ করলাম না। অধিকাংশ এক ভাষাভাষী রাষ্ট্র এক ইউনিট বিশিষ্ট। এই সামান্য ভূমিকার অবতারণার উদ্দেশ্য, আমি বলতে চাই এক ভাষাভাষী মানুষেরাই প্রকৃতপক্ষে এক জাতির মানুষ। ভাষার চেয়ে দৃঢ়তর সামাজিক বন্ধন আর কিছু নেই।

সুতরাং আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশ কার দান একটি মাত্র বাক্যে উত্তর দাও, আমি বলবো স্বাধীন বাংলাদেশ বাংলা ভাষার দান। যে সকল তরুণ যুবক জীবন দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিলুপ্ত করার হীন ষড়যন্ত্র বানচাল করেছিলেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছেন তাঁরা। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পর একুশে ফেব্রুয়ারী একটি

অতিরিক্ত মর্যাদায় মহিমান্বিত। একুশে ফেব্রুয়ারী এখন শুধু ভাষার সংগ্রামে শহীদের স্মৃতি তর্পণ দিবস নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী যারা স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবে-দনেরও পবিত্র দিবস।

প্রশ্ন উঠতে পরে ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষারূপে প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলেন তাঁরা কি জানতেন যে ভাষার সংগ্রাম ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠারও সংগ্রাম? এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হয় না। ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা ঘটে যার ফলশ্রুতি দেখতে পাওয়া যায় বহুকাল পরে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা হয়ত ঘটনার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য তখন তখনই উপলব্ধি করতে পারেন। অতীত ইতিহাস এ ব্যাপারে ইংগিত দেয়। ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা সংগ্রামের তাৎপর্যও হয়ত অনেকে তখন উপলব্ধি করে থাকবেন, কিন্তু নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় মুখ খুলে বলেন নি। এ কথা সত্য যে যারা ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—যারা সে-সংগ্রামে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের সকলে না হলেও অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম লীগার এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যে বাঙ্গালী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল না পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় বার মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার আবশ্যকতা এবং ফলশ্রুতিরূপে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা তার অকাট্য প্রমাণ। মানুষমাত্রেরই ভুল হয়, তরুণ মন অপেক্ষাকৃত ভাবপ্রবণ। সুতরাং তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করা কৌশলী কুটনীতিকের পক্ষে খুব কঠিন কাজ নয়। মিঃ জিন্নাহ সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার কলাকৌশল ভালোই জানতেন। রাজনীতিতে চমকপ্রদ সাফল্য সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও সম্মোহিত করার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং জিন্নাহ একা দোষী নন। যারা তার দ্বারা বিভ্রান্ত ও সম্মোহিত হয়েছিলেন তাদেরও দোষ দেয়া যায় না। ভুল হয় বলেই তার সংশোধন হয়। ভুল যত বড় হয় তার সংশোধন করতে গিয়ে তত বড় ও বেশী খেসারত দিতে হয়। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সংকল্প ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাহর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা

ছিলেন তারা জিন্নাহর ঐ ঘোষণার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝে-ছিলেন বলেই তাঁকে সোচ্চার "না" ধ্বনি দ্বারা বিদায় দিয়েছিলেন। ভাষার বিতর্ক সেদিন থেকেই প্রকাশ্যে শুরু হয়। কিন্তু তার পূর্বেই নানা সূত্রে জিন্নাহ এবং তার পারিষদবর্গের গোপন উদ্দেশ্য অনেকে জ্ঞাত হন বা অনু-মান করতে সমর্থ হন। সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সম্মতি নেয়া দূরের কথা জিন্নাহর বংশবদ চেলাদের সংখ্যাধিক্যপূর্ণ পাকিস্তানী গণ-পরিষদের আনু-ষ্ঠানিক সম্মতি পর্যন্ত না নিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ অঞ্চলের একটি মৎস্য বন্দরে রাজধানী স্থাপনের ঘটনাও বুদ্ধিমান এবং দেশ-প্রেমিক তরুণ বাঙ্গালী ছাত্রদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই আমি মনে করি, জিন্নাহকে "না" ধ্বনি দ্বারা বিরূপ অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের ঘটনাকে ভাবাবেগপ্রসূত একটি আকস্মিক ঘটনা বলা ভুল। নেপথ্যে উপকরণ জমছিল এবং প্রস্তুতিও চলছিল। তার কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। কালে হয়ত আরো প্রকাশ পাবে। সংক্ষেপে এটুকু বলাই যথেষ্ট, ভাষা সংগ্রামের সুদূর প্রসারী ভূমিকা কি হতে পারে তদ্বিষয়ে সংগ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অন্ততঃ কিছু লোকের মোটামুটি ধারণা ছিল কেননা জাতীয় জীবনে ভাষার অপরিসীম গুরুত্ব সম্বন্ধে তারা অবগত ছিলেন। তারা দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস পাঠ করেছিলেন—সাহিত্যও পাঠ করেছিলেন।

তাদের সমুখে দৃষ্টান্তও ছিল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রথম কাজ অধিকৃত দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির বিলোপ সাধন। এ কাজে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হলে অধিকৃত দেশের মানুষ জাতীয় চেতনাহীন হয়ে পড়ে। সে তার স্বাতন্ত্র্য ভুলে যায়, দাসত্বও তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রমিক সমাজ শিল্পপতিদের দাসতুল্য, কিন্তু এক ভাষাভাষী এবং একই ভৌগোলিক পরি-বেশে বসবাসকারী বিধায় তারা নিজেদেরকে দাস মনে করে না। ভারত-বর্ষীয় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ খাঁটি ইংরেজের কাছে দেশীয়দের চেয়ে ঘৃণ্য ছিল, কিন্তু এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ মনে করতো তারাও রাজার জাত।

বিপক্ষ অর্থাৎ পাকিস্তানী শাসকেরাও ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ঠিকই বুঝেছিলেন। ইংরেজ সরকারের কাজগুলো তাদের সমুখে ছিল। সাম্রাজ্য-বাদী সরকারের ঔপনিবেশিক নীতি তাদের অপরিজ্ঞাত ছিল না। ভারত-

বর্ষে ইংরেজী ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তন করার ফলেই এ দেশে ইংগ-ভারতীয় সমাজ গড়ে ওঠে এবং তারাই প্রায় দেড় শত বৎসরকাল ধরে ইংরেজ শাসনের স্তম্ভরূপে কাজ করে। বৃটিশ শাসনের সুফল সম্বন্ধে আমরা ছোটবেলায় স্কুল পাঠ্যপুস্তকে বড় বড় নিবন্ধ পাঠ করেছি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে মনোনীত ইতিহাস গ্রন্থেও বৃটিশ শাসনের সুফল এবং ইংরেজী ভাষার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলাদা অধ্যায় থাকতো। এগুলো ইংরেজ লেখকরা লিখতেন না—ডক্টরেট ডিগ্রীধারী এদেশীয় বড় বড় পণ্ডিতেরাই এসব গ্রন্থ রচনা করতেন। এখনও সে সব গ্রন্থ আদৌ পঠিত হয় না এমন নয়, ইংরেজী ভাষা চাপিয়ে এবং এ দেশের কিছুসংখ্যক মানুষকে উচ্চ শিক্ষার নামে বিলেতে চালান করে তাদের মন থেকে দেশীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমস্ত ছাপ ধুয়ে মুছে ফেলার যে যুগপৎ অভিযান ইংরেজ তার রাজত্ব স্থাপনের প্রথম থেকেই শুরু করে তার যথেষ্ট সুফল তারা পেয়েছিল। তার কিছু কিছু কুফল এখন পর্যন্ত আমরা ভুগছি। অদ্যাবধি ইউরোপ আমেরিকা ফেরৎ দেশীয় প্রশাসক এবং বিশেষজ্ঞগণ দেশের সাধারণ সমাজ-জীবনের সংগে সংশ্রবহীন—তারা বাংলাদেশী হয়েও যেন ভিন্ন জাতের মানুষ। সব শাসনেরই সুফল-কুফল আছে। বিদেশী শাসনের সব কিছুই আর বিয়োগ চিহ্ন হতে পারে না। বিদেশী শাসনের সবচেয়ে মারাত্মক অভিশাপ, পরাধীন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি বা আংশিক বিলুপ্তি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউরোপীয় শাসনাধীনে না এসে এবং ইউরোপীয় ভাষা গ্রহণ না করেও একাধিক জাতি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছে এবং শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়েছে। ভারতবর্ষ একটি উপমহাদেশ। তার সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং বিভিন্ন ভাষা প্রাচীনতার ন্যায্য দাবী রাখে। এদেশে ইংরেজের প্রথম প্রবেশ-কালীন ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও ভাষার চেয়ে তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও ভাষা উন্নততর ছিল বললে বোধ করি ভুল করা হয় না। বাংলাদেশের অতিরিক্ত সৌভাগ্য, ইউরোপীয়দের প্রবেশের পরেও এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইসলামের ন্যায় প্রতিভাবান এবং দেশপ্রেমিক ব্যক্তিগণ বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে ভাষা ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করেছিলেন। তাই সংকর ইংগবঙ্গ সমাজের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও

বাঙ্গালীর ভাষা ও সংস্কৃতি হরণ করা ইংরেজের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বাংলাদেশে পরাজিত হয়। উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, বাংলাদেশেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত। ইংরেজের প্রতিষ্ঠালাভের কারণ, ছলে বলে কৌশলে ভারতবর্ষীয় ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন রোধ এবং সে দুর্বলতার সুযোগে বিজাতীয় ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। ইংরেজ বিতাড়নের মূলেও আবার রয়েছে দেশীয় ভাষা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির পুনর্বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা।

ইরানের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের চেয়েও চমকপ্রদ। আরব জাতি ইরান জয় করে। তারা সর্বত্র আরবী ভাষা প্রবর্তনের চেষ্টাও করে। তারা আরবীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা বলেও ঘোষণা করে। ইরানের মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তবু ইরানের আত্মাকে জয় করা সম্ভব হয়নি। ফারসী ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি পরিণামে ইরানকে জয়ী করে। আরব সভ্যতার উপর ইরানী সভ্যতা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ফিরদৌসী মুসলমান হয়েও প্রাচীন ইরানের বীরত্বগাথা গেয়ে ইরানী জাতীয়তাকে শক্তিশালী করেন। অবশেষে ইরান আরব অধিকার হতে মুক্তিলাভও করে। এ ইতিহাসও বাঙ্গালী তরুণ সমাজের অজ্ঞাত ছিল না। পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর অবশ্যই জ্ঞাত ছিল। তবু তাদের আশা ছিল, বাঙ্গালী মুসলমানের অনগ্রসরতার সুযোগে হয়ত তারা দেশটাকে বোবা বানাতে অর্থাৎ তার ভাব ভাষা এবং সংস্কৃতি হরণ করতে পারবে। তাদের কাছে একটি অতিরিক্ত সুযোগও ছিল। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারিত হয় প্রধানতঃ উর্দু ভাষী মধ্যভারতীয় আলেমদের দ্বারা। ওয়াহাবী আন্দোলনের উৎসও ছিল মধ্যভারত। বাদশাহী আমলের নিদর্শনসমূহও ছিল মধ্য ও পশ্চিম-ভারতে। কোরান কেতাবও ঐ অঞ্চল হতেই ছাপা হয়ে আসতো। মসলা-মাসায়েল সম্পর্কিত ধর্মীয় গ্রন্থাদিও ছিল উর্দু ভাষায়। এ সব কারণে পশ্চিমা মুসলমানের প্রতি আরো সংক্ষেপে বললে —নিছক পশ্চিম দিকটির প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। পশ্চিম প্রীতি শুধু সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে বরং এ দুর্বলতা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, বিশ তিরিশের দশকেও বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু না বাংলা এমন

অদ্ভুত প্রশ্ন রীতিমতো আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। ফরিদপুর জেলার গণ্ড গ্রামের সন্তান নবাব আবদুল লতিফ বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে শরিফ এবং সাধারণ দু'টি জাতিতে বিভক্ত করেছিলেন। তিনি হাণ্টার শিক্ষা কমিশনকে জানিয়েছিলেন শরিফ জাতির মাতৃভাষা 'উর্দূ' এবং সাধারণ জাতির মাতৃ-ভাষা বাংলা। এ শ্রেণীর লোকেরাই বাঙ্গালী মুসলমানদের নেতৃত্ব করতেন। প্রকৃত বাঙ্গালী নেতৃত্ব বহু দেরীতে অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ফজলুল হকের ন্যায় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকের পক্ষে জিন্নাহ্ লিয়াকত আলীর নেতৃত্ব মেনে নেয়ার কোন সংগত কারণ ছিল না। পশ্চিমের প্রতি দুর্বলতাই হয়ত তাঁর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলের কারণ। বলা বাহুল্য তাঁর ভুলের খেসারত শুধু তিনি নিজে দেননি, বাঙ্গালী জাতিকেও দিতে হয়েছে।

পাকিস্তানী শাসক শ্রেণী বাঙ্গালী মুসলমানের এই পশ্চিম প্রীতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে বলেও হয়ত ভরসা করেছিল। কিন্তু তারা বোধ করি রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শক্তি সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম বাঙ্গালী মুসলিম তরুণ সমাজের মনে স্বাজাত্যবোধের যে বীজ বপন করেছিলেন তা ইতিমধ্যে শাখা প্রশাখায় পল্লবিত ও দৃঢ়মূল হয়েছিল। তরুণ ছাত্র সমাজ বুঝতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য। বুঝতে পেরেছিলেন, তারা বাংলাদেশকে চিরকালের জন্যে কলোনী বানাতে চায়। চিরকালের জন্যে কলোনী বানাবার উদ্দেশ্যেই তারা বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানছে। বিতাড়িত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং পাকিস্তানী শাসনের মধ্যে যে কোনরূপ গুণগত পার্থক্য নেই, বরং বৃটিশ শাসনের চেয়েও পাকি-স্তানী শাসন জাতির জন্যে অধিক অনিষ্টকর তাও তারা বুঝতে পেরেছিলেন। উল্লেখ্য যে, গাত্রবর্ণের পার্থক্যের জন্য ইংরেজ কখনও ভারতীয় হতে পারেনি, পক্ষান্তরে অভিন্ন গাত্রবর্ণ এবং অভিন্ন ধর্ম পাকিস্তানী শাসকদের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক ছিল এবং তারা সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

ছাত্র সমাজের উপলব্ধি যে কত গভীর ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচী হতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উনিশ'শ চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যে একুশ দফা কর্মসূচীকে হাতিয়াররূপে

ব্যবহার করে তার একটি প্রধান দফাতে ছিল বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষা এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমীরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনী কর্মসূচীতে এই বিশেষ দফাটির প্রক্ষেপ তরুণ মনের ভাবাবেগপ্রসূত আকস্মিক ঘটনামাত্র ছিল না। নির্বাচন পরবর্তী বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যেও একটি সুচিন্তিত দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর প্রমাণ পাওয়া যায়।

নির্বাচনের অল্পকাল পরেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহূত হয়। মরহুম খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। আবদুল গণি হাজারী এবং আমি যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে যারা দিবারাত্র পরিশ্রম করেছিলেন তাদের মধ্যে আনিসুজ্জামান (ডক্টর), হাসান হাফিজুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, মোস্তফা নূরুল ইসলাম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত সম্মেলন কয়েক দিবস স্থায়ী হয়। সম্মেলন কর্তৃক পল্টন মাঠে বিশেষভাবে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো ছিল অত্যন্ত অর্থবহ। কবিয়াল রমেশ শীলসহ বহু চারণ কবি তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে জনমনে দৃঢ়ীভূত করার বিশেষ উদ্দেশ্যেই যে উক্ত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহূত হয়েছিল তদ্বিষয়ে আজ আর বোধ করি কারো মনে সন্দেহ নেই।

১৯৫৭ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নির্দেশে কাগমারিতে আহূত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনও সাময়িক ভাবাবেগপ্রসূত ব্যাপার ছিল না। এই নিবন্ধের লেখককে আহ্বায়ক করে গঠিত একটি ছোট কমিটি উক্ত সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক কার্যাদি সম্পাদন করে। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, ইয়ার মোহাম্মদ খান, খায়রুল কবির প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্মেলন আংশিকভাবে হলেও আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। বিদেশ হতে যারা সম্মেলনে যোগ দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পরলোকগত অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মিসরীয় দূতাবাসের ডক্টর হাসান হাবাসী প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যতদূর মনে পড়ে, সম্মেলনে বৃটিশ ও রুশ প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সমস্ত কার্য বাংলা ভাষায়

পরিচালিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে কয়েকটি তোরণ তৈরী করা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আজাদ, মওলানা মোহাম্মদ আলী, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখের নামেও তোরণ তৈরী করা হয়। ঐ সম্মেলনে বক্তৃতাকালেই তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী তাঁর সুবিখ্যাত "সালামু আলায়কুম" উচ্চারণ করেন। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী ঐ সম্মেলনকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। আলতাফ হোসেন সম্পাদিত করাচীর ডন এবং তদঞ্চলের বিভিন্ন পত্রিকায় সম্মেলনের কার্যকলাপকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপরূপে ঘোষণা করা হয় এবং কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা হয়। তার অল্পকাল পরেই সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে প্যালেস ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পদচ্যুত করা হয়। কাগমারী সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার পশ্চাতেও ছিলেন তরুণ ছাত্র সমাজের অসংখ্য কর্মী। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে সাম্প্রদায়িকতা, নানা অন্ধ কুসংস্কার এবং অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণা হতে মুক্ত করে জনমনে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে উক্ত দুটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে প্রবল আন্দোলনের চাপে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের প্রথম রাজনৈতিক বিজয় সেদিনই হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসক শ্রেণী সে-সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার কোনরূপ উদ্যোগ নেয়া দূরের কথা তারা বরং বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে হাই-স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র উর্দু ভাষাকে বাধ্যতামূলক শিক্ষণীয় বিষয়রূপে প্রবর্তন করে। কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পরে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী তার পোশাকীরূপ বিসর্জন দেয়। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করার বৎসরকাল পরেই ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করে আইয়ুব খাঁ পরিচালিত সামরিক জান্তা সর্বময় ক্ষমতা অধিকার করে। বাংলাদেশের উপর শুরু হয় চরম নির্যাতন। কিন্তু নির্যাতন বাংলাদেশের তরুণ ছাত্র সমাজ এবং সমাজসচেতন দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে নিষ্ক্রিয়ে পরিণত করতে পারেনি। একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন কখনও বন্ধ হয়নি,

বরং প্রতিটি পরের বৎসর প্রতিটি আগের বৎসরের চেয়েও অধিক নিষ্ঠা এবং আনুগত্যের সাথে পালিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সাধারণ লোকের উপরও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৪৮ সালে ত বটেই, ১৯৫২ সালেও এদেশের এক শ্রেণীর মানুষ সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হতে পারে নি। তাঁদের পাকিস্তান প্রীতিতেও কৃত্রিমতা ছিল মনের করার কারণ নেই। তবু এদেশের সাধারণ মানুষ ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেনি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পরীক্ষাও হয়ে যায় যে, দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের চেতনায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের বীজ উপ্ত ছিল। সে বীজ অঙ্কুরিত এবং শাখা-প্রশাখা ও পল্লবে বিস্তার লাভ করার ফলেই ৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করি। কিন্তু আমি বলবো সে-বিজয়ের বীজ ১৯৪৮ সালে রোপিত হয় এবং ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সালাম বরকত প্রমুখ তরুণের পূত পবিত্র রক্তে সিঞ্চিত হয়ে প্রথম অঙ্কুরিত হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী সালাম।

[পূর্বদেশ, ২১.২.৭৫]

একুশে ফেব্রুয়ারী ঃ পুনর্মূল্যায়ন

কার্ল মার্কস তাঁর এইটীন্থ ব্রুম্যায়ার নামক গ্রন্থের শুরুতে লিখছেন, "হেগেল কোথায় যেন বলেছেন, বিশ্ব ইতিহাসের মঞ্চে কোন না কোন চেহারায় প্রধান প্রধান ঘটনা এবং ব্যক্তির পুনরাবির্ভাব ঘটে কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে যোগ করতে ভুল করেছেন যে, প্রথম দফায় পুনরাবির্ভাব ঘটে ট্রাজেডিরূপে এবং দ্বিতীয় দফায় পুনরাবির্ভাব ঘটে প্রহসনরূপে।"

মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে কিছু লেখার শুরুতেই কার্ল মার্কসের উপরোক্ত মন্তব্যটি কেন যে মনে পড়লো তা আমি নিজেও খুব ভাল করে বুঝতে পারছি না। সম্ভবতঃ সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে বলে। স্বাধীনতা-উত্তর কাল নিশ্চয়ই পরিবর্তিত যুগ। সুতরাং মূল্যবোধ এবং শক্তির যে সমন্বিত সন্নিবেশ ইতিহাস তৈরী করে আবার সেই ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায়কে ধ্বংসও করে, তারও বৈপ্লবিক পরিবর্তন অবশ্যই ঘটার কথা।

বাংলাদেশ যতদিন বৈদেশিক শাসনাধীনে ছিল ততদিন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৪৮ সালের শুরুতে যে আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সে-আন্দোলন সম্পূর্ণ নতুন অর্থ পরিগ্রহ করে। নতুন ভূমিকা নির্দিষ্ট হয় তার জন্যে। সেদিন হতে ১৯৭১ সাল অবধি ২১শে ফেব্রুয়ারীর দু'টি তাৎপর্য ছিল। শহীদ স্মরণ এবং তাদের পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ছিল একটি দিক। অন্য দিকে ঐ দিবসটি ছিল আমাদের দেশ ও ভাষাকে বৈদেশিক শাসন হতে মুক্ত করার জন্যে নতুন করে শপথ গ্রহণের উপলক্ষ। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানী সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হয়। তার পরেও প্রতি বছর আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারী উদযাপন করেছি। পরের বছর প্রতি আগের বছরের চেয়ে অধিকতর উদ্দীপনা প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের উদ্দীপনা, উদযাপনের

ব্যাপকতা এবং সাধারণ মানুষের যোগদান আগের সমস্ত রেকর্ড ভংগ করে। কারণ, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমাদের তখন শপথ মুক্তি অথবা বহু কালের জন্যে দাসত্ব।

১৯৫২ সালের আন্দোলনে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা তখন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র। উনিশ বৎসরে তারা পরিণত-বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিশক্তি যেমন প্রসার লাভ করেছিল তেমনি তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের প্রকৃত ভূমিকা। তাঁরা জাতিকে আহ্বান জানাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। অপর-দিকে জাতিও উনিশ বৎসরে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল, তার দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বুদ্ধিবৃত্তি উৎকর্ষ লাভ করেছিল। জাতি বুঝে নিয়েছিল যে, ১৯৪৮ সালে যার সূচনা এবং ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ছাত্র-যুবকের তাজা রক্তে স্নাত শুদ্ধ হয়ে যে আন্দোলন নতুন তাৎপর্য গ্রহণ করেছিল সেটা শুধু ভাষার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল না, সেটা ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠারও সংগ্রাম। দু'টোকে পৃথক করা যায় না। এ কারণেই ১৯৭১ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখকে উপলক্ষ করে আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। আজ এবিষয়ে সকলেই বোধ করি একমত যে, ১৯৪৮ সালের যে দিনটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রগণ জিন্নাহর সদম্ভ উক্তি "উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"-র বিরুদ্ধে সোচ্চারে "না" ধ্বনি উত্থাপন করেছিলেন সে দিনই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২ শে ফেব্রুয়ারীর শহীদদের রক্ত তার বুনিয়াদকে দৃঢ় করে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে ভাষা আন্দোলনের সেই মূল ভূমিকা শেষ হয়েছে। ভাষা ব্যাপারে এখন কারো সংগে সংঘর্ষ নেই। ১৯৫২ সালে যে রক্তদান করা হয়েছিল তার সংগে যুক্ত হয়েছে আরো তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্ত। সুতরাং শুধু দিবস উদযাপন দ্বারা আজ আর আমরা আমাদের দেনা শোধ করতে পারি না। বৎসরে প্রায় প্রতিটি দিবস আজ শহীদ স্মৃতি দিবস। অপরপক্ষে সেদিনের যে সমস্ত অভিনেতা আজও জীবিত এবং রংগমঞ্চে সক্রিয় আছেন তারাও আজ আর ১৯৫২

সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভূমিকা পালন করতে পারে না। জাতিরও সে ভূমিকা আর নেই। আঁজকের মঞ্চ যেমন সম্পূর্ণ নতুন ; ভূমিকাও তেমনি সম্পূর্ণ নতুন। অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে ঃ আমরা নতুন ইতিহাস রচনা করতে চলছি।

অতীতে আমরা শহীদের মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করেছি। এ বিষয়ে আমি নীতির প্রশ্ন তুলছি না। তৎকালীন অবস্থাধীনে হয়ত তার আবশ্যকতা ছিল। এবং ঐ রাজনীতি আমাদিগকে যথেষ্ট মুনাফা প্রদান করেছে। পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন দেশের রাজনীতির ধারা এই। কিন্তু আজকের সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিবেশে শহীদেরা আমাদের নমস্য হিরো এবং তাদের স্মৃতি পবিত্র এবং মহান। সুতরাং আজ আমরা শহীদদেরকে আমাদের রাজনীতির উপকরণরূপে ব্যবহার করতে পারি না। ঐ রকম কাজ করলে অবশ্যই শহীদদের স্মৃতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে।

এই প্রসঙ্গে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি এবং যুবকের বর্তমান সম্পর্ক ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কেও দু'চারটি কথা বলতে চাই। পরাধীনতার যুগে পরিণত বয়স্কেরা তরুণ সমাজকে যে নির্দেশ দিতেন আজও যদি সে নির্দেশ দেন তা'হলে জাতির সর্বনাশ সাধন করা হবে। দলীয় অথবা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অপরিণত বয়স্ক তরলমতি কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদেরকে হাওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে উৎসাহিত করা হবে আত্মঘাতী নীতি। ও পথ বর্জন করতে হবে। সৃজনীমূলক প্রতিভার পরিচয় দিতে হবে সকলকে, কেননা যা ভাঙ্গার ছিল তা আমরা ভেঙ্গেছি, এখন নতুন ইমারত গড়তে হবে, এবং সে গড়ার কাজ বাইরের লোকেরা এসে করে দেবে না, আমাদিগকেই করতে হবে। গড়ার কাজে মানে সংগঠনের কাজ। সৃষ্টির কার্যে জাতিকে সংগঠিত করা শুধু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব নয়, ওটা প্রত্যেকটি মানুষের কাজ। নতুন ইমারত গড়ার পন্থা এবং তার আকৃতি এবং স্বরূপ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা থাকতে পারে কিন্তু ঐ মতভেদ যেন আমাদিগকে এমন কর্মে প্রবৃত্ত না করে যে-কর্ম বর্তমানে আমরা যে নড়বড়ে গৃহে বসবাস করছি সেটিও ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। সত্য বটে বর্তমানে আমরা যে নড়বড়ে গৃহে বসবাস করছি সেটিও মৃত অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং কালক্রমে তার অপসারণ আবশ্যক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও একটি

অতি রূঢ় সত্য যে, এই নড়বড়ে গৃহই আপাততঃ আমাদের আশ্রয়স্থল এবং এটার মধ্যে অবস্থান করেই আমাদেরকে নতুন রম্যহর্ম নির্মাণ করতে হবে। আমার বক্তব্য স্পষ্ট হচ্ছে কি না জানি না। আমি বলতে চাই, আমাদের হাতে যে উপকরণ আছে, দশে যে বস্তুগত এবং ভাবগত পরিবেশ বিদ্যমান সেগুলোকে পণ্যরূপে গ্রহণ এবং পুঁজি করেই আমাদিগকে নতুন ইমারত তৈরী করতে হবে। অতীতের ত্যাগ তিতিক্ষাকে বর্তমান কালের স্বার্থসিদ্ধির পুঁজিরূপে ব্যবহার করা এবং তদ্দ্বারা দশের লালিত বুদ্ধি ও শক্তিকে বিভ্রান্ত করা আজকের দিনে জাতের কাছে অপমানকর কার্য। এখন নতুন করে ত্যাগ আবশ্যক। কর্ম এবং আরো বেশী কর্ম করাই হচ্ছে সেই ত্যাগ। সোচ্চার ধ্বনি, সড়কে বিক্ষোভ-মিছিল, বিরাট জনসভা, কর্ম হতে বিরত থাকা এবং দেশের জনগণের স্বার্থের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কহীন বিষয়কে উপলক্ষ করে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে না। এ-সব কর্ম শুধু কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির স্বার্থ সিদ্ধ করবে।

অপরিণত বয়স্ক তরুণের দৃষ্টিতে বিপ্লব মানে বিপ্লব। কিন্তু যারা ইতিহাস জানেন তাদের কাছে বিপ্লব সহজ বস্তু নয়। প্রত্যেক সামাজিক রাজনৈতিক বিপ্লব এক একটি ক্রমোন্নতিমূলক প্রতিক্রিয়া—ধাপে ধাপে আরোহণ। এই আরোহণের পদ্ধতি ও লজিষ্টিকস আছে। মোড়কের উপর চমকপ্রদ নাম মুদ্রিত করলেই তার অভ্যন্তরের পচা বস্তুর গুণ বিনষ্ট হয় না। সোচ্চার ঘোষণা ও দম্ভ মানুষের অন্তঃসারহীনতা ঢাকতে পারে না, বরং শূন্য কলসের ধ্বনিই বেশী। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য কি, আজ তা নির্ণয় করার দিন এসেছে। সামাজিক পর্যায়ে আমরা চাই সাধারণের জন্যে খাদ্য, বাসগৃহ, শিক্ষা এবং রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা। এগুলো যেমন আমরা চাই ঠিক এগুলো উৎপাদনও করতে হবে আমাদিগকেই। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি আমাদিগকেই করতে হবে, বাসগৃহ নির্মাণ করতে হবে আমাদিগকেই। আমরা আমাদিগকে শিক্ষিত করবো। আমাদের চিকিৎসাও আমাদিগকেই করতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। সরকারের চরিত্র যাই হোক না অদূর ভবিষ্যতে ক্লাসিকাল ফ্যাসীবাদী নীতিতে এ দেশের সমস্যাবলী সমাধান করা সম্ভব নয়। হিটলার মুসোলিনী সামরিক প্রস্তুতি

চালিয়ে এবং অবশেষে স্ব স্ব দেশকে মহাসমরে লিপ্ত করে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং যুদ্ধ সাময়িকভাবে দেশের মানুষের বেকারি দূর করে। ফ্যাসীবাদ সে-পথই বেছে নিয়েছিল। বাংলাদেশে সে-নীতি অনুসরণ সম্ভব নয়ঃ কেননা প্রথমতঃ বাইরের কোন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নেই, দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ সামগ্রী প্রস্তুত করার উপযোগী শিল্প স্থাপন দূরের কথা প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোন শিল্পই নেই; তৃতীয়তঃ অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য রিজার্ভ সৃষ্টি করা দূরের কথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ এবং চতুর্থতঃ বাংলাদেশের মানুষ আক্রমণমুখো জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়। সুতরাং ফ্যাসীবাদী সরকারের দ্বারা দেশ পরিচালিত ও শাসিত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত বলেই মনে হয়। বাইরে থেকে অর্থ ঢেলেও অনুন্নত দেশে ফ্যাসীবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় বটে, কিন্তু যারা সে কর্ম এতদিন ধরে করে আসছেন, বিভিন্ন অঞ্চলে কঠিন মার খেয়ে তারা এখন ক্লান্ত ও কমজোর হয়ে পড়েছেন বলেই মনে হয়। তাছাড়া বাংলাদেশের অবস্থান এমনি যে, নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই হয়ত তারা ঐরূপ দুষ্কর্ম হতে বিরত থাকবেন।

সমাজতন্ত্র স্থাপন রাষ্ট্রের এবং বর্তমান সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য। অত্যন্ত প্রশংসনীয় লক্ষ্য সন্দেহ নেই, এবং দেশবাসীও সমাজতন্ত্রের নামে অজ্ঞান। কিন্তু সমাজতন্ত্রে পৌঁছোবারও ধাপ আছে। আমাদের বর্তমান সামাজিক জীবনবোধ কি সমাজতন্ত্র স্থাপনের অনুকূল? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে দিতে হবে। সামাজিক চিন্তা-ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি এবং আচরণ ইত্যাদির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের পূর্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। চিন্তার বিপ্লবের পরেই শুধু অর্থনৈতিক বিপ্লব সম্ভব। এ-দেশের পরিবারকেন্দ্রিক গ্রামীণ অর্থনীতিকে যৌথঅর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে এখনও বহু সময় লাগবে। এ সময় যাতে হ্রাস করা যায় তার দায়িত্ব আমাদের।

সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজকের করণীয় কাজ হলো সুস্থিরে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করা এবং ধাপে ধাপে অতিক্রম্য কর্মসূচী প্রণয়ন করা। বড় বড় সভা-সমিতি করে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে প্রকৃত কাজ এতটুকুও এগোবে না।

যারা বুদ্ধিজীবী বলে দাবী করেন, তাদেরও যথেষ্ট চিন্তা করার আছে। আমরা আমাদের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গর্ব করি। সচেতন জাতির কাছে তার ভাষা ও সাহিত্য গর্বের বিষয়বস্তু। কিন্তু গর্ব যদি বাস্তব অবস্থার প্রতি আমাদিগকে অন্ধ করে রাখে তাহ'লে পরিণাম শুভ হয় না। বাংলা ভাষায় এখনও মহৎ বিশ্বসাহিত্য রচিত হতে বাকী। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের পরে পৃথিবী বহু দূর এগিয়ে গেছে। তাদের ভাঙ্গিয়ে আর কত-দিন চলবো? তাছাড়াও বাকী রয়েছে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দান করার উপযুক্ত অবস্থা তৈরীর কাজ। তজ্জন্য আবশ্যক অসংখ্য গ্রন্থ। যে সরকারই হোক তার কাজ নীতি প্রণয়ন এবং যথাসম্ভব অর্থসংস্থান (সে অর্থও আমাদিগকেই যোগান দিতে হবে)। কিন্তু প্রকৃত কাজ করতে হবে বুদ্ধিজীবীদিগকেই। যারা চায়ের টেবিলে এমন কি অনেক সময় যুবতী নারী পরিবৃত হয়ে সুরার টেবিলেও নানা জটিল বিষয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠান, তারা কি কখনও চিন্তা করেছেন, ঐ কাজগুলো কে করে দেবে! কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আজ অবধি সর্ব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দানের উপযোগী ক'খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন? এ কাজটা আমাদের জন্যে কে বা কারা করে দেবেন এ প্রশ্ন তারা নিজেদেরকে কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন কি? সরকারী কর্মচারীরা আমাদেরই ভাই বেরাদর। তারা মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার করার কি উদ্যোগ আজ অবধি নিয়েছেন? লেখক-সাহিত্যিককে কি মর্যাদা দিচ্ছেন তারা? আমাদের দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীকে যদি পদাধিকার বলে বুদ্ধিজীবী বলা হয় তাহলে কি খুব নিন্দা করা হয় তাদেরকে? আমরা বহু দাবী উত্থাপন করি। সরকারী বেসরকারী কর্মচারীগণও তাতে যুক্ত থাকেন। কিন্তু দাবী উত্থাপনের সময় আমরা কি কখনও চিন্তা করে দেখেছি যে, দাবী পূরণও করতে হবে আমাদেরকেই? রাজনৈতিক সরকার নির্দেশ দিতে পারেন। নির্দেশ তারা দেনও এবং ভবিষ্যতেও নির্দেশ দেবেন। কিন্তু নির্দেশ দিলেই কি কাজ হয়? দেশে যৎসামান্য শিল্প আছে। সেগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। সরকার ঐগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে কেন? ট্রেড ইউনিয়নিজমের মূলমন্ত্র দুনিয়ার শ্রমিক এক হও। বাংলাদেশে মে দিবসও প্রতিপালিত হয়। তা সত্ত্বেও

শ্রমিক সংগঠনে আঞ্চলিক আনুগত্য সক্রিয় হয় কেন এবং কেমন করে? সুতরাং নির্দেশ ও নীতির মূল্য তখনই যখন সেগুলো পালিত হয়।

আমরা আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার গর্ব করি। সরল গ্রামীণ জীবন আমাদের চোখে মায়ার সৃষ্টি করে। 'নক্সিকাঁথা' দেখলে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে, আমাদের এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিই জাতিকে এখন পর্যন্ত ধর্ম-ভিত্তিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে রেখেছে? এবং এই সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতাই আমাদের পশ্চাদ্‌পদতারও হেতু? সত্য বটে আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারের সব কিছুই আর মন্দ নয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা সমাজের এই পশ্চাদ্‌পদতার নিন্দায় সোচ্চার তারা ঐ মন্দ দূর করার কার্যে কতটুকু আত্মনিয়োগ করছি? বুদ্ধিজীবীদের সংগে এদেশের প্রকৃত সমাজের কতটুকু যোগসূত্র আছে? বুদ্ধিজীবিগণ একটি উন্নাসিক পরগাছা সম্প্রদায় বললে কি খুব অন্যায় করা হয়? পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে, খাদ্যে এবং কর্মে যাদের সাথে দেশের শতকরা নব্বই জন মানুষের কোন সাদৃশ্য নেই তারা কখনও সমাজের পশ্চাদপদতা দূর করতে পারেন না। অধিকতর মন্দ হলে যেমন মন্দ দূর করা যায় না তেমনি মন্দকে না জেনেও মন্দ অপসারিত করা যায় না। সফল সাহিত্য কর্ম তাকেই বলা হয় যার প্রত্যেকটি চরিত্রকে সমবেদনার তুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়। ঘৃণা করে নাক সিঁটকিয়ে মানুষের চরিত্র সংশোধন করা যায় না। নির্দেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত অনেক বেশী কার্যকর। রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী উভয় শ্রেণীর জন্যেই এ-নীতিবাক্যটি সমান সত্য। এ-দেশের মানুষ এক সময়ে মাথাপিছু বছরে গড়ে মাত্র তিন গজ বস্ত্র ব্যবহার করতে পারতো। মহাত্মা গান্ধী ব্যারিষ্টার এবং বিত্তশালী ব্যক্তি হয়েও নিজের জন্যে ঐ তিন গজ বস্ত্র বেছে নিয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি কোট প্যান্টের দেশে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে লুংগী-পাঞ্জাবি পরে সমাজ-তন্ত্র প্রচার ও তার বাস্তবায়নের কার্যে অবতীর্ণ হলে সমাজতন্ত্রের জাত যাবে না। পশুপক্ষী অথবা যুবতী নারীর ছাপমারা বস্ত্রের বুশ-শার্ট ও প্যান্ট পরে মার্সেডিস টয়োটা গাড়ী চালিয়ে সমাজতন্ত্র প্রচার করতে গেলে জনমনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগ্রত হবে, দরিদ্রের দেশে নেতা অত

টাকাকড়ি পান কোথায় ? দেশের সকল মানুষের জন্যে জীবিকার ঐ রকম মান নিশ্চিত করার পূর্ব পর্যন্ত প্রচারকের কিঞ্চিৎ সংযত হওয়া ভালো নয় কি ?

যে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ আমাদের সমাজের অস্থিমজ্জায় এখন পর্যন্ত মিশ্রিত তার স্থলে শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগসুলভ মূল্যাবোধের অধ্যাসন খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। সে কাজ সম্পন্ন করতে পারলেই শুধু সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব।

১৯৭৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী উদযাপনের দিনটিতে আসুন আমরা এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হই। এ পবিত্র দিবসটি যাতে উত্তরকালে একটি প্রহসনে পরিণত না হয় তজ্জন্য এখন হতেই সাবধানতা অবলম্বন করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এবং আমি মনে করি এখন হতে বিচ্ছিন্নভাবে যার যেমন খুশী উদযাপিত না হয়ে এ-দিবসটি জাতীয় মর্যাদায় এবং জাতীয় ভিত্তিতে উদযাপিত হওয়া উচিত।

আবারও মার্কস থেকে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। মার্কস বলছেন, "মহান ফরাসী বিপ্লব এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বৃটিশ বিপ্লবে পরলোকগতদের ছায়া নতুন সংগ্রামকে বল ও ভূষণ দানের জন্যেই উপস্থিত করা হয়েছিল; ভাঁড়রূপে উপস্থিত করা হয়নি। করণীয় কাজের মধ্যে একটি কল্পিত ঔজ্জ্বল্য দান ছিল তার উদ্দেশ্য। কার্য সম্পাদন হতে বিরত থাকার অজুহাতরূপে কখনও পরলোকগতদের ছায়া উপস্থিত করা হয়নি। বিপ্লবের মূল বস্তু পুনরাবিষ্কারের অকৃত্রিম প্রচেষ্টা ছিল তার পশ্চাতে। ভূত তৈরী করে তাকে বিচরণ করতে দেয়ার উদ্দেশ্য, তাদের ছিল না।"

[জনপদ—২১. ২. ৭৩]

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় রেনেসাঁর ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে ইতিমধ্যে দেশে এবং বিদেশে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি এরূপ একটি গ্রন্থ পাঠ করছিলাম। রেনেসাঁ শব্দের প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। সে যাই হোক, রেনেসাঁ যে সুপ্রাচীন অতীতে ফিরে যাওয়া নয় তা যেমন ঠিক, তেমনি অতীতকে সম্পূর্ণরূপে বর্জনও নয়। বর্তমান পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয়তার আলোকে অতীতকে উপলব্ধি এবং উভয়ের সংমিশ্রণে ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ নির্ণয়কেই সম্ভবতঃ রেনেসাঁ বুঝায়। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁয় আমরা তাই দেখতে পাই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার স্পিরিট বা মর্মবাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকালীন ইয়োরোপীয় মানুষ একদিকে বিসর্জন করছে অন্ধকার যুগের যাবতীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি এবং অন্ধ বিশ্বাস, অপরদিকে সম্প্রসারিত করে চলছে, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং কারিগরি কলাকৌশল প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিসর। প্রকৃতিকে জয় করার চলছে অবিরাম প্রচেষ্টা। জন্ম নিচ্ছেন এ্যানাসাইক্লোপেডিষ্ট ডেডিরট (Dedirot), ফিজিওক্র্যাট (Physiocrat) অর্থনীতিবিদ কুইজনে, সমাজবিজ্ঞানী রুশো, বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও, কপার্নিকাস, দ্যাকার্তে, দার্শনিক গিওর্ডানো ব্রুনো, বেনথাম, হবস, বার্কলে, কান্ট এবং সেক্সপীয়র, বোকাসিয়ো, রেবেলাঁ, সারভানটিস, ভলতেয়ার প্রমুখ সহ অসংখ্য কবি, কথাশিল্পী এবং নাট্যকার।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ একটি সর্বাত্মক সামাজিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের রাজনৈতিক ও সামাজিক ফলশ্রুতিরূপে আমরা প্রথম পর্যায়ে দেখতে পাই ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং সেটা স্থিতিশীল হওয়ার সাথে সাথে জাতীয়ভিত্তিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের উৎপত্তি। দ্বিতীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সৃষ্টি এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার

প্রবর্তন। তৃতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি অর্থনৈতিক সাম্যবোধ, যার রাজনৈতিক ফলশ্রুতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। সংক্ষেপে কয়েক শ' বৎসর কাল ধরে অব্যাহত ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ আন্দোলনের এই হচ্ছে অবদান। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ আন্দোলনের তরঙ্গ ইয়োরোপের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন দেশকেও কমবেশী আঘাত করেছে এবং তার ক্রিয়া এখন পর্যন্ত সমাপ্ত হয়নি।

উল্লিখিত গ্রন্থটির নাম এবং তার বিষয়বস্তু পাঠ করার পর আমার মনে যে প্রশ্নটি জেগেছে সংক্ষেপে সেটি হলো ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি সত্য সত্যই একটি দীর্ঘকালব্যাপী রেনেসাঁ আন্দোলনের ফলশ্রুতি? সন্দেহ নেই, সুদীর্ঘ দু'তিন হাজার বৎসরের ইতিহাসে বাংলাদেশ এই সর্বপ্রথম একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। এটাও সত্য যে, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করলেও বাংলা-দেশের মানুষ তার নিজস্ব মনোবলের সাহায্যেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন মানে একটি সুদূরপ্রসারী বিপ্লব সাধন। কিন্তু এ-সব সত্য স্বীকার করে নেয়ার পরেও আমার প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। বরং নতুন প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। নতুন প্রশ্নটি হলো ঃ শত্রুপক্ষের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব এবং একগুঁয়েমি বাংলাদেশের মানুষকে দেয়ালঘেঁষা করে দেয়ার ফলে তারা আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল কিনা এবং সেই আত্মরক্ষার সংগ্রামই পরিণামে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে কিনা? ইতিহাসে অনেক সময় এমন সব ঘটনা ঘটে যাকে বলা হয় ইতিহাসের খেয়াল। স্মরণীয় যে, আত্মোপলব্ধি এবং আত্মরক্ষা এক বস্তু নয়। জাতীয়তাবাদ হচ্ছে জাতির আত্মোপলব্ধি। জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম। জাতীয়তাবাদের মধ্যে সর্বপ্রকার ধর্ম ও আস্থার স্থান আছে সত্য, কিন্তু জাতীয়তাবাদ ঐগুলোর মিশ্রণ নয়। জাতীয়তাবাদ আলাদা উপলব্ধি। তার শক্তি সবার ঊর্ধ্বে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ভাষা, আহার্য, পোশাক, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি বহুকিছু উপকরণ নিয়ে আধুনিক জাতীয়তাবাদ গঠিত হলেও তার ভূমিকা এবং ব্যাপ্তি অত্যন্ত বৃহৎ। ধর্ম দ্বারা জাতির রাষ্ট্র গঠিত হয় না। শুধু ভাষা দ্বারাও হয় না। ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং আরবী ভাষাভাষী

আরব জগত বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও বাধে। কোন কোন আরব রাষ্ট্রের প্রকৃত বন্ধু ভিন্ন ভাষাভাষী খ্রীস্টান রাষ্ট্র ঃ শত্রু অন্য আরব রাষ্ট্র অথবা আরবী ভাষাভাষী মানুষ। অপরদিকে ধর্মে সবাই খ্রীস্টান এবং ইংরেজী ভাষাভাষী হয়েও ইংলণ্ড এবং আমেরিকা পৃথক রাষ্ট্র। ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডও পৃথক রাষ্ট্র। খ্রীস্টান জগত বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত। সমাজতান্ত্রিক জগতেও একই অবস্থা বিদ্যমান। মার্কসবাদী হয়েও রাশিয়া এবং চীন, আলবেনিয়া এবং কিউবা পৃথক রাষ্ট্র। চীন এবং রাশিয়ার মধ্যে সদ্ভাবেরও অভাব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ যুগের পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদের সমতুল্য অন্য কোন শক্তি নেই। অপরাপর উপলব্ধির স্থান তার পরে।

বাংলাদেশের মানুষ কি সুদীর্ঘকালব্যাপী রেনেসাঁ আন্দোলন চালিয়ে এরূপ সদর্থক (Positive) জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে? সত্য বটে, পরলোকগত অধ্যাপক আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওয়াদুদ প্রমুখ পরিচালিত 'শিখা'র বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। কিন্তু তার প্রভাব ছিল কতটুকু? শিখা-গোষ্ঠীর ঐ আন্দোলন বা আলোড়ন সত্ত্বেও হাজার বছরের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের একমাত্র কালজয়ী প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলাম 'কাফের' ভূষণে ভূষিত হয়েছিলেন। পরলোকগত কাজী আবদুল ওয়াদুদ হয়েছিলেন নির্যাতিত এবং সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। কাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যিনি চালিয়েছিলেন তিনি আবার মুসলিম লীগ—এমন কি কৃষক সমিতির নেতৃত্বও করেছিলেন। হয়ত বলা হবে, ওটা ছিল মুসলিম লীগের ডানপন্থী নেতৃত্ব। কিন্তু মুসলিম লীগের বামপন্থিগণ কি প্রকৃত প্রস্তাবে রেনেসাঁর নামে রিভাইভালিজম করেন নি? তথাকথিত ঐ বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের লেশমাত্রও ছিল না। থাকলে তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিশ্বাসী তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং মধ্য-ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বর সাথে গাঁটছড়া বাঁধতেন না ঃ দেড় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বাধীন একটি অঞ্চলের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি অস্বাভাবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় করতেন না সর্বশক্তি নিয়োগ। বাংলাদেশকে আলাদা রাষ্ট্র করলে তাঁদের জাতীয়তাবোধ প্রমাণিত হতে পারতো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। একদিকে চলতে থাকে অবাধ মদ্যপান, ব্যভিচার এবং সুদ আদান-প্রদান প্রভৃতি যাবতীয় অনৈসলামিক কার্যকলাপ, অপরদিকে সে-সব মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ব্যক্তিই ধর্মের নামে দেশ শাসন করতে থাকে। সেই সঙ্গে আসে বাংলা ভাষার উপর আঘাত। সত্য বটে, বাংলা ভাষার উপর আঘাত আসার সাথে সাথেই বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেঃ শাহাদত বরণ করেন বহু তরুণ। কিন্তু তখনই কি আমাদের সকলের চেতনা ফিরে এসেছিল? হয়েছিল কি চিন্তার মুক্তি? দানা বেঁধেছিল কি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র? একদিকে ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন বাংলার তেজবীর্য তরুণ, অপরদিকে এ দেশের শিক্ষিত লোকের সহায়তায় চলেছে অত্যাচারের ষ্টীমরোলার। ১৯৪৮ সালে এমন কি ১৯৫২ সালে বিদ্রোহ করলেও তিরিশ লক্ষ নর-নারীকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হতো না।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ১৯৫২ সালের পর কিছু কিছু কাজ হয়েছে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র কিছু কিছু উচ্চারিত হয়েছে সাহিত্যে; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান নামক একটি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রকে অধিকতর 'খাঁটি পাকিস্তান' অর্থাৎ সর্বপ্রকার আধুনিকতামুক্ত প্রাগৈতিহাসিক রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলন সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে জোরে-শোরে চলেছে।

এমনি পরিহাস যে, সে আন্দোলনও চলছে বামপন্থা বা প্রগতির নামে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত সে-শক্তি তার সাধ্যমতো কাজ করেছে। সাফল্য লাভ না করার কারণ যেমন পূর্বেই বলেছিঃ যতটা না বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, তার চেয়েও বেশী দুর্বৃত্ত পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর আকস্মিক আক্রমণ, যার ফলে বাংলাদেশের মানুষ আত্মরক্ষার সংগ্রামে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, ওটা জৈব স্বভাব।

স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে মনে হয়েছিল যে, বাংলার মানুষ বুঝি-বা তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেঃ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে জাতীয়তার বন্ধনেঃ নানা উদ্ভট বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে তার চিন্তা ও বুদ্ধি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের দু'বছর পরে দেখছি দেশের যেন পুনর্মূষিকভব দশা হচ্ছে। ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনীতি করার চেষ্টা পুরোদমে চলছে। প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয়

চতুঃশিলার বিরুদ্ধতা করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে কবর দেয়ার জন্যে তৎপর সকল মহল। গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী তুলে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নস্যাৎ করায়ও তৎপর কোন কোন মহল। অথচ কে না জানে স্বাধীনতা অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। ওটাকে রেশন করে উপভোগ করতে হয়। ইসলামসহ যাবতীয় ধর্মের মর্মবাণীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্যকলাপকে ধর্মের লেবাস পরিয়ে জনসাধারণকে গোমরাহ করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিভিন্ন মহল। যুগোপযোগী আইন-কানুন বিধি-বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কার্য চলছে। তার পাশাপাশি চলছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে পুরাতন পাকিস্তানী কৌশলে প্রচারণা। রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সম্মেলনে মিলিত হচ্ছেন যুদ্ধকালে পাকিস্তানী বাহিনীকে সহায়তাকারী বর্তমানে ক্ষমাপ্রাপ্ত তথাকথিত আলেমগণ।

পূর্বেই বলেছি, প্রকৃত রেনেসাঁর একটি ফলশ্রুতি জাতীয়তাবাদ। অপরাপর ফলশ্রুতির মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন যুক্তিনির্ভর সমাজ এবং শক্তিমান মুক্তমন ও সাহিত্য। জাতীয়তাবাদ এবং বাধামুক্ত সাহিত্যের রয়েছে পজিটিভ ভূমিকা। জাতীয় জীবনে বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু বৈপরীত্য থাকতে পারে না। জাতি একটি প্রবহমান নদী। জাতি কখনও সমান্তরালে প্রবাহিত দু'টি বিপরীতমুখী জলস্রোত হতে পারে না। তেমন অবস্থাকে জাতি বলা যায় না। সমস্ত চেতনার উপরে জাতীয় চেতনা। আভ্যন্তরীণ বিরোধ থাকে এবং থাকা বাঞ্ছনীয়ও বটে; কেননা জিজ্ঞাসাই উন্নতির উৎস। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিরোধ থাকে জাতীয় অগ্রগতি অব্যাহত রাখা অথবা তার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার পথ সম্বন্ধে, মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে নয়। বিরোধ এবং বৈপরীত্য এক বস্তু নয়। জাতি কখনও নিজের দোষ এবং অক্ষমতা অনুপস্থিত তৃতীয় পক্ষের উপর চাপিয়ে দিয়ে বালখিল্য আচরণে লিপ্ত হয় না। জাতীয় নেতৃত্ব—তার দলগত পরিচয় যাই হোক—কখনও আপন দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং নানাবিধ দোষ ঢাকা দেয়ার জন্যে দেশের মানুষকে মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত করে না—আপন চৌর্যাপরাধ এবং দুর্নীতিপরায়ণতা চাপা দেয়ার জন্যে গলাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে না—উপস্থিত করে না কল্পিত অন্য পক্ষ। এ শ্রেণীর কার্য নেগেটিভ আচরণ। জাতির প্রত্যেকটি কার্য হবে পজিটিভ; কেননা জাতিই জাতির সর্বপ্রকার উন্নতি-অবনতির জন্যে দায়ী।

অথচ অদ্যাবধি বাংলাদেশের মানুষের আচরণ দেখলে মনে হয়, তারা যেন তাদের মঙ্গল অন্যেরা করে দেবে এ আশা করে। কর্মবিমুখতা প্রায় সর্বত্র। গড়ার কাজে ঐকান্তিক নিষ্ঠার চাইতে ভাঙ্গার দিকে প্রবণতাই যেন অধিক। দায়িত্ব গ্রহণের চাইতে দায়িত্ব পরিহারের লক্ষণই দেখা যায় বেশী। পাকিস্তানের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের সমস্ত অপরাধ ভুলে যাওয়ার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছেঃ প্রচারিত হচ্ছে ইসলামিক ঐক্যের কথা। অথচ এ প্রশ্ন কি উদয় হওয়ার নয় যে, ধর্ম যদি জাতি গঠনের উপাদান হতো, যদি মুসলমান মাত্রেই হতো অপর মুসলমানের অতি আপন ও প্রিয়জন, তা'হলে বাংলাদেশের তিরিশ লক্ষ নিরপরাধ নর-নারীকে পৈশাচিক আনন্দে হত্যা করলো কেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী? কেন চলছে হজরত ইমাম হাসান, হোসেন এবং হজরত মাবিয়ার সময় থেকে মুসলমানে মুসলমানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহ? কেন যুদ্ধ হয়েছে আব্বাসীয় এবং উম্মায়াদের মধ্যে? অথচ পবিত্র কোরান শরীফের নির্দেশানুযায়ী এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করতে পারে না। যে ব্যক্তি হত্যা করে সে মুসলমান নয় অথবা যাকে হত্যা করা হয় সে মুসলমান নয়। যুদ্ধে শহীদ বাংলাদেশের তিরিশ লক্ষ নর-নারী কি তবে কাফের ছিল? তাই বলতো বটে পাকিস্তানী শাসক শ্রেণী। এখানে তাদের পক্ষে যে সমস্ত বাঙ্গালী ছিল তারাও তাই বলতো। পাকিস্তানের সহযোগী বাঙ্গালীগণ আয়োজিত পল্টনের সেই বিখ্যাত জনসভার কথা এখনই ভুলে যাওয়ার কথা নয়। সেই সভার নেতৃবৃন্দ মঞ্চ থেকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে। সেই জেহাদে তখন তারা জয়লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু কোন কোন মহলের বর্তমান আচরণ এবং সুচতুর প্রচার এবং নানা নামের সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন দেখে মনে হয়, বাংলাদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত ভালোভাবেই চলছে। নেতৃত্বের ব্যর্থতা, ব্যাপক দুর্নীতিপরায়ণতা, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্দশার চাপে দিশেহারা সাধারণ মানুষ এমন কি শিক্ষিত মানুষও তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছেন। দৃষ্টিভঙ্গী পজিটিভ থাকছে না। হয়ে যাচ্ছে নেগেটিভ। নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করবো না—পালন করবে অন্যে। চীন, পাকিস্তান, আমেরিকা, ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশই যেন আমাদের ভালো বা

মন্দ করবে ; অথবা মঙ্গল করবেন যারা পশ্চিমে বাস করেন সে সমস্ত মুসলমান।

কাজেই বলছিলাম—বাংলাদেশে প্রকৃত রেনেসাঁ হয় নি। শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেটাও বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত। শুরুতেই তার মূলোৎপাটন না করতে পারলে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে পারে।

(ইত্তেফাক ২৬ ৩. ৭৪)

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ

বড় রকমের কোন ঘটনা চোখের সামনে ঘটলে তার আকস্মিকতায় আমরা চমকিত হই। চমকিত হওয়াটা আসলে তন্মুহূর্তে মানসিক প্রস্তুতির অভাব প্রমাণ করে মাত্র—ঘটনার অনিবার্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রমাণ করে না। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের সমস্ত বড় ঘটনা সুদীর্ঘকাল ব্যাপী প্রস্তুতির পর ঘটে। তিলে তিলে জমতে থাকে মাল-মসলা। আঁটঘাট বেঁধে সব দিক থেকে প্রস্তুতি চলে। সব রকম উপকরণ জমা যখন শেষ হলো তখন সহসা একদিন বিস্ফোরণ ঘটে। তার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় প্রাচীন সৌধ। তখন বিস্ফোরণের ব্যাপকতা এবং তার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি, কিন্তু অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছে মনে করি না। অবশ্য বড় রকমের ঐতিহাসিক ঘটনামাত্রেই সাধারণ মানুষের কল্যাণকর হয় না। ভ্রান্তির ফলেও অনেক সময় বড় রকমের ওলট-পালট ঘটে। সেগুলোকে দুর্ঘটনা বা ঐতিহাসিক অপঘাত বলা হয় বটে কিন্তু তবু ঘটনার অনিবার্যতা প্রমাণ করা যায়। ভ্রান্তির বারুদ যার মাল-মসলা তার বিস্ফোরণে অকল্যাণ হওয়াই স্বাভাবিক। পাকিস্তান এরূপ একটি অপঘাত বা দুর্ঘটনা ঃ কিন্তু প্রায় শত বৎসর ধরে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষীয় হিন্দু-মুসলমান উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী মিলে যে ভ্রান্তির বারুদ জমা করছিল তার বিস্ফোরণ ঘটতই। পাকিস্তান নামক ঐতিহাসিক অপঘাত সেই বিস্ফোরণ।

ইতিমধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও বাঙ্গালী মুসলমানের মন ও মানস ১৯৭৭ সালেও পূর্বের স্থান অতিক্রম করে অল্প দূর অগ্রসর হয়েছে মাত্র—গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে এখনও বেশ কিছু পথ বাকী। আমার এ উক্তির কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা যথাস্থানে দেয়ার চেষ্টা করবো। এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, বাঙ্গালী মুসলমানের এই অনগ্রসরতা যতই অবাঞ্ছিত হোক তার পশ্চাতে কারণের অভাব ছিল না। কিন্তু এটাও ঐতিহাসিক

সত্য যে, বাঙ্গালী মুসলমানের এই অনগ্রসরতার মধ্যেও ধীরে ধীরে বাংলা-দেশের জন্মের বীজ সঞ্চিত হচ্ছিল।

আধুনিক ইউরোপীয় অর্থে যা জাতীয়তাবাদ সে বস্তু ভারতবর্ষীয় মানব-চিত্তে কখনও আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। সাম্প্রদায়িক চেতনাকে জাতীয়তা-বাদ রূপে প্রচার করা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এ দোষে দোষী। হিন্দুরা তাজমহল এবং দিল্লী আগ্রার দুর্গকে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প-রূপে গ্রহণ করেছে, এমন কি হিন্দু-মুসলমান রাজ-রাজড়া স্বেচ্ছায় আত্মীয়তা সূত্রেও আবদ্ধ হয়েছে কিন্তু মুসলমানকে ভারতীয়রূপে গ্রহণ করতে পারেনি। সত্য বটে হিন্দু ঐতিহাসিককালেব ভারতীয়, কিন্তু মুসলমানের ন্যায় ভারত-বর্ষে হিন্দুর আগমনও আক্রমণকারীরূপে। একমাত্র পার্থক্য মুসলমান হিন্দুর সামাজিক প্রথা এবং আচার-আচরণের মধ্যে লীন হয়নি। হিন্দুর ইতিহাস প্রাচীন। কিন্তু মুসলমানের আগমনও কম প্রাচীন নয়। অপরদিকে বাঙ্গালী হিন্দু ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য এবং ইংরেজ জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। জন্মগ্রহণ করেছেন রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় উদারপ্রাণ সংস্কারক ব্যক্তি। কিন্তু তারাও হিন্দু-সম্প্রদায়ের বৃত্তের বাইরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি, অথবা সক্রিয়ভাবে সে চেষ্টা করেননি। ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনে পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র বরং বিপরীত পথ ধরলেন। হিন্দুত্বকে জাতীয়তারূপে প্রচার করলেন তিনি। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ভক্তগণ মিলে তাঁর মিলন-সভাকে অনতিকালমধ্যে ধর্মে রূপান্তরিত করলো।

অপরদিকে বহিরাগত মুসলমানের পুরুষানুক্রমিক জন্মভূমি ভারতবর্ষ হলেও সে তার জন্মভূমিকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করতে পারেনি। এই হঠ-কারিতার কারণ বহুবিধ। তার একটি সম্ভবতঃ এই যে যদিও জন্মলগ্নের কিছুকাল পর হতেই মুসলিম জগৎ বহু স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল কিন্তু তার ধর্মের মূলমন্ত্র ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ বিরোধী। বহুকাল হতে ভৌগলিক আনুগত্য এবং তার বিপরীত দর্শনের মধ্যে সংঘাত চললেও এবং ক্রমে ক্রমে ভৌগোলিক আনুগত্য অধিক প্রাধান্য লাভ করা সত্ত্বেও সংশয় এবং উড়ি উড়ি ভাব তার মধ্যে সতত সক্রিয় ছিল। অন্য একটি জটিলতাও প্রবেশ করেছিল। বহিরাগত মুসলমান স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত

মুসলমানকে প্রকৃত মুসলমানরূপে গ্রহণ করেনি। বাংলা ভাষা তাদের কাছে ইংরেজীর ন্যায় এমন কি তার চেয়েও অধিক অগ্রহণীয় ছিল। ১৮৮২ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে হাণ্টার কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদানকালে ফরিদপুর জেলার এক গণ্ডগ্রামের সন্তান নবাব আবদুল লতিফ বাঙ্গালী মুসলমানকে কোন্ মাতৃভাষা শিক্ষা দেয়া হবে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ঃ "নিম্নশ্রেণীর লোক (মুসলমান) নৃতাত্বিক বিচারে হিন্দুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত সুতরাং তাদের প্রাথমিক শিক্ষা বাংলা ভাষায় হওয়া উচিৎ। কিন্তু তার পূর্বে উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুর সংস্কৃতবহুল বাংলাকে খাঁটি বাংলায় পরিবর্তিত করতে হবে এবং মুসলমানের দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে সমস্ত আরবী-ফারসী জাত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলো তার মধ্যে যোগ করতে হবে। এ জন্য আইন আদালতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাকে আদশরূপে গণ্য করা যেতে পারে। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানের মাতৃভাষ রূপে উর্দুকে অনুমোদন করে নেয়া উচিৎ। শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে তারা উর্দু ভাষা ব্যবহার করে।"

আবদুল লতিফের উক্তি দু'টি বিষয় প্রমাণ করে। প্রথমতঃ, বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে উঁচু-নীচুর ভেদ অত্যন্ত প্রবল ছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই বৈষম্য হিন্দুর বর্ণভেদের চেয়েও অধিক স্পষ্টভাবে মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছিল। মাতৃভাষার ব্যাপারে অন্ততঃ সকল বর্ণের হিন্দু একমত ছিলেন। কৃত্তিবাস এবং ভারতচন্দ্রের সহজ সরল ভাষা বর্জন করে বাংলা ভাষায় বহুলভাবে সংস্কৃত শব্দ আমদানী এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাধান্য আনয়ন ব্যাপারে হিন্দু লেখক সম্প্রদায় নিম্নবর্ণের হিন্দুর বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হননি। মুসলমান তার মাতৃভাষার ব্যাপারেও একমত ছিল না। বহিরাগত অভিজাত মুসলমান উর্দুকে মাতৃভাষা জ্ঞান করতো। এমন কি তৎকালে গণ্ডগ্রামের সাধারণ মুসলমানের সন্তান কিছু লেখাপড়া শিখে সরকারী চাকুরী পাওয়া মাত্র মাতৃভাষা বর্জন করতেন। বিদেশাগত সম্ভ্রান্ত মুসলিম কন্যার পানিগ্রহণ করে তারা অভিজাত হতেন, বাংলা ছেড়ে উর্দু ধরতেন। আবদুল লতিফ তার একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বহু বাঙ্গালী মুসলিম সন্তান এভাবে আপন পরিবেশ ও জাতিত্ব বর্জন করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়সুলভ

ঐক্যও ছিল না।

প্রসংগত আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। এখন প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত যে, বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণের ফল। ধর্মান্তর গ্রহণকারীদের মধ্যে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং আদিম অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্য ছিল—থাকাটাই স্বাভাবিক। নবাবী আমলের অবসানে, বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে সাধারণ মুসলিম জীবনের উপর হতে বহিরাগত সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রভাব দ্রুত লোপ পেতে শুরু করে। তার ঐতিহাসিক কারণ সুবিদত। ফলে গ্রামীণ সাংস্কৃতিক জীবন হতে হিন্দু-মুসলিম বৈশিষ্ট্য প্রায় লুপ্ত হয়। এ সময়ে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত। গ্রামীণ মুসলিম সমাজে মুসলমানী বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা তথা হেদায়েত করার জন্য পশ্চিম ভারতীয় আলেমগণ অথবা তাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিগণ সচেষ্ট হন। এই বিশেষ অধ্যায়ে জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলী এবং তার বংশধরদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাদের পরিশ্রম এবং প্রচারের ফলে বাঙালী মুসলমান পুনরায় মুসলমানী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তারা অবাঙ্গালী নেতৃত্বের প্রভাবাধীনও হয়ে পড়ে। এই অবাঙ্গালী নেতৃত্বের মন ও মানসে জাতীয়তাবাদী চেতনার অভাব ছিল।

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত অবাঙ্গালী অভিজাত মুসলিম নেতৃত্ব পরবর্তীকালে বৃটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতায়ও বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। ১৮৭১-৭২ সালের দিকে প্রদত্ত মওলানা কেরামত আলীর ফতোয়া তার প্রমাণ। এ অবস্থার সাক্ষাৎ আমরা বিংশ শতাব্দীতেও পাই। বাঙালী ফজলুল হকের নেতৃত্ব বর্জন করে পশ্চিমা জিন্নাহর নেতৃত্ব মনে প্রাণে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি বাঙ্গালী মুসলমান। এমন কি স্বয়ং ফজলুল হকও ভুল করেছেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তাঁর কৃষক প্রজা দল জয়ী—তিনি নিজে জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে। সেই মুহূর্তে তিনি জিন্নাহর নেতৃত্ব মেনে নিলেন। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসেমও একই ভুল করেন। ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐ আনুগত্য প্রদর্শিত হলে নিন্দনীয় হতো না। কিন্তু জিন্নাহ তখন সাম্প্রদায়িক 'জাতীয়তা' করছেন গোটা স্ববিরুদ্ধ ধারণা। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে যে জাতি হয় না তার প্রমাণ দিতে হয়েছে তিরিশ

লক্ষ নরনারীর রক্ত দিয়ে। এই ভ্রান্ত চেতনার লালন-পালন ও বিস্তারের ব্যাপারে তথাকথিত মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তারা ইকবালকে স্বপ্নদ্রষ্টা কবি বলেছেন, নজরুলকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেননি—এমন কি তার উপর প্রদত্ত কাফের ফতোয়াও নীরবে হজম করেছেন।

দেড় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত অঞ্চলের অপরিচিত এবং ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সাথে এক রাষ্ট্রীয় বন্ধনে যুক্ত হওয়ার জন্য জাতীয়তাবোধহীন তৎকালীন নেতৃত্ব এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সমান দায়ী। পুনরায় ওয়াহাবী আন্দোলনের উল্লেখ করতে হচ্ছে। গোঁড়া ওয়াহাবী নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণা করেছিল। হয় জেহাদ করে দেশকে পুনরায় দারুল ইসলাম করো অথবা হিজরত অর্থাৎ দেশ ছেড়ে চলে যাও। জাতীয়তাবাদী কখনও স্থায়ীভাবে দেশ ছাড়ার বিষয় চিন্তা করে না দেশে থেকেই তারা দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে। সুতরাং ওয়াহাবী আন্দোলনও বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত না হওয়ার জন্য দায়ী।

আলীগড় আন্দোলনও বাঙ্গালী মুসলমানকে কম বিভ্রান্ত করেনি। স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন ইংরেজভক্ত—তিনি এবং তার অনুসারিগণ বৃটিশ শাসনকে "আল্লাহ্‌তালার আশীর্বাদ জ্ঞান করতেন।" সিপাহী বিদ্রোহের কারণ নামক গ্রন্থে তিনি কোম্পানীর দেশী সেনাবাহিনীকে হিন্দু-মুসলমানে বিভক্ত দু'টি বিবদমান দলরূপে গড়ে না তোলার জন্য বৃটিশ সরকারের নিন্দা করেছেন। আলীগড় কলেজে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হতো বটে কিন্তু ইংরেজ জাতির মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ ছিল সেটা শিক্ষা দেয়া হতো না। সেখানে একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা এবং শ্রেণী আভিজাত্য শিক্ষা দেয়া হতো। তৈরী করা হতো ইংরেজের অধীনস্থ একটি উন্নাসিক মুসলিম হেরেনফোক শ্রেণী। স্যার সৈয়দ আহমদ বড়লাটের আইন পরিষদে বা বড় চাকুরিতে অনভিজাত শ্রেণীর যোগ্য লোকের প্রবেশেরও বিরুদ্ধতা করেছেন। হাণ্টারের বইয়ে মুসলমানদের সহানুভূতি উদ্রেক করার জন্যে অন্যভাবে ঠিক এ-মতই প্রকাশ করা হয়েছে। কিছু বাঙ্গালী সন্তান ঐ কলেজে শিক্ষালাভ করতে যেতো। তারা ফিরে এসে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য প্রচার করে এবং জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানের মন বিদ্বিষ্ট করে তোলে। উল্লেখ্য যে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি যাদের হাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ছিল তাদের অনেকে আলীগড় কলেজে শিক্ষালাভ করেছিলেন। শিক্ষালাভ না করলেও আলীগড় আন্দোলনের প্রতি তাদের বিশেষ দুর্বলতা ছিল এবং স্যার সৈয়দ আহমদকে মনে করতেন মুসলিম সমাজের মুক্তিদাতা।

আগেই বলেছি : ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি না হওয়ার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ও সমান দায়ী। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জবাবে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুসলিম লীগের জবাবে হিন্দু মহাসভা গঠন ভারতের তৎকালীন জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জন অধিবাসীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক নয়। মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সাময়িক রাজনৈতিক সুবিধার জন্য প্যান-ইসলামিজম অর্থাৎ Extra territorial loalty বা দেশাতিগ আনুগত্যে বিশ্বাসী খেলাফতীয়দের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। এ কার্য কংগ্রেসের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব প্রমাণ করে। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনও জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য কি না সন্দেহ। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত-বহুল কৃত্রিম ভাষায় পরিণত করার টোলীয় প্রচেষ্টা যেমন নিন্দনীয় তেমনি নিন্দনীয় দোভাষী পুঁথিতে ব্যবহৃত ভাষার খিঁচুড়ি। কিন্তু মনে রাখতে হবে মুসলমানের প্রচেষ্টা সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের প্রচেষ্টা। ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু বহু ভুল করেছে। প্রথমতঃ তারা হিন্দুর সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ জ্ঞান করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল সম্প্রদায়ের সঙ্গে আচরণে সংখ্যাগরিষ্ঠের উদারতা দূরের কথা বরং তারাই যেন সংখ্যালঘু এমন আচরণ করেছে। তৃতীয়তঃ হাজার বৎসর একত্রে বসবাস এবং মুসলিম শাসনামলে ব্যাপকভাবে আরবী, ফারসী ভাষা শিক্ষা করা সত্ত্বেও ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমানের নামের উচ্চারণ পর্যন্ত ভুলে গেলো। শেষোক্ত দিকটি সত্য সত্যই বিস্ময়কর। চতুর্থতঃ তারা স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা মেনে নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে। সুতরাং প্রশ্নটি অন্যভাবেও করা যায়। বাঙ্গালী

তথা ভারতীয় হিন্দু তার প্রতিবেশীকে এতটা অজ্ঞ এবং উদাসীন থাকতে দিল কেন? অবশ্য একজন দোষ করেছে বলে অন্যেরাও দোষ করবে এটা যুক্তি নয়। কিন্তু কোটি কোটি লোকের সমন্বয়ে জাতি তখনই গঠিত হতে পারে যখন সর্বশ্রেণীর মানুষ পরস্পরকে ঘনিষ্টভাবে চেনে এবং জানে। সেই চেনা-জানার প্রচেষ্টা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমাজের সর্বনিম্নস্তরে হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনবোধ হতে উত্থিত সে প্রচেষ্টাকে উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণী বার বার ব্যর্থ করে দিয়েছে।

অনেকে বলে থাকেন ইংরেজের ভাগ করো এবং শাসন করো নীতি ভারতে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি না হওয়ার জন্যে দায়ী। বিদেশী সরকার তার কৌশল প্রয়োগ করবেই। তার মধ্যে সজ্ঞান পা দিয়েছে এদেশের উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষ। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণী ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। মুসলমান আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপীররূপে চিত্রিত করেছে; তিনি পিতাকে বন্দী এবং ভ্রাতৃহত্যা ছাড়াও আরো বহু অপরাধে অপরাধী। হিন্দু শিবাজীকে বানিয়েছে হিন্দু বীর এবং "এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড, ছিন্ন ভারতকে" আবদ্ধ করার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন স্বাপ্নিক। অথচ শিবাজীর সেনাবাহিনীতে মুসলমান সেনাধ্যক্ষ ছিল। তাছাড়া হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রবুদ্ধ হলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু-ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ার অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতো।

আসল ব্যাপার হচ্ছে ইউরোপে কয়েক শতাব্দী ধরে সাংস্কৃতিক বিবর্তন চলেছে। সেই সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতিতে হয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সাংস্কৃতিক এবং শিল্প বিপ্লবের পর ঘটেছে রাজনৈতিক বিপ্লব—স্থাপিত হয়েছে ভৌগোলিক আনুগত্যে বিশ্বাসী রাষ্ট্র—সৃষ্টি হয়েছে জাতীয়তাবাদ নামক এমন একটি বিশেষ বোধ যা সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় আনুগত্য প্রভৃতি সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান করে নিয়েছে। ইউরোপ এক শতাব্দীরও বেশী হলো ধর্ম রক্ষার জন্য ক্রুসেড করে না—ঈশ্বরের ধর্ম রক্ষার ভার ঈশ্বরের জিম্মায় ছেড়ে দিয়েই তারা সন্তুষ্ট। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা অথবা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির জন্যে তারা লড়াই করে। এমন কি গণতন্ত্র রক্ষা, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্যও যুদ্ধ করে। কিন্তু কখনও ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। একমাত্র আয়ারল্যাণ্ডে ছাড়া ইউরোপের অন্য কোথাও ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যাণ্ট সংঘর্ষ হয় না।

বহুকাল পূর্বেই এসব সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের অবসান হয়েছে। ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক এবং শিল্প বিপ্লব ইউরোপীয় মৃত্তিকা হতেই উত্থিত। তার জাতীয়তাবাদ এবং সাম্যবাদ তার মাটির রসেই সৃষ্টি। পক্ষান্তরে ভারতে ইউরোপীয় ভাষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান উভয়ই বহিঃশক্তি—রাজনৈতিক শত্রু কর্তৃক ছলে বলে কৌশলে অধ্যাসিত একটি প্রায় নিঃসঙ্গ পরগাছা। হিন্দু-মুসলমান কেউ ওটাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেনি। উভয় সম্প্রদায় যার যার আত্মার এমন কি অর্থনৈতিক মুক্তিও খুঁজেছে কল্পিত সোনালী অতীতে। বিপ্লবের নামে উভয় পক্ষ রিভাইভালিজমের আন্দোলন করেছে। হিন্দু চেয়েছে বৈদিক যুগে প্রত্যাবর্তন করতে, মুসলমান চেয়েছে প্রাথমিক যুগের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পনঃশাসন। সুতরাং ভাষারূপে ইংরেজী শিক্ষা হয়েছে বটে কিন্তু শিল্পবিপ্লবোত্তর ইয়োরোপীয় জীবনবোধ গৃহীত হয়নি। দীর্ঘকালীন পরাধীনতার এটাই সব চাইতে বড় অভিশাপ। এই অভিশাপের পরিণতি দেশ বিভাগ।

জাতীয়তাবাদীরূপে প্রচারিত আন্দোলনের এই স্ববিরোধ সুচতুর ইংরেজের চোখে ঠিকই ধরা পড়েছিল। তারা এটাকে আপন স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করেছিল মাত্র। তবে এই স্ববিরোধের মধ্যেও তৃতীয় একটি ক্ষীণ ধারা বহুকাল হতেই প্রবহমান ছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্রাট আকবর এ ধারার প্রবর্তন করলেও পরবর্তীকালে এ ধারাটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করে। রাজা রামমোহন রায় ঐ ধারাটির মধ্যে শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন। নানা লোক কাহিনীর মধ্যেও ঐ ধারাটির অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পল্লীর স্বভাব কবিদের রচনাতেও ঐ ধারাটির প্রমাণ মিলে। সেই ধারাটির আবেদন প্রধানত মানবিক হলেও তার মধ্যে বাঙ্গালীত্বের পরোক্ষ আবেদন বিদ্যমান। ইংরেজী শিক্ষিত রাজনীতিক কবি-সাহিত্যিক শত চেষ্টায়ও দেশীয় এবং পাশ্চাত্য মানবিক এবং জাতীয়তাবাদের প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক হতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ এবং কমলাকান্তের দফতরের লেখক। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে বেদ উপনিষদে প্রত্যাগমনকামী এবং ইউরোপীয় উদার রাজনৈতিক মানবতাবাদে বিশ্বাসী। কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামী সঙ্গীত এবং শ্যামা সঙ্গীত সমান দক্ষতার সাথে রচনা করেছেন। আবার প্রকৃত

জাতীয়তাবাদ এবং সাম্যবাদেরও তিনি সব চাইতে শক্তিশালী বাঙ্গালী কবি।

জিন্নাহর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং তার রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে যে স্ববিরোধ দেখতে পাওয়া যায় সেটা আসলে উপরোক্ত দু'টি ধারার বিরোধ। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও সে বিরোধ বিদ্যমান। তিনি একই সঙ্গে রামরাজত্ব এবং জাতীয়তাবাদী ভারত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। বলা বাহুল্য দু'টি দুই বিপরীত মেরুর বস্তু। রামরাজার রাজত্বকালে ভারতে জাতীয়তাবোধ বলে কিছু ছিল না। জাতীয়তাবাদ মিশ্রিত এই মানবতাবাদী স্রোতটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্যাপক নরহত্যা, বাস্তুভিটা হতে কোটি কোটি লোক বিতাড়ন, নারী নির্যাতন প্রভৃতি অমানবিক কার্যাবলী প্রতিরোধ করার উপযুক্ত শক্তি তার ছিল না।

দেশ বিভাগের পরে ক্রমে ক্রমে শেষোক্ত স্রোতটি শক্তি সঞ্চার করতে থাকে। ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্রসমাজেরই সৃষ্টি। এ আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি জাতীয়তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বাংলাদেশের মানুষ এক সঙ্গে এক চেতনা এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করেছে। একত্রে আহার করেছে, এক সঙ্গে বসবাস করেছে। নিঃসন্দেহে এটা প্রকৃত জাতীয়তার পথে বিরাট অগ্রগতি। অগ্রগতি এজন্যেই বলছি যে—শত শত বৎসরের ধ্যান-ধারণা একটি আকস্মিক ঘটনা—সেটা যত বৈপ্লবিক হোক—সম্পূর্ণ দূর করতে পারে না। কিছুকাল আত্মগোপনে থাকার পর পুনরায় সেই অযৌক্তিক এবং জাতীয়তাবিরোধী বোধগুলো জাগ্রত করার চেষ্টা করছে শ্রেণী স্বার্থান্ধ দুশ্চরিত্র দলেরা। তারা পুনরায় ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আপন পাপ ঢাকার জন্যে অনুপস্থিত তৃতীয় পক্ষের উপর সকল অনর্থের দায়িত্ব চাপাতে চেষ্টা করেছে। কিছু কিছু সংবাদপত্রও এ অপচেষ্টায় যোগদান করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিরাশ হওয়ার অবস্থা নয়। বুদ্ধিজীবী মহল—বিশেষ করে লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন বিভ্রান্তি আছে বলে মনে হয় না। তারা মোটামুটি মানবতাবাদী এবং জাতীয়তাবাদী। তবু বাংলাদেশে ত বটেই অপেক্ষাকৃত উন্নত ভারতেও জাতীয়তাবাদ অন্য সর্বপ্রকার ধ্যান-ধারণার সেই উপরে স্থান পেতে পারে

সময় লাগবে। সামন্ততন্ত্র এখন বিদ্যমান নেই বটে, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি বর্জন করা সম্ভব হয়নি ঃ সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ এখনও উপমহাদেশীয় মানব সমাজের বৃহদাংশের উপর প্রভাবশীল। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ শিল্প বিপ্লবের ফল। এই উপমহাদেশেও শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমেই জাতীয়তাবাদ প্রকৃত এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠা করবে। অবশ্য উপমহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে আরো একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হওয়া আদৌ বিচিত্র নয়।

অল্পকাল পূর্বেও, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ শব্দদ্বয় উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক ছিল। তখনও সচেতন বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। তাঁদের কাজই প্রমাণ করে যে অন্ধকারের মধ্যেও আলো জ্বলছিল। জাতীয়তাবাদী চিন্তার ফল্গুধারা বাংলার সমাজদেহের গভীরে ছিল সততঃ প্রবহমান। জাতীয়তাবোধের অনুপস্থিতির দিকটির ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণের আবশ্যকতা সে-সময়ে ছিল না। প্রশ্নগুলো তোলাই ছিল কর্তব্য। জিজ্ঞাসা অনতিকাল মধ্যে পজিটিভ ভূমিকা পালন করেছিল। মধ্যবিত্ত স্বার্থের বিভিন্ন অনিষ্টকর ক্রিয়ার ফলে ১৯৭১ সালের ভাবমূর্তির অনেকখানি অবনতি ঘটেছে বটে এবং এটাও অনেকখানি সত্য যে, পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর এবং সর্বাত্মক আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক জৈব তাগিদও স্বাধীনতা সংগ্রামে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল তবু বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদেরই জয় ঘোষণা করছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(উত্তরাধিকার ঃ চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮০-৮১)

ধর্মচিন্তা, জাতিচিন্তা এবং রাষ্ট্রচিন্তা

উনিশ শ' আটচল্লিশ, বায়ান্ন, চুয়ান্ন এবং উনসত্তর-একাত্তর—আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এ-কটি পর্যায়। এই পর্যায়ক্রমিক উন্নতির সর্বোচ্চ রেখা একাত্তর সালের ২৬শে মার্চ। ঐ তারিখে প্রকাশ্যে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ন' মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে চূড়ান্ত সফলতা আসে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সকলেই জ্ঞাত। তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যেই পুনরুল্লেখ। সাধারণভাবে পৃথিবীর সর্বত্র এমন কি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত অর্থেও এ-যুগে জাতি ও রাষ্ট্র অভিন্ন। জাতীয় স্বাধীনতা বলতে সকলেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বোঝেন। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় স্বাধীনতা প্রকৃত পক্ষে সকল অধিবাসীর সমান কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ এ আলোচনায় ও প্রসঙ্গ টেনে আনা অনাবশ্যক ও অবান্তর।

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র মাত্রেই ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত ও মানচিত্রে আলাদা রং দ্বারা পরিচিত। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা আভ্যন্তরীণ বলেই জাতীয় সমস্যা। সমস্যাবলী সমাধানের নীতিগত উপায় ও পন্থা বিষয়ে মতানৈক্য এমন কি প্রবল বিরোধ থাকা সম্ভব : গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্রে থাকেও, কিন্তু রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা রাষ্ট্রীয় সীমারেখার বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না। নিয়ে গেলেও সমাধান হয় না, বরং জটিলতা বৃদ্ধি পায় : স্বাধীন রাজনৈতিক অস্তিত্ব বন্ধক পড়ে এবং কালক্রমে তা হারাতে হয়। প্রমাণ উপস্থিত করে রচনার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনা। যারা বিগত আড়াই শ' বৎসরের বিশ্ব ইতিহাস পাঠ করেছেন তারা সকলেই উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো জানেন। মক্কার শরীফ হোসেনের কার্যাবলীর দরুণই যে তুর্কী প্রভুত্বের বদলে আরব জগতে বৃটিশ-ফরাসী-

মার্কিন প্রভুত্ব স্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে বোধ করি দ্বিমতের অবকাশ কম। এখনও সে-প্রভুত্বের অবসান হয়নি। ইসরাইল উক্ত শক্তিত্রয়ের আমমোক্তাররূপে আরব জগতের উপর প্রভুত্ব করছে বললে বাস্তব অবস্থাকে খুব একটা বিকৃত করা হয় না।

হাজার হাজার বৎসরের মানবেতিহাসে বাংলাদেশ এই সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে জাতি-রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার আগেও বাংলাদেশ কখনও কখনও স্বাধীন ছিল বলা হয়। কিন্তু সে-ইতিহাস জাতিরূপে বাঙ্গালীর রচিত নয়, রাজা-বাদশাহ-সুলতান-দের দ্বারা রচিত। তাছাড়াও তৎকালে দেশের সর্বজনস্বীকৃত সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে সেকালে উপমহা-দেশের কোন অঞ্চলেই জাতি চেতনার উন্মেষ হয়নি। শাসিত অঞ্চল ছিল শাসকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি—সহজ কথায় জমিদারী। শাসকের সুকৃতি-দুষ্কৃতির সাথে শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীদের কোন সম্পর্ক ছিল। শাসককে প্রজার কাছে জবাবদিহি করতে হতো না। গণ-মানুষ সর্ব-প্রকার রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে রাজা ও তাঁর রাজ্যের উত্থান-পতন ও পরিবর্তনে জনগণের ভূমিকা গ্রহণের একটি নজীরও নেই। ভাড়াটে সৈনিকেরা বিবদমান পক্ষ-সমূহের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। এমন কি আমরা যাকে মহান ফৌজী বিদ্রোহ বলি, ১৮৫৭ সালের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথেও জনগণের আত্মিক যোগসূত্র অনুপস্থিত ছিল। থাকলে ভারতবর্ষের ন্যায় একটি বড়, জনবহুল এবং তৎকালীন দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সুসভ্য দেশের উপর মুষ্টিমেয় ইংরেজ সর্বময় প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারতো না। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাংলাদেশের গণমানুষই সর্বপ্রথম জাতীয় স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে সকলে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে। এবং অংশ গ্রহণ করে বলেই সংগ্রাম বিজয়গৌরবের মহিমা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, ভারত পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে জনগণের সশস্ত্র যোগসূত্র ছিল না। বুদ্ধিমান ইংরেজ পরোক্ষ প্রভাব অব্যাহত রাখার অভিপ্রায়ে আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি বিশেষ শ্রেণী এবং প্রশাসনিক যন্ত্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে যাদের তারা আপন গোত্রভুক্ত মনে করেছিল। বস্তা

বাহুল্য তারা ঠকেনি, ঠকেছিল উপমহাদেশের জনসাধারণ। তার জের এখনও চলছে। আরো আলোচনার পূর্বে এ-কথাগুলোও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

এখন প্রশ্ন, "জাতীয় স্বাধীনতা" নামক ধ্বনিগুলোর মধ্যে কি যাদুমন্ত্র বিদ্যমান, জয় বাংলার মধ্যে কি আকর্ষণ ছিল যার দুর্লঙ্ঘ্য আহ্বানে বাংলাদেশের তিরিশ লক্ষ নরনারী অকাতরে প্রাণদান করেছিল? এ-জাতীয় ঘটনা শুধু বাংলাদেশেই ঘটে নি, আমাদের চোখের সম্মুখে ঘটেছে ভিয়েত-নাম-কম্বোডিয়ায়, ঘটছে আরব-জগতেঃ ঘটছে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে! শুধু শাসক পরিবর্তনের জন্যে কি? গাত্রচর্মের বিভেদ এবং পোশক-পরিচ্ছদের ব্যবধান লোপ করার জন্যে কি? বস্তুগত বিচারে জাতি-চেতনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নয়। তার আবেদনও ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে সম্পূর্ণ অনু-পস্থিত—থাকতে পারেও না। ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরেও নৃতাত্ত্বিক বিচারে অভিন্ন মানবগোষ্ঠীর এমন কি এক ভাষাভাষী এবং অভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ থাকতে পারে—আছেওঃ সংবিধান, শাসন-প্রণালী, সামাজিক বিধি-বিধান, নীতিমালা এবং পোশাক-পরিচ্ছদও প্রায় এক হতে পারে, তথাপি তারা ভিন্ন জাতিরূপে শুধু পরিচিত নয়, সেই পরিচয়কে পবিত্র ও মহান জ্ঞানে রক্ষার জন্যে প্রাণ দান করে। জাতীয় স্বাধীনতা শব্দদ্বয়ের মধ্যে কি তাৎপর্য রয়েছে যা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও পৃথিবীর মানুষকে বিভক্ত রাখার দুর্বার প্রেরণা অহর্নিশ যোগাচ্ছে? আবেদন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত থাকা সত্ত্বেও কেন তার এ জয়জয়কার?

কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ফিরে যাওয়া যাক, তা'হলে জাতি-চেতনার গভীরতা এবং বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি সহজতর হতে পারে। বৃটিশ আমলে এমন কি পাকিস্তানী আমলেও এ-দেশের সাধারণ সংসারী মানুষের সংসার ধর্ম এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের উপর কোনরূপ বিধিনিষেধ ছিল না। ঐশ্বর্য ও স্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধি ও হ্রাস, দায়াবদ্ধ, দান-খয়রাত প্রভৃতি করারও অবাধ অধিকার ছিল। সামাজিক ও ঐতিহ্যগত বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে যদৃচ্ছা আচরণ এবং শাসক উৎখাত এবং শাসন-যন্ত্রের ভিত্তি ধ্বংসাত্মক কথাবার্তা ও ক্রিয়া ব্যতিরেকে যদৃচ্ছা কথাবার্তা বলা ও কাজ করার পথেও বাধা ছিল না। যদিও পবিত্র কোরানে ইয়াহুদী এবং নাসারার (খৃস্টান) অভিভাবকত্ব

স্বীকার করে নেয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বাসী মুসলমানদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তবু ইংরেজ রাজত্বে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন এবং ঐশ্বর্য এবং অধিকার, পরিবৃদ্ধি, সংকোচন ও ব্যয় করার শরাশরিয়ত-সম্মত অধিকার অনুমোদিত ছিল বিধায় আলেম সমাজ বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ না-জায়েজ এবং বৃটিশ হুকুমাতকে দারুল আমান অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ স্থান ঘোষণা করেন। ইংরেজ রাজত্বে জুমা'র নামাজ সিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস স্থাপিত কলকাতা মাদ্রাসার আদর্শে এবং অবয়বে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠালাভ করে। অগণিত মসজিদও স্থাপিত হয়। যার সংখ্যা মুসলমানী শাসনামলে স্থাপিত মসজিদ সংখ্যার অন্ততঃ শত গুণ অধিক হবে বলে অনুমান করা যায়। পাকিস্তানী আমলে অধিকতর অনুকুল পরিবেশ ছিল। ধর্মবিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রতিষ্টিত পাকিস্তান শুধু যদৃচ্ছা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন নয়, উপরন্তু পবিত্র কোরানে স্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আক্রমণাত্মক ধর্মীয় নীতি অনুসরণ এবং ধর্মকে প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় উৎসাহ ও সহায়তা প্রদত্ত হয়। বাংলাদেশের উপর প্রভুত্ব স্থায়ী করার বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী ১৯৫৪ এবং ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনকালে, ওদেরকে ভোট দান করে পবিত্র ধর্ম ইসলাম রক্ষার মহৎ কর্তব্য পালনের আহ্বান জানায়। ওদেরকে বর্জনের অর্থ ইসলাম ধর্ম বর্জন—এরূপ দাবীও তাঁরা করেন। এ ব্যাপারে ফতোয়ারও অভাব হয়নি। সরকারী জায়গা এবং অর্থে বড় বড় মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও রাজস্বের মধ্যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অর্থ এবং আবগারিশুল্ক এবং সুদের পয়সা ছিল। অমুসলমানদের জিম্মী ঘোষণা করা হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইসলাম-পছন্দ নামক একটি দলও অংশ গ্রহণ করে। ছ'দফার পক্ষীয় লোকদেরকে কোন কোন নির্বাচনী সভায় কাফের ঘোষণা করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করারও আবেদন ছিল। কিন্তু কোন ফল হয়নি! বাংলাদেশ তার অনিবার্য লক্ষ্যস্থলের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলে। এই সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস সকলেরই স্মরণ থাকার কথা। ইংরেজ ও পাকিস্তানী আমলে এরূপ অনুকুল অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ সন্তুষ্ট থাকেনি। তারা উভয় প্রভুত্ব বর্জন করতে দৃঢ়সংকল্প হয়। উভয় শাসনব্যবস্থাকে তারা নাম দেয় গোলামি। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধের

মাধ্যমে গোলামির শৃঙ্খল তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। কিন্তু কেন? কি অসুবিধা ছিল? আপাতদৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নজরে পড়ে না। তবু কেন ত্রিংশ লক্ষ নরনারী প্রাণ দিল এবং এক কোটি মানুষ মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিল? যে আবেদন তাদের অনুপ্রাণিত এবং তাদের মধ্যে সৃষ্টি করল জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনের দুর্বার বেগ তার নাম জাতীয়তা, যা স্পর্শ করা যায় না, অথচ অত্যন্ত গভীর ও তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ভৌগোলিক সীমারেখা চিহ্নিত জাতি-রাষ্ট্রে বসবাস করার অদম্য আকাঙ্ক্ষার নিকট অন্য সকল প্রকার আবেদন পরাভূত হলো।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতীয়তা অর্থাৎ জাতি-রাষ্ট্রে বসবাস করার আকাঙ্ক্ষা একটি ভাবাবেগ মাত্র। রাজনৈতিক পরাধীনতাকে অভিশাপ জ্ঞান করা হয়, অথচ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরাধীনতাকালীন জনজীবন শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিক থেকে অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল। তা সত্ত্বেও বৈদেশিক অর্থ-সাহায্যপুষ্ট চর এবং তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত কিছু লোক ব্যতিরেকে অপর কেউ সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক পরাধীনতা পুনর্বরণ করতে রাজী হয় না।

আমরা দেখতে পাই এবং মস্তক কণ্ডূয়ন ব্যতিরেকেও উপলব্ধি করতে পারি যে, জাতীয়তার চেয়ে ধর্ম এবং দর্শন উভয়ের আবেদনের ক্ষেত্র বৃহত্তর। ইসলাম সহ দীক্ষাদানকারী ধর্ম মাত্রেরই আবেদন বিশ্ব মানবিক। তারা ভৌগোলিক বাধা স্বীকার করে না, গাত্রচর্মের রং বিচার করেও তারা দীক্ষা দেয় না। বিশ্বের যে কোন স্থানের অধিবাসীকে তারা আপনজনরূপে গ্রহণ করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিধিবিধান এবং উপাসনা পদ্ধতিও বিশেষ ধর্মাবলম্বীর জন্যে সারা বিশ্বে এক এবং সকল অবস্থায় সকল শ্রেণীর লোকের জন্যে অবশ্য অনুসরণীয় ও পালনীয়। দর্শনের আবেদনও বিশ্বজনীন। অণুবাদী, ভাববাদী, সংশয়বাদী, একেশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, সর্বেশ্বরবাদী, নিরাকার নির্গুণ নির্বিকার পরমেশ্বরবাদী, নিয়তিবাদী, মানবতাবাদী, ভোগবাদী প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর দর্শনের ক্ষেত্র সারা বিশ্ব। কোনও দার্শনিক পদ্ধতি ভৌগোলিক সীমারেখা মানে না। অথচ কি আশ্চর্য, বিশেষ ধর্মাবলম্বী অথবা বিশেষ দার্শনিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হয়েও মানবজাতি অসংখ্য জাতি এবং জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত। অসংখ্য ধর্মযুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ধর্মযুদ্ধ এবং ধর্মীয় ঐক্য

দু'য়ের কোনটাই জাতিচেতনা বিলোপ করতে পারেনি। বরং দেখা যায়, এক ও অভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের দরুন সভ্যতার সৃষ্টিকাল হতে অদ্যাবধি যত লোক প্রাণ হারিয়েছে ক্রুসেডে তার শতাংশের একাংশও নিহত হয়নি। বলা বাহুল্য, অভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের প্রত্যেকটিই ছিল সীমানা সংরক্ষণ, বৃদ্ধি অথবা সংকোচনের লড়াই। প্রবল প্রতাপশালী আরব সাম্রাজ্য তুর্কী এবং পারসিকদের জাতি-চেতনা বিলোপ করতে অসমর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে তুর্কী সাম্রাজ্য আরবদের জাতি-চেতনা বিনষ্ট করতে পারেনি। আবার একই ভাষাভাষী আরব জগৎ অসংখ্য জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। অথচ উল্লিখিত দেশসমূহের অধিবাসীরা সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ইসরাইল-ভীতি সত্ত্বেও বিভিন্ন আরবী ভাষাভাষী মুসলিম রাষ্ট্র অভিন্ন রাষ্ট্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারছে না। সিরিয়া এবং মিসরের একীকরণ অল্পকালও টিকেনি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অমিত বল এবং ইংরেজি ভাষা মিলেও সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন দেশবাসীর জাতি-চেতনা লোপ করতে ব্যর্থ হয়। প্রথমে পোপ এবং পরে হলি রোমান সাম্রাজ্য, ল্যাটিন ভাষা এবং খ্রীস্টধর্ম একযোগে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আজ ইয়োরোপে অসংখ্য জাতি-রাষ্ট্র বিদ্যমান; বিভিন্ন দার্শনিক সিস্টেমের ইতিহাসও তাই। বিশ্বমানবতাবাদীও জাতি-চেতনা ত্যাগ করতে অসমর্থ। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বাঁধলে তারাও স্বজাতির পক্ষে অস্ত্রধারণ করে এবং নিরপরাধ নরনারী হত্যায় শরিক হতে দ্বিধাবোধ করে না। বীরত্বগাথা, মহাকাব্য ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠী-চেতনা কৌম-চেতনারই সাহিত্যরূপ। এবং সম্ভবতঃ গোষ্ঠী এবং পরিবেশ চেতনারই সম্প্রসারিত ও পরিমার্জিত রূপ জাতি-চেতনা। দর্শনশাস্ত্র যুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভর করে তৈরী। যুক্তিবাদী মাত্রেই স্বীকার করবেন, পাইকারী নরহত্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন কোনও ক্রমেই বীরত্বরূপে চিহ্নিত হতে পারে না। বিশ্বধর্ম মাত্রেই পাইকারী কেন সর্বপ্রকার নরহত্যার ঘোর বিরোধী। এ ব্যাপারে ইসলাম ধর্মে কঠোর বিধান রয়েছে। বিশেষ করে বিধান রয়েছে মুসলমান হয়ে মুসলমান হত্যার ব্যাপারে। এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করতে পারে না। যে ব্যক্তি করে সে মহাপাপী। অথচ, মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধে অদ্যাবধি পৃথিবীতে যত মুসলমান নিহত হয়েছে মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুদ্ধে তার শত ভাগের এক

ভাগও নিহত হয়েছে কিনা সন্দেহ। তা হলে দেখা যাচ্ছে, জাতি-চেতনা এমনি দুর্বোধ্য চেতনা যে বিশ্বমানবিক আবেদনশীল ধর্ম এবং দর্শন দুই-ই তার মোকাবেলায় অকার্যকর। এর কারণ কি?

আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বমানবিক ধর্ম এবং দর্শন দুর্বল মনে হতে পারে। আমার মতে, ধর্ম এবং দর্শনের সংগে জাতি-চেতনার তুলনা হতে পারে না। ওদেরকে এক তুলাদণ্ডে তুলে বিচার করা মারাত্মক ভুল। ধর্ম ও দর্শনকে জাতি-চেতনার প্রতিপক্ষ অথবা পরস্পরের সম্পূরকরূপে উপস্থিত করা শুধু ভুল নয়, অসীমকে সসীমের সংগে তুলনা করার সমতুল্য মূর্খতা। ধর্মীয় স্বাধীনতা, দার্শনিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ এক নয়। তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে। ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ ধর্মবিশ্বাস ধারণ, তার নানা অনুষ্ঠান ও বিধি-বিধান পালন এবং শান্তি-পূর্ণভাবে প্রচারের স্বাধীনতা। দার্শনিক পদ্ধতির ক্ষেত্র ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি-সম্মত আস্থার মধ্যে সীমিত। অনুষ্ঠান ও বিধিবিধানাদি বাদ দিলে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে ববং কিছুটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্ম বিশেষভাবে পারলৌকিক জীবনের কল্যাণের পথ নির্দেশক। ধর্মের দৃষ্টিতে ইহজন্ম ক্ষণ-স্থায়ী; পারলৌকিক জীবন অনন্তঃ ইহলৌকিক জীবন সেই অনন্ত পার-লৌকিক জীবনের যাত্রাপথে পরীক্ষাক্ষেত্র। যারা ধর্মের বিধিবিধান ও অনুষ্ঠানাদি নিষ্ঠার সাথে পালন করেন তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত। উত্তীর্ণেরা অনন্ত পারলৌকিক জীবনে অনন্ত সুখশান্তি ভোগ করেন। ইহ-লোকে পালিতব্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মাদি সেই পরম কাম্য জীবনলাভের পাথেয়। কিন্তু ধর্মে জবরদস্তি নেই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লিপ্সাও ধর্মের নেই। ধর্মের সাফল্য ও বিস্তার কখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল ছিল না এবং এখনও নয়। আল্লাহর প্রেরিত কোন নবী এবং নবীদের ভাবশিষ্য সুফী দরবেশ আওলিয়া কখনও তরবারির সাহায্যে ধর্ম প্রচার করেননি। তাঁরাই বরং মানুষের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। ধর্ম পরকাল বিষয়ে মানুষকে সাবধান করে দিয়েই সন্তুষ্ট। পরকালের পাথেয়রূপে ইহলোকে পালনীয় কিছু বিধিবিধান, অনুষ্ঠান এবং নীতিমালা প্রণয়ন করেই সে তার কর্তব্য শেষ করেছে। যারা ধর্মের নির্দেশ পালন করে না, তারা পরকালে শাস্তি ভোগ করবে, যারা পালন করে পুণ্যার্জন করে তারাও পুরস্কার পাবে

পরকালে। শাস্তি ও পুরস্কার উভয়ই দেবেন খোদ আল্লাহতালা। পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কার কোনটাই দেয়ার অধিকার ইহজগতের কোন মানুষ, মানবগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রকে প্রদত্ত হয়নি। আল্লাহতালা তাঁর রসুলকে বলেছেন, তুমি পথ প্রদর্শনকারী ও সাবধানকারী মাত্র। মানুষকে জ্ঞান দিয়েছি, তারপরেও যদি সে পথভ্রষ্ট হয় তা হলে তার দণ্ড আখেরাতে নির্দিষ্ট আছে। পৃথিবীসহ সমস্ত মহাবিশ্বের প্রকৃত মালিক আল্লাহতালা। তাঁর বিশ্বে অসংখ্য ধর্মাবলম্বী বিদ্যমান। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে ভোজ্য ও পেয় বিতরিত হচ্ছে না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ ভোজ্য ও পেয়সহ আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ করছে। মানবেতর প্রাণীরাও বঞ্চিত হচ্ছে না। এ-বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েই হাজী শরিয়তুল্লাহর পুত্র দুদু মিঞা এবং তিতুমীরের ভক্তেরা বলতেন "খোদার মাটি চাষ করব খাজনা দেব কারে?" ইসলাম এবং ক্রিশ্চানিটি এ দু'টি কেতাবী ধর্মে রাষ্ট্রের রূপরেখা অনুপস্থিত। ইসলাম ধর্মের প্রধান ব্যক্তি ইমাম। তাঁর দায়িত্ব পৃথিবীর যাবতীয় মুসলমান যাতে ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত বিধিবিধান পালন করে তা দেখা। কিন্তু নতুন বিধিবিধান এবং আইন কানুন, কর ইত্যাদি প্রবর্তন করার অধিকার তার নেই এবং বিশেষ একটি দেশের মুসলমানের জন্যেও তিনি নির্বাচিত হতে পারেন না।

জাতীয় স্বাধীনতা উপরোক্ত কোন প্রকার অর্থ বহন করে না। তার সমস্ত কাজকর্ম এই পৃথিবীতে এবং মানুষের ইহলৌকিক জীবন নিয়ে। জাতি রাষ্ট্র হোক বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হোক, কোন রাষ্ট্রই পারলৌকিক শাস্তি অথবা পুরস্কার দিতে পারে না। এ-ব্যাপারে রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, বিধিবিধান ও নীতিমালা সম্পূর্ণ আলাদা, সতত পরিবর্তনশীল এবং বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনবিরুদ্ধ। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ইহজগতে পালনীয়। লঙ্ঘনের শাস্তিও ইহজগতে। ধর্মে রাষ্ট্র বিরোধী কার্য বলে কিছু নেই। ধর্মের বিধিবিধান প্রয়োগের জন্যে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীও নেই। ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ থাকলেও তার শাস্তির জন্যে পরকাল নির্দিষ্ট, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় শক্তির সবচেয়ে বলবান বাহু পুলিশ ও সেনাবাহিনী। ধর্ম গোয়েন্দা লাগিয়ে মানুষের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে না। আল্লাহতালা সর্বত্র হাজের ও নাজের। সব কিছু তার জ্ঞাতসারে ঘটছে।

রাষ্ট্র বিরোধী কার্যের দণ্ড ইহকালের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তা প্রাণদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

তাত্ত্বিক বিচারে প্রকৃত ধার্মিক ও ধর্মভীরু ব্যক্তি কখনও জাতীয়তা-বাদে আস্থাবান হতে পারে না। সে খণ্ডছিন্ন পৃথিবীকে এক ধর্মরাজ্য পাশে আবদ্ধ করার শান্তিপূর্ণ প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হতে নীতিগতভাবে বাধ্য। কিন্তু জাতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ঐরূপ ভৌগোলিক একীকরণ প্রচেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহিতারূপে গণ্য এবং গুরুতর দণ্ডে দণ্ডনীয়। সরকারীভাবে ঘোষিত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের কোন মুসলমান যদি অপর ইসলামী রাষ্ট্র সৌদি আরবের মধ্যে পাকিস্তানকে বিলীন করে দেওয়ার পক্ষে জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হয় তা'হলে হয় সে উন্মাদ গণ্য হবে অথবা রাষ্ট্র-দ্রোহিতার অপরাধে দণ্ডিত হবে। ধর্মের নীতিমালা অপরিবর্তনীয়। পাপ চিরকালই পাপ। পুণ্য চিরকালই পুণ্য। মিথ্যা চিরকাল বর্জনীয়, সত্য চিরকাল গ্রহণীয়ঃ সুদ গ্রহণ ও দান চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের নীতিমালায় পাপ-পুণ্য এমন কি ন্যায়-অন্যায় বলেও স্থায়ী কিছু নেই। রাষ্ট্রের নীতিমালায় সুবিধাবাদ শীর্ষ স্থানে। দার্শনিক প্লাটোর মতে, মিথ্যা বলার একচ্ছত্রাধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের। এবং সব রাষ্ট্রই সকল কালে সকল যুগে এ অধিকারের সদ্ব্যবহার করেছে এবং এখনও প্রতিদিন করছে। আধুনিক রাষ্ট্র মাত্রেই এমন কি ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানও সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে এবং মিথ্যা বলে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তান বলেছিল, সে বাংলাদেশে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করছে। এ প্রচার চালিয়ে সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের ধর্মভীরু নিরক্ষর মুসলমানদের সংগ্রহ করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল। তাঁরা এখানে এসে যখন দেখতে পায়, মুসলমান তাদের বধ্য, তখন অনেকে বিদ্রোহ করেছিল বলেও প্রকাশ। আরব জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নীতিমালাও অভিন্ন নয়। ধর্মীয় সমাজে সুফী দরবেশ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সংসারত্যাগী ব্যক্তি সম্মানিত। রাষ্ট্রে কর্মত্যাগী নিন্দিত। ধর্ম কাউকে বাস্তুচ্যুত করে না। গ্রহণ তার মূলনীতি, বর্জন নয়। রাষ্ট্র অনভিপ্রেত ব্যক্তিকে বহিষ্কার করে। ধর্মে নাগরিকত্ব নেই, সে পাসপোর্ট-ভিসা দেয় না। রাষ্ট্র নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেয়ঃ এই সার্টিফিকেট ব্যতীত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের মুসলমানও অপর

মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারে না। যত মিত্রই হোক ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিককে কোন রাষ্ট্র তার নাগরিকত্ব সহজে দেয় না। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিহারী মুসলমানদের স্বেচ্ছা নির্বাচিত স্বদেশ পাকিস্তান এবং ছ'বৎসর পূর্বেও তারা প্রকৃতই পাকিস্তানের নাগরিক ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান তাদেরকে নাগরিকরূপে গ্রহণ দূরের কথা মেহমান রূপেও গ্রহণ করতে নারাজ। ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করলে পাপ হয়। রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করলে হয় অপরাধ। পাপ ও অপরাধ এক বস্তু নয়। পাপের শাস্তি আখেরাতে হতেও পারে নাও হতে পারে; কেননা আল্লাহ গফুরর রহিম। বান্দার তওবা গ্রহণ করে তিনি মাফ করে দিতেও পারেন। সে-খবর ইহলোকে কারো জানার উপায় নেই। কিন্তু অপরাধের শাস্তি ইহজগতে এবং প্রমাণিত অপরাধের দণ্ড অনিবার্য, তার মাফ রাষ্ট্রে নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পুনর্জীবন নেই। ধর্মে পুনরুজ্জীবন অর্থাৎ পারলৌকিক জীবন আছে। এ-বিশ্বাস ধর্মের মূল। ধর্মে অশরীরী আত্মা (রুহ) স্বীকৃত। রাষ্ট্রের আত্মা নেই, আত্মার মূল্যও দেয় না সে। রাষ্ট্র রুহকে শাস্তি দিতে অক্ষম। রাষ্ট্রীয় শাস্তি দেহের উপর প্রয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রীয় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি আখেরাতে দণ্ডিত না হয়ে বরং পুরস্কৃতও হতে পারেন। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় [illegible] ব্যক্তি আখেরাতে অনন্তকাল দোজখ ভোগের দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারেন। এ-বিষয়ে কারো ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্র ইহলোকের মানুষের কল্যাণ করার জন্যে মানব সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। অকল্যাণে প্রবৃত্ত হলে জনসাধারণ বিপ্লব করে—তার রূপরেখা বদলে দেয়। রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী নকশা নেই, চিরস্থায়ী নীতিমালাও নেই। ধর্মের রূপরেখা ও বিধিবিধান অপরিবর্তনীয়; পরিবর্তন করার অধিকার মানুষের নেই। সে অধিকার একমাত্র আল্লাহতায়ালার। লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রীয় যন্ত্রে কর্মরত অত্যন্ত ধর্মভীরু ব্যক্তিও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ধর্মীয় আইন-কানুন এবং বিধিবিধান [illegible] করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। কূটনৈতিক [illegible] মিথ্যা বলেন বা [illegible] অকুণ্ঠ-চিত্তে সুদ [illegible] নির্দেশ ও প্রয়োজনে সে যে-কোন [illegible] ও বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করে না। [illegible] প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রীয় যন্ত্রে নিযুক্ত লোক তার ব্যক্তিগত

ধর্মীয় জীবনকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে নিয়োজিত জীবন হতে সম্পূর্ণ পৃথক জ্ঞান করে। ধর্মে মাদক দ্রব্য উৎপাদন, আমদানী ও পান নিষিদ্ধ। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান সহ প্রায় সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে মাদক দ্রব্য উৎপাদন, আমদানী এবং পান চলে। আবকারি কর রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা হয়। এ-সব কাজে মুসলমান কর্মচারীও নিযুক্ত। এ-তহবিল হতেই আবার মসজিদ, মাদ্রাসায় সাহায্য দান করা হয়।

এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বিগত দেড়শ' শতাব্দীকাল মধ্যে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ কয়েকটি রাজনৈতিক ধারণা বর্জন করেছে। প্রথমে তারা বিশ্বাস করত ইংরেজ তাড়িয়ে ভারতে পুনরায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এজন্যে চেষ্টাও চালায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তারা এ ধারণা বর্জন শুরু করে। তাদের একাংশ ইংরেজের খয়ের-খা রূপে বৃটিশ শাসনকে আল্লা তালার রহমত গণ্য করে তার খুঁটি দৃঢ় করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। প্রধানত মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিত এবং এক শ্রেণীর আলেম নিয়ে গঠিত এ-অংশটির নেতৃত্ব করছিলেন ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফ এবং মধ্য ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ। বৃহত্তর অংশ মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন বর্জন করে সব-ধর্মাবলম্বীর জন্যে একটি সর্ব-ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্র স্থাপনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বাংলাদেশে এ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরম খাঁ, মৌলভি মুজিবর রহমান, মওলানা বাকী ও কাফী ভ্রাতৃদ্বয়, আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী, এ. কে ফজলুল হক, শামসুদ্দীন আহমদ, লাল মিয়া প্রমুখ এবং আরো অনেকে। ১৯৩৭ সালে তারা এ-উদ্দেশ্য বর্জন করে এবং মিঃ জিন্নাহর পরামর্শে ও নেতৃত্বাধীনে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বাংলাদেশে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যী-করণের নেতৃত্ব দেন এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা আকরম খাঁ, মোহন মিঞা, নূরুল আমীন প্রমুখ এবং ছাত্র-যুবকদের মধ্যে শামসুল হক, ইয়ার মোহাম্মদ খান, শেখ মুজিবুর রহমান, খান সবুর, ফজলুল কাদের চৌধুরী, শামসুদ্দীন আহমদ প্রমুখ।

ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ অনিবার্য হওয়ার পূর্বক্ষণে উক্ত বিশ্বাস পুনরায় বর্জনের পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর বন্ধু শরৎ বসুর সহযোগিতায় যুক্ত স্বাধীন বাংলার দাবী উপস্থিত করেন। উল্লেখ্য, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বাংলাদেশে মিঃ জিন্নাহর দক্ষিণ বাহু। আবুল হাশেম সাহেব রাজনীতির প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে কিছু কাল পশ্চিম বাংলায় বসবাস করার পর বাংলাদেশে হিজরত করে প্রায় অরাজনৈতিক জীবন যাপন করেন। বলা বাহুল্য এগুলো বেশ কৌতুকপ্রদ ঘটনা। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের মলনীতি বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে। ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এখন আর এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, ভাষা আন্দোলন ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচ্ছন্নভাবে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন। ধর্মবিশ্বাসকে মূলধন করে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধার জিন্নাহ, লিয়াকত আলী এবং পাঞ্জাবী সিভিল সার্ভিস তাদের দৃষ্টি-কোণ থেকে ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের মাতৃভাষা বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। বাংলা ভাষাকে কুফরি ভাষা, হিন্দু ভাষা বলতেও তারা দ্বিধা বোধ করেনি। রবীন্দ্র-নাথকে বর্জন, নজরুলকে সংশোধন, আরবী অথবা রোমান হরফ প্রবর্তন প্রভৃতি বহু রকম উদ্যোগ দ্বারা তারা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলা-ভাষা তথা স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে ছাত্র-যুবকগণ প্রাণ দান করে। তার ফলশ্রুতি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ২১-দফা কর্মসূচীর জয়। কৌতুকপ্রদ ব্যাপার এই যে, ১৯৫৪ সালের ২১-দফা আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়েছিলেন এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রমুখ এবং ছাত্র-যুবকদের মধ্যে মোহাম্মদ তোয়াহা, ওয়ালী আহাদ, কমরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ। তার পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই স্মরণ থাকার কথা। উল্লেখ্য যে ১৯৬২, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৯—৭১ সালের আন্দোলন ও সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৪ সালের একুশ-দফা আন্দোলনেরই সম্প্রসারণ ও ব্যাপ্তি মাত্র। ১৯৬৬ সালে প্রচারিত শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা প্রকৃত প্রস্তাবে

কিঞ্চিৎ সংশোধন ও সংযোজনসহ ১৯৫৪ সালের ২১-দফার সংক্ষিপ্ত সার। পাঠক উভয় দলিল মিলিয়ে দেখতে পারেন। বুদ্ধিমান মানুষের কেন, সাধারণ লোকের মনেও এ ব্যাপারে কোনরূপ সংশয় ছিল না যে, ২১-দফা এবং পরবর্তীকালে ৬-দফা ছিল আসলে বাংলাদেশের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার সনদ ঃ ধাপে ধাপে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার কৌশল। পাকিস্তানী শাসক-শ্রেণী, তার বাংলাদেশীয় স্তাবক তাবেদার এবং ভাড়াটে লোকেরা একুশ দফা এবং ছ' দফার তাৎপর্য ঠিকই বুঝেছিলেন। এবং বুঝেছিলেন বলেই বিরানব্বই ধারা প্রবর্তন করে একুশ দফা বানচাল করেন। ১৯৭১-এ অবস্থার এতটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে যে, সাধারণ সামরিক আইন জারী করে সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ছ' দফায় স্বীকৃত হওয়ার পরিবর্তে পাকিস্তান নিরস্ত্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষ মুখোশ বর্জন করে। বাংলাদেশ পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অপর দিকে স্থূলবুদ্ধি পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী বৈদেশিক অভিভাবক শক্তিসমূহের উৎসাহে ও প্ররোচনায় তাদের বর্বর সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে গণহত্যা এবং নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের কাজে লেলিয়ে দেয়। যুদ্ধকালে কমপক্ষে বাংলাদেশের শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষ (ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে) ১৯৪৬-৪৭ সালের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে। তাঁরা জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মরণ-পণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে জয়লাভ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ আধুনিক অর্থে স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম বটে কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের তাৎপর্য সুগভীর। ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে অথবা এর হালকা মূল্যায়ন করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। পূর্বেই বলেছি, রাষ্ট্রীয় সমস্যা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী গণমানুষের জাগতিক জীবনের সমস্যাবলীর মধ্যে সীমিত। জাতির সংজ্ঞা বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি দিয়েছেন। আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। একটিমাত্র বিষয় বিশেষভাবে স্মরণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। এক ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ পৃথিবীতে বহু জাতি-রাষ্ট্র স্থাপন করেছে। এক ভাষাভাষী কিন্তু নানা ধর্মে বিশ্বাসী মানুষও জাতি-রাষ্ট্রে

সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাপন করেছে। নানা ভাষাভাষী এবং নানা ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ নিয়েও বহু রাষ্ট্র গঠিত। এই তিন শ্রেণীর জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে নানা ভাষাভাষী রাষ্ট্রের সংখ্যা (লোকসংখ্যা নয়) সবচেয়ে কম। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও চীনকে গণনা থেকে বোধগম্য কারনেই বাদ দিচ্ছি। তারপর দৃষ্টান্তস্বরূপ কানাডা, পাকিস্তান এবং ভারতের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ওসব রাষ্ট্রের চূড়ান্ত নকশা রচিত হয়ে গেছে এমন চূড়ান্ত রায় দেয়ার সময় বোধ করি এখনও আসেনি। প্রত্যেকটি দেশে কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা বিদ্যমান এবং রাষ্ট্রের সাংগঠনিক অবয়ব ফেডারেল, মূলতঃ অভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়েই স্টেটস বা প্রদেশ গঠিত। এমন কি রুশ সোসিয়ালিষ্ট সোভিয়েট রিপাবলিকের অঙ্গ রাজ্যগুলোও প্রধানতঃ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত।

শত শত বৎসরের পরাধীনতার পর সহসা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশ মাত্রেরই বহুবিধ সমস্যা থাকে। বিশেষভাবে তারা সমস্যার সম্মুখীন হয় যখন যুদ্ধ চলাকালেও তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন প্রায় অবিকল অব্যাহত থাকে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে তার চাপেই পুরাতন জরাজীর্ণ সাংগঠনিক রূপ বিলুপ্ত হয় এবং নতুন পরিস্থিতির প্রয়োজনে নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। তার ভিত্তিতে যুদ্ধকালেই নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন জন্ম নেয়। যুদ্ধ স্বল্পস্থায়ী হওয়ায় বাংলাদেশের পুরাতন জীর্ণ সমাজব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে জনগণকে শোষণ ও শাসন করার জন্যে ভাড়াটে লোক নিয়ে গঠিত পরাধীনতাকালীন প্রশাসনিক সংগঠন এবং বেসরকারী কিন্তু সমান গণবিরোধী পণ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও বিতরণব্যবস্থা অবিকল থেকে যায়। অবশ্য স্বাধীনতার যুদ্ধ চলাকালে ওদের অধিকাংশ লোক নানাভাবে সংগ্রামের সহায়তা করেছে, না করলে গেরিলা যুদ্ধ চালানো সম্ভব হতো না। কিন্তু মানুষ নিকট-অতীতের সুযোগ-সুবিধা সহজে বিসর্জন দিতে চায় না, স্বেচ্ছায় অতীত সুযোগ-সুবিধা ত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল। তা'ছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ-শ্রেণীটি পরাধীনতাকালেও নানা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল। প্রশাসনিক কাজে, স্বাধীনভাবে পণ্য সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবসায়ে এবং নানা ধরনের স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত লোকদের নিয়ে গঠিত এই বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাধীনতা

লাভের পরে তাদের পূর্ব-স্বভাব অনুযায়ী যার যার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার পরিবৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয় এবং এখনও সে কাজে নিযুক্ত আছে বললে বোধ করি কারো প্রতি বিশেষভাবে অবিচার করা হয় না। বাংলাদেশের সমস্যাবলীর সূত্রপাত এই পশ্চাদমুখী আকর্ষণ থেকে। পশ্চাতে প্রত্যাবর্তনের যে প্রবণতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের মধ্যে—এমন কি নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেও এখন দেখা যাচ্ছে এবং ক্রমে জোরদার হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে, তার উৎসমূলেও সক্রিয় রয়েছে সম্প্রসারিত সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ ও পরিবৃদ্ধির সচেতন এবং অবচেতন আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষার দু'টি দিক: ঐশ্বর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা তার প্রথম দিক। প্রতিবেশীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সাফল্যজনিত ক্ষোভ ও হতাশা তার দ্বিতীয় দিক। এই হতাশায় ইন্ধন যোগাচ্ছে যারা পূর্বাপর বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সক্রিয় বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের সার্বভৌম অস্তিত্বকে এখনও মনে-প্রাণে গ্রহণ করেনি- অথচ বাংলাদেশের নাগরিক তারা! শেষোক্তদেরও দোষ দেয়া যায় না, কেনন ভ্রান্ত হলেও তারা তাদের বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা অনুযায়ী কাজ করছে। জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশে যারা বিশ্বাসী নয় তারা তার বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সর্বপ্রকার কৌশল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করবেই। এটাই স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে, তাদের জন্যে এ-সুযোগ সৃষ্টির মূলেও রয়েছে বিত্তলোভ এবং শ্রেণীপ্রীতি। অপর দিকে রয়েছে শতকরা নব্বই জনকে নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং নিরক্ষর দরিদ্র জনসাধারণ। স্বাধীনতাপরবর্তীকালীন অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা তারা পায়নি। তাদের অবস্থা পূর্ববৎ। চরম দারিদ্র্য পীড়িত এই বিরাট জনসংখ্যার মধ্যে অসন্তোষ বিদ্যমান থাকা খুবই স্বাভাবিক। অতীতকে সত্যযুগরূপে উপস্থিত করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা অত্যন্ত সহজ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সকল দেশে সকল কালে কায়েমী স্বার্থভোগী শ্রেণী এ-কৌশল অবলম্বন করে থাকে। তারা ধর্মকেও হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে পশ্চাদপদ হয় না। বাংলাদেশেও যদি তার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে তা' সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর ঘটনা হবে না। তা'ছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যুদ্ধ স্বল্পকাল স্থায়ী হওয়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্লেদ এবং অচলায়তনে প্রাচীন মূল্যবোধের জীর্ণ ইমারত বিদ্যমান

থাকে। তাই এখনও নঞর্থক প্রচারণা চালানো সম্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থায়ও প্রাক-স্বাধীনতাকালের নীতি অনুযায়ী, দেশেরই শ্রেণীবিশেষ কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যাবলীর হেতু এবং সমাধান উভয়ই দেশের বাইরে খোঁজা হচ্ছে। এই সজ্ঞান প্রচেষ্টার মূলেও ক্রিয়া করছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার, অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিকে দেশের ভিতর হতে বাইরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে শ্রেণীস্বার্থ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। এতেও ইন্ধন যোগাচ্ছে বাংলাদেশকে যারা এখনও স্বীকার করে না তারা। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও যতদিন সম্ভব জনসাধারণকে মূল সমস্যা হতে দূরে সরিয়ে রাখার সাধারণ লক্ষ্য পূরণের জন্যে দু'পক্ষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অবাধ অর্থনৈতিক তৎপরতার নৈরাজ্যের মধ্যে বাংলাদেশের ন্যায় অতি ঘন-বসতিপূর্ণ দেশের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান সন্ধান এবং তজ্জন্য সুপারিশ করার প্রবণতার মধ্যেও পশ্চাদ্ধাবন এবং স-উপায়ে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিবৃদ্ধির উদ্দেশ্য বিদ্যমান।

এ কথা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না যে হিসেবের খাতায় ডান এবং বাঁ এর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান বাঞ্ছনীয় হলেও রাষ্ট্রের একমাত্র এমন কি প্রধান লক্ষ্যও তা নয়, কেননা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র পৃথক বস্তু ঃ ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে যে ব্যবধান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের মধ্যেও সে ব্যবধান। রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সকল নাগরিকের ইহলৌকিক জীবনে সাচ্ছল্য এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ সাধন। বিদ্যমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকে উপরিউক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় খুঁজতে হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাপীড়িত বাংলাদেশের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস প্রমাণ করছে যে, বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপরিউক্ত রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যাবলী পূরণ করতে অসমর্থ। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের বয়স কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর মাত্র। এই স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা কোন নীতির ব্যর্থতা বা সাফল্য কোনটাই প্রমাণ করে না। তা' ছাড়া এমন কোন নতুন নীতি অনুসৃত হয় নি, এমন কোন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় নি যাকে বলা যায় বৈপ্লবিক অর্থাৎ আমূল পরিবর্তন। কিছুটা সংশোধনের চেষ্টা

এখানে-ওখানে চলছে হয়তো। এরি মধ্যে অস্থির হয়ে পশ্চাদ্ধাবনের মাধ্যমে স্বর্ণ-যুগ আনয়নের সুপারিশ করার অর্থ প্রকারান্তরে রাজনৈতিক স্বাধীনতায় অনাস্থা প্রকাশ। উল্লেখ্য যে, অতীত ব্যবস্থা ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়াতেই ভবিষ্যতের নতুন ব্যবস্থাধীনে সচ্ছল ও অর্থবহ জীবনযাপনের সোনালী আশায় বাংলদেশের আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতার সংগ্রামে স্বেচ্ছায় স্বক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল। এ সত্য ভুলে দুঃখ জর্জরিত জীবনের হতাশার সুযোগ নিয়ে জনসাধারণকে অতীতমুখী করে কিছু সময়ের জন্যে শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিবৃদ্ধি হয়ত সম্ভব। কিন্তু যারা একাজ করছেন পরিণামে তারা নিজেদের এবং দেশ ও জাতির সবনাশ ডেকে আনবেন। রচনাকে উদ্ধৃতি-কণ্টকিত করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তবু বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে প্রকাশিত ডক্টর মর্গানের 'এ্যানসিয়েন্ট সোসাইটি'—Ancient Society নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের কয়েকটি পংক্তির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ডক্টর মর্গান লিখেছেন: "In the light of the experience of the intervening two thousand years, it may well be observed that the inequality of privileges, and the denial of the right of self-government here commended created and developed that mass of ignorance and corruption which ultimately destroyed both government and people. The human race is gradually learning the simple lesson, that the people as a whole are wiser for the public good and the public prosperity, than any privileged class of man, however refined and cultivated, have ever been or, by any possibility, can ever become." (Ancient Society by Lewis H. Morgan—Bharati Library edition—p 344) সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ: বিগত দু'হাজার বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, সুযোগ-সুবিধার অসমতা এবং স্বাধিকার প্রদানে অস্বীকৃতি ব্যাপক অজ্ঞতা এবং দুর্নীতির জন্ম দেয়। পরিণামে তা সরকার এবং জনসাধারণ উভয়কে ধ্বংস করে। মানব জাতি ক্রমশঃ বুঝতে পারছে যে, সাধারণের মঙ্গল জনসাধারণই ভালো বোঝে।

এ-ব্যাপারে তাদের জ্ঞানবুদ্ধি তথাকথিত বিদগ্ধ, শিক্ষিত ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাভোগীদের চেয়ে বেশী। ডক্টর মর্গান সমাজতন্ত্রীও ছিলেন না—কমিউনিষ্টও ছিলেন না। সুতরাং কথাগুলো স্মরণ রাখা সকল সংশ্লিষ্ট মহলের কর্তব্য।

পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশসমূহের অন্যতম বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান অর্থনীতির ক্লাসিক্যাল থিওরীর মধ্যে পাওয়া যাবে না। এ-ধরনের দেশে ইতিহাসের ধাপ সংক্ষেপ করতে হয়। পশ্চাদ্ধাবন করলে সমস্যার জটিলতা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে এবং ডক্টর মর্গান যে পরিণতির কথা বলছেন দেশকে সেদিকেই টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তাই পশ্চাদ্ধাবন নয়, মূর্খতা সম্প্রসারিত করে সংকট ঠেকিয়ে রাখা অথবা কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ প্রচেষ্টাও নয়, সাহস ও সততার সাথে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রাচীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক রূপরেখার জরাজীর্ণ ইমারতে চুনকাম করে ফল পাওয়া অসম্ভব, কেননা তার ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। ওটা সমূলে উৎখাত করে নতুন ইমারত তৈরী করতে হবে ঃ তার শৈল্পিক রূপ ও রীতি, অবয়ব, ভিতরের সরঞ্জাম এবং বাইরের রূপ সব কিছুই হবে নতুন—জনবহুল বাংলাদেশের সমস্যাবলী সমাধানের উপযোগী। একমাত্র এ-পথেই আমাদের মুক্তি সম্ভব। বলা বাহুল্য ইহ-লোকের সহজ-সচ্ছল জীবন পরকালের জীবনকেও সুখী করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। পরিশেষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওলানা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলভীর (মোজাদ্দেদ আলফিসানী) একটি মন্তব্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তিনি বলেছেন, "যদি কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার বিকাশ ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে তার শিল্পকলা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তারপরে শাসকগোষ্ঠী যদি ভোগ বিলাস, আরাম-আয়েশ, ঐশ্বর্যের মোহাচ্ছন্ন জীবনকেই বেছে নেয় তা'হলে সেই আয়েশী জীবনের বোঝা মজদুর শ্রেণীর উপরেই চাপে; ফলে সমাজের অধিকাংশ মানুষ মানবেতর পশুর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। গোটা সমাজ জীবনের নৈতিক কাঠামো তখনই বিপর্যস্ত হয় যখন তাকে বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক

চাপের মধ্যে জীবন-যাপনে বাধ্য করা হয়। তখন লোককে রুজি-রুটির জন্যে ঠিক পশুর মতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। মানবতার এ-চরম নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগের মুহূর্তে, এ-অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্যে আল্লাহ হ'তে নিশ্চয়ই কোন পথের নির্দেশ আসে। অর্থাৎ স্রষ্টা নিজেই বিপ্লবের আয়োজন করেন। জনগণের বুকের উপর থেকে বেআইনী শাসকচক্রের জগদ্দল পাথর অপসারিত করার ব্যবস্থা তিনি নিজে করেন।" (মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী রচিত "শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি সিয়াসী তহরিক" নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত)।

সমকাল
জুন, ১৯৭৬

জনতা, স্বাধীনতা এবং জাতি

'গড্ডালিকা প্রবাহ' বাংলাদেশের একটি বহুল প্রচলিত কথা। বাঙ্গালী গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে বেড়ায়, এটিও প্রায় একটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। গড্ডালিকা প্রবাহের সমার্থবোধক শব্দগুচ্ছ বোধ করি "গোলে-মালে হরিবোল"--ব্যাখ্যা করলে বোঝাবে ভাবপ্রবণতা বা ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে চলা। বাঙ্গালীকে ভাবপ্রবণ জাতি বলা হয়। ভাবপ্রবণতা কিন্তু জনতার ধর্ম, জাতির ধর্ম নয়। জনতা এবং জাতি দু'টি ভিন্ন বস্তু। রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা শুনতে যারা একত্রিত হয় তাদেরকে জনতা বলা যায়। কেননা, সেটাকে স্থূল বক্তৃতা দ্বারা উত্তেজিত করে অথবা ভয় দেখিয়ে এমন আচরণে লিপ্ত করা যায় যা স্বাভাবিক জীবনে মানুষ করে না। লুণ্ঠন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাধারণের সম্পত্তি বিনষ্ট, সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নকালে ঠেলাঠেলিতে প্রাণনাশ, বাজারে-বন্দরে সামান্য কারণে বড় রকমের সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি জনতার কাজ। জনতা আদৌ ভালো কাজ করে না এমন না, কিন্তু তার সংখ্যা কম। এই হেতু যে, ভালো ও জনকল্যাণকর কাজ করতে কমবেশী পূর্বচিন্তা এবং প্রস্তুতি আবশ্যক। জনতা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠারও যন্ত্র হতে পারে। জনতা বিপ্লবের সহায়ক। কিন্তু জনতা দ্বারা বৈপ্লবিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, কেননা, বিপ্লব হচ্ছে পুরাতনকে বিসর্জন এবং নতুনকে গ্রহণ। পুরাতন হচ্ছে দীর্ঘকালের সংস্কার এবং পুরুষানুক্রমিক আস্থা ও আচার-আচরণ—জীর্ণতার প্রতি মায়া, মায়ের দেয়া জীর্ণ বসনখানির প্রতি মমতা, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় নস্টালজিয়া তাই। সুতরাং, সংস্কার এবং পুরুষানুক্রমিক আস্থার অনুকূলে উত্তেজিত করা যত সহজ, নতুনের অনুকূলে উত্তেজিত করা তত সহজ নয়। পক্ষান্তরে, প্রতি-নিয়ত প্রচার দ্বারা জাতিকে জনতায় পরিণত করে তার সাহায্যে দেশে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অব্যাহত রাখা খুবই সম্ভব, কেননা একনায়কত্ব

একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা; পিতৃপ্রধান পরিবার তার উৎস, সুতরাং একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, হোক না সেটা খুবই মন্দ। আমরা যে বস্তুকে অথবা বোধকে সংস্কৃতি বলে চালাই তার সব কিছুই ভালো এবং অনুকরণীয় নয়। এ যুগের বিত্তবান কাঁথা ব্যবহার করেন না, কিন্তু নক্সী কাঁথার কথা উঠলে তিনি ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠেন। হিটলার প্রতিনিয়ত প্রচার দ্বারা জার্মান জাতির ন্যায় একটি বিদ্বান বুদ্ধিমান জাতিকেও জনতায় পরিণত করতে সমর্থ হয় এবং তার সহায়তায় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। জার্মান জাতির চরিত্র জনতার চরিত্রে পরিণত হওয়াতেই হিটলারের পক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘটানো সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য, ওটা ছিল আত্মবিনাশের পথ। সুতরাং, ভাবপ্রবণতা, 'মিথের' পশ্চাতে ছোটা হচ্ছে মহা-মূর্খতা।

বাঙ্গালীকে ভাবপ্রবণ বলা হয়। তাহলে বাঙ্গালী চরিত্র কি জনতার চরিত্র? প্রশ্নটা খুবই ঢালাও। হাঁ বা না, এক কথায় এ-প্রশ্নের উত্তর হয় না। দেশের সকল মানুষের চরিত্র কখনও এক ও অভিন্ন হতে পারে না। মানুষে মানুষে আকৃতির বর্ণের গঠনের যেমন পার্থক্য তেমনি তাদের মধ্যে চারিত্রিক পার্থক্যও বিদ্যমান। ইংরেজেরা বণিক, সুতরাং, খুবই ঠাণ্ডা মগজের জাত বলে পরিচিত। কিন্তু জনতার আচরণ তারাও করে না এমন নয়। মাত্র কিছুদিন পূর্বে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্কটল্যাণ্ডে এক জনতা দ্বারা অপমানিত হন। বৃটেনে এটা অকল্পনীয় ব্যাপার; কিন্তু ঘটলোত। জনতা ঘটালো। বাঙ্গালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলে সমষ্টিগত কার্যকলাপে এ যাবৎ তারা জনতাসুলভ আচরণ করেছে বেশী; জনতার যা ধর্ম তাই পালন করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এর অবশ্য ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। দায়িত্বই মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। যে ব্যক্তির শিকল ছাড়া হারাবার কিছু নেই (মার্ক্সের কথা) সে সম্পত্তি সংরক্ষণে তৎপর হতে পারে না। দায়িত্ব পালন হচ্ছে গাণিতিক লজিক অনুযায়ী চলা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদিতে নাকি রয়েছে গণিত: অর্থাৎ দু'য়ে দু'য়ে চারের লজিক। দুই এবং দুই হাতে এলে পরেই শুধু দু'য়ে দু'য়ে যোগ করে চার করার বুদ্ধি মাথায় খেলতে পারে, তার আগে নয়। বাংলাদেশ দীর্ঘকাল ধরে পরাধীন ছিল। সমষ্টি-গতভাবে বাংলাদেশের মানুষের কোনরূপ রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল না। সামাজিক দায়িত্ববোধ ছিল একথাও জোর করে বলা যায় না, কেননা,

সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব আসলে পৃথক কিছু নয়—একই দায়িত্বের দু'টি বিভাগ। সামাজিক দায়িত্ববোধ হতে রাজনৈতিক সংগঠনের উৎপত্তি। যে জাতির রাজনৈতিক সংগঠন নিজের হাতে নেই তার সামাজিক সংগঠনেও নানা ব্যাধি দেখা দেয় এবং ক্রমে তা চালুনের ন্যায় ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে। কাঠামোটাই শুধু থাকে, কিন্তু একাত্মতা থাকে না। বৃটিশ শাসিত ভারতে তাই হয়েছিল।

বৃটিশ ও পাকিস্তানী আমলের কথা বিচার করা যাক। বাঙ্গালী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে যথার্থ, কিন্তু সে সংগ্রাম কখনও আন্দোলন-আলোড়নের ধর্ম ছাড়েনি। সভা-সমিতিতে বৃটিশ ব্যুরোক্রাসি এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ্ত হয়েছে। বক্তৃতা শুনে মানুষ ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়েছে কখনও; কখনও রাজশক্তির সংগে প্রকাশ্য সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু আবেগ ছেড়ে সেটা কখনও স্থিতিশীল সাংগঠনিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। স্বাধীনতা মানুষের মনে একটি বোধ রূপে ক্রিয়া করেছে, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর দায়িত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল এমন দাবী করা যায় না, কেননা, যেখানে দায়িত্ব অর্পায়নি সেখানে দায়িত্ব সচেতন হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তখন একমাত্র কর্তব্য ছিল ভাঙ্গা, বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটানো। সমষ্টিমন ভাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল; ভাঙ্গার প্রতিটি সুযোগ তারা বিচ্ছিন্নভাবে হোক বা সমষ্টিগতভাবে হোক ব্যবহার করেছে, কিন্তু ভাঙ্গার পরে সমষ্টিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ যে কত বড় দায়িত্ব তৎসম্বন্ধে খুব কম লোকই সচেতন ছিলেন। সচেতন ছিলেন না বলেই বৃটিশ রাজ যখন গেলেন, তখন দেশে উত্তরাধিকারী সরকার বসলো, পিতার মৃত্যুর পর পুত্র যেমন তার পরিত্যক্ত আসনে বসে তেমনি; কিন্তু নতুন সরকার স্থাপিত হলো না; ঘটলো না সামাজিক বিবর্তন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শুদ্র, আশরাফ, আতরাফ, ইতর, ভদ্র প্রভৃতির ব্যবধান যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেলো। যে আমলাতন্ত্র বৃটিশের হয়ে এ দেশের মানুষের উপর নির্যাতন চালাতো সেটা যথাযথ প্রতিটি প্রাণী সমেত বহাল রইল—জন কয়েক ইংরেজ গেলো মাত্র। যে সেনাবাহিনী বৃটিশের হয়ে এদেশের মানুষের উপর গুলী চালাতে পশ্চাদপদ হয়নি, সেটিও প্রতিটি লোক সমেত রয়ে গেলো, চলে গেলো উপরের গুটিকতক বৃটিশ অফিসার এবং গোরা ব্যাটলিয়নগুলো।

ফল যা হলো তা আমাদের চোখের সমুখেই আছে। ভারতবর্ষের মতো দেশ যেখানে যুগে যুগে এমন সব জ্ঞানী-গুণী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মেছেন যারা পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন কালের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাথে তুলনীয়, সেখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাধীনতা লাভের পঁচিশ বৎসর পরেও প্রায় যেমনকে তেমনই রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষ করে এর মুসলমান সম্প্রদায় বিগত দু'শ' বৎসরকাল ধরে অবিরত জনতার আচরণ করে আসছে বললে তাদের প্রতি অন্যায় দোষ আরোপ করা হয় না।

পাকিস্তান আন্দোলনের কথাই ধরা যাক। সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই এ-জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক যে, ১৫০০ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দু'টি অঞ্চলের মানুষ কখনও এক জাতি হতে পারে না, এমন কি এক ভাষাভাষী হলেও নয়; ধর্ম ত জাতির কোন উপকরণই নয়। এক শাসনাধীনে থাকতে পারে বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের সম্পর্ক মুনীব ও দাসের সম্পর্ক হতে বাধ্য। হয়েছিলও তাই। কিন্তু বাংলার মানুষ এই সাধারণ চিন্তাটুকুও সেদিন করেনি। যিনি জীবনে কখনও নামাজ-রোজা করেননি, এমন কি নামাজ-রোজার বিধি-বিধান জানতেন কিনা সন্দেহ, সেই মিঃ জিন্নাহ ইসলামের নামে তাদেরকে উত্তেজিত করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। মদ্যপ লম্পটেরাও ইসলামের নামে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। প্রায় গোটা পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীটিই ছিল মদ্যপ। এসব মোনাফেক রিয়াকার স্বার্থান্বেষীদের প্রচারণায় গোটা বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায় জনতায় পরিণত হয়। তারই ফলে ইংরেজ আমলের গোলামিকাল ছাড়াও অতিরিক্ত আরো চব্বিশটি বৎসর পশ্চিম-পাঞ্জাবী বর্বর মূর্খদের গোলামি ভোগ করতে হয় বাঙ্গালীকে।

আজ গোলামিমুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু এ মুক্তি কি বাংলাদেশের মানুষের পূর্ব পরিকল্পিত সমষ্টিগত কার্যক্রমের ফল, না কি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা? এদেশের মানুষ কি সমষ্টিগতভাবে ১৯৭০ সালেও বাংলাদেশকে একটি আলাদা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল? প্রণয়ন করেছিল কি তজ্জন্য কোন কার্যক্রম? সত্যের খাতিরে বলতে হবে, না, তারা তার কোনটাই করেনি। তাদের আন্দোলন-আলোড়ন, বিক্ষোভ-

মিছিল, সভা-সমিতি, বক্তৃতা প্রস্তাব প্রভৃতি সমস্ত কিছুর লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকেই এমন একটি উন্নততর রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা যেখানে তার প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ সমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

মূর্খতা এবং বুদ্ধিহীনতা পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী এবং সেনাপতিদের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আওয়ামী লীগের ছ'দফা মেনে নিলে আজ বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে চিহ্নিত হতো না, যত বেশী স্বায়ত্তশাসনই ভোগ করুক না কেন, পাকিস্তানের অংশরূপেই থেকে যেতো। সত্যের খাতিরে এটাও স্বীকার করা আবশ্যক যে, পাকিস্তানী চমূর দল ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশের মানুষ পাইকারীভাবে হত্যা এবং মা-বোনদেরকে নির্যাতন শুরু না করলে বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ আপনা থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করত না। ১৯৬৫ সালেও দুর্বৃত্ত পাকিস্তানী সামরিক নেতাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঙ্গালী বাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আজকের অতিশয় প্রগতিবাদী বাঙ্গালী শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, অধ্যাপক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই তখন ঢাকা রেডিও এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাকিস্তান-প্রেমের বন্যা বইয়েছেন এবং ভারত-বিদ্বেষ প্রচার করেছেন। অথচ পাকিস্তানই প্রথমে ভারত আক্রমণ করেছিল। একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান একটি ভিন্ন ধরনের বিবৃতি দিয়েছিলেন, বাকী সকল বাঙ্গালী নেতা ভুট্টোর ন্যায় ভারতের বিরুদ্ধে আজন্ম লড়ার সদম্ভ ঘোষণা জানিয়েছিলেন। বুদ্ধিজীবীরা এনামও পেয়েছিলেন। খেতাব, পদ, বিনা ব্যয়ে বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি বহু সুযোগ-সুবিধা তাঁরা ৬৫ থেকে ৭০ সাল অবধি ভোগ করেছেন। অথচ ১৯৬৫ সালেও পাকিস্তানী শাসককুল ১৯৭১ সালের মতোই দুর্বৃত্ত, লম্পট এবং মদ্যপ ছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্ব-পরিকল্পিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত যুদ্ধ নয়। আমরা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম। আক্রান্ত হওয়ার পর পলায়ন এবং আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি। পরে ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় প্রতি আক্রমণ করেছি। জয়লাভও করেছি। এতে যে সাংগঠনিক তৎপরতা প্রদর্শিত হয়েছে তার প্রায় সবটাই সাময়িক এবং সামরিক। রাজনৈতিক

প্রস্তুতি বলতে ছিল মানুষের চব্বিশ বৎসরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং পাঞ্জাবী শাসকদের প্রতি ঘৃণা। আমার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাই বলে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেয়ে ছোট নয়। বরং বলা যায়, এ ধরনের সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমি শুধু এটাই উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের সশস্ত্র যুদ্ধ পূর্বনির্বাচিত রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং কর্মসূচীর ফল নয়। পাকিস্তানী শাসকদের মূর্খতা এবং অদূরদর্শিতাই আমাদিগকে যুদ্ধে নামিয়েছিল। আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহস, আত্মত্যাগ প্রভৃতির তুলনা নেই। কিন্তু তাই বলে আমরা ২২শে ডিসেম্বর তারিখ সকালেই বাঙ্গালী জাতিতে পরিণত হইনি।

অপরের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ, বিদ্বেষ এবং আক্রান্তজনের আত্মরক্ষামূলক কার্যাবলী প্রভৃতির কোনটাই এমন কি সবগুলো একত্রে মিলেও কোন দেশের মানুষকে জাতি বলে চিহ্নিত করতে সমর্থ নয়। এগুলো জনতারও চরিত্র বৈশিষ্ট্য। দলবদ্ধ হয়ে জনতাও আত্মরক্ষা করে অথবা সেবেলা উল্লিখিত মেষপালের ন্যায় আত্মাহুতিও দেয়। জনতার মধ্যে নানা বর্ণ, ধর্ম এবং জাতের মানুষ থাকতে পারে।

জাতি সে বস্তু নয়। জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কালাগোরার অবস্থানও থাকতে পারে—অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস ত থাকবেই, কিন্তু এমন কতকগুলো সাধারণ বিষয়ে তাদেরকে এক মন এক আত্মা হতে হবে যে, সেখানে তারা কোনক্রমেই বিভাজ্য নয়। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সেই সাধারণ ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ছিল না। তখন আমরা ভাঙ্গার কাজ করেছি যা আসলে নঞর্থক (নেগেটিভ) কাজ। স্বাধীনতা এই সর্বপ্রথম আমাদের কাছে সেই সাধারণ ক্ষেত্রটি উন্মোচিত করেছে। বিগত কয়েক শ' বৎসরের মধ্যে এই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মানুষ একটি জাতিরূপে সদর্থক (পজিটিভ) কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলো। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাসকারী এক ভাষাভাষী এই জনসমষ্টি তার ইহলৌকিক ভাগ্যকে এক ও অভিন্ন এবং অবিভাজ্য বিবেচনা করবে, তবেই হবে সে একটি জাতি। জাতির মধ্যে পৃথক শ্রেণীস্বার্থ থাকতে পারে, শ্রেণী সংঘাতও উপস্থিত হতে পারে, নানা ধর্মাবলম্বী লোকের অবস্থান থাকতে পারে, আভিজাত্যবোধ থাকতে পারে, নানা উপলক্ষে কখনও

কখনও পারস্পরিক বিরোধও উপস্থিত হতে পারে, কিন্তু জাতি তার সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজবে ঐ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই। জাতি কখনও দেশকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে না, জাতি কখনও বিদেশের ইঙ্গিতে চলে না। ভৌগোলিক অবস্থান জাতির কাছে চরম সত্য। ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে অর্থাৎ দেশের নামে আবেদনের ঊর্ধ্বে তার কাছে আর কোন আবেদন নেই।

জাতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, কিন্তু প্রত্যেক দলের আনুগত্য থাকে দেশের প্রতি। নাম যাই হোক, সমস্ত রাজনৈতিক দলই জাতীয় দল। যেমন বৃটেনের বিরোধীদল মহামান্যা রানীর সাতিশয় অনুগত বিরোধীদল। স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক দল গণমানুষের নেতিবাচক ধ্যান ও ক্ষোভকে মূলধন করে রাজনীতি করে না, আকাশ-কুসুম কিছু প্রতিশ্রুতিও দেয় না। তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিদ্যমান অবস্থাধীনে যা করা সম্ভব তেমন কার্যসূচী উপস্থিত করে। স্বাধীনদেশের রাজনৈতিক দল তাই তল থেকে উপর অবধি সুশৃঙ্খলভাবে গঠিত হয়; এবং কালক্রমে তা আমলাতান্ত্রিক অনিগার্কির রূপ ধারণ করে। স্বাধীন দেশে রাজনীতি করা হয় রাষ্ট্রপরিচালন-ক্ষমতা দখল করার জন্যে। ক্ষমতা দখল সেখানে নিন্দার নয়। যে দল ক্ষমতা দখল করতে চায় না, শুধু গণমনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে চায়, স্বাধীন দেশে তেমন দলের রাজনীতি করার অধিকার নেই। জনতাকে অযথ ভাবাবেগে ক্ষিপ্ত করে তোলার রাজনীতিও স্বাধীন দেশে অচল। কারণ ভাবাবেগে ক্ষিপ্ত জনতার প্রবণতা হচ্ছে ধ্বংস করার প্রতি পক্ষান্তরে স্বাধীন দেশের মানুষের সমষ্টিগত দায়িত্ব হচ্ছে দেশকে সর্ববিষয়ে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা। স্বাধীন দেশের মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনুগত্য তার পরিবার, গোত্র, শ্রেণী, বর্ণ, পেশা, ধর্ম এবং দলের প্রতি; কিন্তু তার অবিভাজ্য এবং বৃহত্তর আনুগত্য হচ্ছে তার দেশের প্রতি, এবং দেশ মানেই জাতি। দেশ কিংখাব নির্মিত একটি বৃহৎ ছত্র। তার ছায়ায় সকলের বাস। আর যাই করা হোক ছত্রটি ছিন্ন করা যায় না। অথবা দেশ একটি বৃহৎ বহু প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট অট্টালিকা। সেখানে বহুলোক বসবাস করে। তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু আনুগত্য আছে। কিন্তু ঐ অট্টালিকাটির প্রতি সকলের দরদ এবং আনুগত্য সমান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনুগত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত

হয়ে অট্টালিকাটির ছাদ ভেঙ্গে ফেললে সবাইকে নিরাশ্রয় হতে হবে। তখন ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনও আনুগত্য প্রদর্শনের সুযোগই থাকবে না। স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে পরম জাগতিক সত্য হচ্ছে তার দেশ।

[ইত্তেফাক ৭. ১১. ৭৩]

রাজা রামমোহন রায়

রামমোহনের যে সময়ে জন্ম তার অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের অবস্থা, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিনমাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পারিল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। ......লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়।—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে ছেলে স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না,

তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনি আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া পলায়।" এর কারণ, স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায়, "...কিন্তু যখন মুঘল শাসন ও সভ্যতার অর্দ্ধচন্দ্র ডুবিয়াছে, অথচ বৃটিশেরা নিজ হাতে সাম্রাজ্য শাসন লইতে কুণ্ঠিত, শুধু বাণিজ্য এবং টাকা আদায় ছাড়া বাঙ্গলায় কোন কাজ করিবেন না, সেই আঠার বৎসর পলাশীর যুদ্ধ হইতে হেষ্টিংস কর্তৃক শাসন সংস্কার আরম্ভ পর্যন্ত—বাংলার পক্ষে যে কি ভীষণ কাল ছিল, তাহা সকল সাহেব লেখকই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মেকলের চক্ষে বাঙ্গালীরা—কি হিন্দু, কি মুসলমান—সমান ঘৃণার পাত্র, মনুষ্য নামের উপযুক্ত কিনা সন্দেহ। অথচ তিনি তাঁহার "লর্ড ক্লাইভ" এবং ওয়ারেন হেস্টিংস" নামক দুইটি জগদ্বিখ্যাত প্রবন্ধে এই অত্যাচার অবিচারের জ্বলন্ত চিত্র দিয়াছেন। 'Then was seen what we believe to be the most frightful of all spectacles, the strength of civilisation without its mercy"....' আর সেই ম-স্তরের সময় দেশের হর্তকর্তা মুহম্মদ রেজা খাঁ কি কাজ করিলেন? স্বয়ং হেস্টিংস তাঁহার বিলাতের প্রভুদের জানাইতেছেন ঃ- The effect of the dreadful famine which visited these provinces in the year 1770 and raged during the whole course of that year have been known to you. Notwithstanding the loss of at least one-third of the inhabitants of province and the consequent decrease of the cultivation, the net collection of the year 1771 exceeded even those of 1768. It was to be naturally expected that the diminution of the Revenue should have kept an equal pace with the other consequences of so great a cala-

mity. That it did not, was owing to its being violently kept up to its former standard. To ascertain all the means by which this was effected will not be easy···One tax, however, we will endeavour to describe, as it may serve to account for the equality which has been preserved in the past collections, and to which it has principally contributed. It is called Najar, and it is an assessment upon the actual inhabitants of every inferior description of lands to make up for the loss restained in the rents of their neighbours, who are either dead or fled from the country."

যে দুর্ভিক্ষে তৎকালীন বাংলা দেশের অনুমান সাড়ে তিনকোটি জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কালেও এক কানাকড়ি রাজস্ব ঘাটতিও হচ্ছে না, বরং বৃদ্ধিই পাচ্ছে। বলা বাহুল্য যে কোন রাজশক্তির সমস্ত জঘন্য অপরাধের মধ্যে এ-ধরনের অপরাধ জঘন্যতম। বাংলা ও বিহারে যথাক্রমে রেজা খাঁ এবং সেতাব রায়কে এজন্য দায়ী করা হচ্ছে। কিন্তু রেজা খাঁয়েরা কি ফ্রী এজেন্ট ছিলেন? অর্থাৎ তাঁরা কী স্বাধীন নৃপতির স্বাধীন নীতি অনুসরণ করছিলেন? না। মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব নিজেই ছিলেন ইংরেজের অনুগ্রহে গদিনশীন। ইংরেজ তাতেও নিশ্চিত হতে পারে নি। তারা নবাবের নামমাত্র অধীনে একজন নায়েব দেওয়ান অর্থাৎ—ডিপুটি নিযুক্ত করে। রেজা খাঁ ছিলেন কোম্পানী নিযুক্ত এবং কোম্পানীর কাছে দায়ী সেই ডিপুটি। রেজা খাঁ স্বয়ংও পাষণ্ড ছিলেন হয়ত--পাষণ্ড শাসকের চাকর পাষণ্ড হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের উপর যে নির্মম জুলুম তখন চলছিল প্রকৃতপক্ষে তার জন্যে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীই দায়ী ছিল। আরো উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার জনসাধারণের উপর এ-শ্রেণীর নির্মম অত্যাচার '৭৬ এর মন্বন্তরের সময়কার একটি সাময়িক ঘটনামাত্র নয়, তার আগেও চলেছে এবং পরেও বহুকাল অবধি চলেছে। এবং এ নিপীড়নে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী, সাধারণ ইংরেজ বণিক এবং নীলকুঠিয়াল প্রমুখের সঙ্গে এক শ্রেণীর দেশীয় লোকও সমান নির্মম ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল।

উৎপীড়িতগণ দেশীয় তজ্জন্য দেশীয় উৎপীড়ক এতটুকু মর্মপীড়াও বোধ করেনি।

বস্তুতঃ পলাশীর পর হতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীকাল দীর্ঘ সম্পূর্ণ সময়টাই হচ্ছে ফ্রী-ফর-অল্—অর্থাৎ যদৃচ্ছা লুণ্ঠনকাল। এবং এও একটি নির্মম ঐতিহাসিক সত্য যে, এটাই বাংলাদেশে প্রগতির সূচনা, সম্প্রসারণ—এমন কি জাতীয়-চেতনা নির্মিতিরও কাল। অপরপক্ষে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সূচনা এবং সম্প্রসারণ কালও এটা। সহজ কথায় যে মধ্যবিত্ত সমাজের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত এবং স্বাধীন হলো সেই মধ্যবিত্ত সমাজ গঠনের প্রারম্ভ ও ক্রমান্বয়িক সম্প্রসারণকালও এটা। ১৯৪৭ সালের মধ্যবিত্ত সমাজের পূর্ব-পুরুষগণ উপরিউক্ত ফ্রী ফর অল্ কালের লুটেরা এটা ঐতিহাসিক সত্য। ক্লাইভ ও হেস্টিংস এর দশীর দেওয়ানেরাই শুধু লুণ্ঠন করে নি, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী এবং বৃটিশ বণিক ও কুঠিয়ালদের দেশী দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দালাল, ফড়ে প্রভৃতি সকলে একযোগে ঐ ফ্রী-ফর-অল্ কালটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। কর্ণওয়ালিশ সৃষ্ট নতুন দেশীয় জমিদার তালুকদার এবং দেশীয় কর্মচারীর বেনামিতে ক্রীত জমিদারি তালুকদারির ইংরেজ মালিকও এ অবাধ লুণ্ঠনে শরিক ছিল। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে স্বাধীন দেশের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ঐ জালেম লুটেরাদেরকে আমরা যত দোষীই সাব্যস্ত করি না কেন, সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে যে, ওরা একটি প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। তা ছাড়া তৎ-কালীন ভারতবর্ষের সামাজিক চেতনায় ফ্রী-ফর-অল্ নীতি অনুযায়ী শোষণ, লুণ্ঠন এবং সালামি, বারবরদারি প্রভৃতি নানা নামে উৎকোচ গ্রহণ নিন্দনীয় ছিল বলেও মনে হয় না। পূজা ও মৌলুদ খতম পাঠের বিনিময়ে যে অর্থ গ্রহণ করেন ব্রাহ্মণ এবং মৌলবি এটাও কি এক প্রকার উৎকোচ নয়? উৎকোচ, উৎপীড়ন এবং সাধারণ লোক দ্বারা উৎপাদিত ধন অপহরণ ভারতবর্ষের একটি সনাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

মন্তব্যটি কটু। তাই সামান্য ব্যাখ্যা বোধ করি আবশ্যক। হিন্দু ও মুসলিম শাসনকালে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে এ কালের অর্থে কোন রূপ রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ং

সম্পূর্ণ গ্রাম তৎকালীন রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ইউনিট। রাজা ও রাজ্যের সীমারেখা পরিবর্তনের সঙ্গে ঐ ইউনিটগুলোর কোনরূপ সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়ার প্রাণ বাঁচলেই তারা সন্তুষ্ট ছিল, কখনও কখনও অবশ্য উলুখাগড়া মাঝখানে পড়ে যেতো—অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্র হতো জনপদ। কিন্তু যুদ্ধ শেষে পুনরায় যথা পূর্বং তথা পরঃ অবস্থায় ফিরে যেতো। রাষ্ট্র বলতে বোঝাতো বেতনভুক ভাড়াটে সেনাবাহিনী পরিবৃত অনেক দোর্দণ্ড প্রতাপ ব্যক্তির অধীন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল। অর্থাৎ কিনা গোর যার মুলুক তার এই ছিল সমাজ স্বীকৃত মূল্য-বোধ। রাজ্যের অধিবাসীদের উপর রাজ্যপাল যখন যা দাবী করতেন, তখন তা পূরণ করতে হতো। গ্রামের প্রধান ছিল দাবী আদায়ের মাধ্যম গ্রামে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষণকর্তা এবং বিচার আচারের জজ মুন্সেফ ম্যাজিস্ট্রেট। মুসলিম শাসনে একটি শক্তিশালী সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কিঞ্চিৎ চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু তার যে ফলশ্রুতি হওয়া স্বাভাবিক ছিল তা হয়নি, কেননা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার পশ্চাতে যে সজাগ ও সচেতন জাতিবোধ আবশ্যক সেটা নির্মাণে মুসলিম সম্রাটগণ কোনরূপ ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। প্রাচীন হিন্দু রাজা বাদশাহদের মতো তারাও দেশকে নিজের ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি জ্ঞান করতেন এবং এই ভূসম্পত্তি শাসন সংরক্ষণ ব্যয়বাদে সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থটাকে জ্ঞান করতেন নিজের নীট লাভ। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাঁর লুণ্ঠন-কার্যের অনুকূল ছিল, গ্রামবাসিগণও কেন্দ্রের শাসন মুক্ত জীবনযাপনকে বোধ করি ভালোই জ্ঞান করতো। স্বগ্রামের বাইরের একটা বৃহৎ অঞ্চলকে স্বদেশ রূপে গণ্য করার পূর্ব-শর্ত হচ্ছে সেই অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং তার প্রশাসনিক কার্যক্রমের সাথে একাত্মবোধ এবং সম্পৃক্তি। স্বদেশের মানস গঠনে দেশ যখন ব্যক্তিবিশেষের খাস খামার তখন ঐ একাত্মবোধ এবং সম্পৃক্তি স্থাপিত হতে পারে না। অর্থ-নৈতিক কর্মতৎপরতাও গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বিস্তৃত হয়ে একটি সার্বিক এবং পরস্পর নির্ভরশীল অর্থব্যবস্থায় পরিণত হয় না। রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, কারিগর, শিল্পপতি, জমিদার, জায়গীরদার, প্রভৃতি সকলেই তখন ব্যক্তিক অধিকার বিকাশ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। যখন যিনি দেশের নৃপতি হন তখন

তার প্রতি ওদের আনুগত্য প্রসারিত হয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ—তা দেশীয় রাজাদের মধ্যেই হোক অথবা দেশীয় রাজার সঙ্গে বৈদেশিক আক্রমণকারীর মধ্যেই হোক—তাদের চিত্তে হয়ত উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে থাকবে, কিন্তু তার হেতু জাতীয় স্বার্থহানির চিন্তা নয়, ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও স্বার্থহানির চিন্তা। পৃথ্বিরাজ জয়চন্দ্র এবং সিরাজউদ্দৌলা--মীরজাফরের কাহিনী একই কাহিনী। হিন্দু যুগ হতে মুসলিম শাসনামলের অবসান কাল অবধি বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত সামন্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কখনও লড়েনি, বরং তারা বিভক্ত হয়েছে এবং আপন প্রতিপত্তি ও অধিকার বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখলে বিভক্ত দলের কোন না কোন দল সেই বিদেশী আক্রমণকারীকে শক্তি সমর্থন যুগিয়েছে। অর্থাৎ, কি ভারতীয় সামন্তশ্রেণী কি ভারতীয় জনসাধারণ দু'পক্ষের কোন পক্ষের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আনুগত্য ছিল না —এমন কি ঐ বোধও ছিল না। না থাকার কারণ, পূর্বেই কিছুটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ভিত্তিক বৃহত্তর সামাজিক তথা জাতিচেতনা ভারতবাসীর মধ্যে জন্মাতেই পারেনি। এছাড়াও মুসলিম শাসনামলে জাতিগঠনের পক্ষে একটি অতিরিক্ত অন্তরায় ছিল। সেটি হলো বহুঈশ্বরবাদী এবং একেশ্বরবাদী দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মানুসারীর এক ভূমিতে বিপুল সংখ্যায় অবস্থান। জাতিচেতনা জাগ্রত হওয়ার অন্য একটি প্রধান কারণ কাব্য ও সাহিত্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টিমূলক উপকরণের অভাব। ফিরদৌসী ইরানী জাতীয় চেতনা সৃষ্টির জন্যে মহাকাব্য রচনা করেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতে তেমন কোন প্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষ বারবার বিদেশী আক্রমণকারীর অধীন হওয়ার প্রধান প্রধান কারণ বলা হলো। লক্ষণীয় যে, মারাঠাশক্তির চরম দুর্দিনেও সম্পূর্ণ হিন্দু-ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়ে সে শক্তিকে সাহায্য করেনি। অথচ বলা হয়, মারাঠা-গণ ভারতে পুনরায় হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিল।

মুসলিম শাসন অবসানের একটি অতিরিক্ত কারণ হলো, ইয়োরোপে যখন সার্বিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে তখনও সাম্রাজ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতায় অন্ধ আস্থাহেতু প্রাকৃতিক নানা শক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহারে অনীহা অর্থাৎ যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণে অনিচ্ছা, বিদেশে কি ঘটছে তৎসম্বন্ধে

কৌতূহলের অভাব এবং বিদেশের সঙ্গে ভাব ও কলাকৌশল আদান প্রদানে বিমুখতা। এ বিমুখত আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও ছিল এমন কি তারপরেও অব্যাহত ছিল। উল্লেখ্য যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই বিদেশী বণিকগণ দলে দলে এদেশে প্রবেশ করতে থাকে এবং তাদের সংখ্যা ব্যাবসা-বাণিজ্য ও প্রতিপত্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা বহু নূতন নূতন দ্রব্য ও আবিষ্কার সঙ্গে নিয়ে আসে। ইয়োরোপ তখন শিল্পবিপ্লবের পথে পদক্ষেপ করেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। গেলিলিউ, রুশো, ভলতেয়ার, ডেভিরট, নিউটন, লক, হিউম, স্পিনোজা কেপল র, লাপ্লেস, কান্ট, হেগেল, গ্যোটে, ডেনডালটন, বেন্থাম প্রমুখ অসংখ্য বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ জন্ম নিচ্ছেন। শুরু হওয়ার পথে বাষ্পের যুগ।

পতনযুগের শেষ পর্যায়ে ভারতে এই আত্মকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ ফ্রি-ফর-অল্-এর প্রতি অনুরাগ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ জাতি সমগ্র ভারতের একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করবে কিনা, পলাশীর পরেও, কি ইংরেজ কি দেশীয়, উভয়পক্ষেরই তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল। আঠারো বৎসরের দ্বৈতশাসন ত র অন্যতম প্রমাণ। মুসলিম আমলে যারা জমিদার নামে পরিচিত ছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা ছিলেন সম্রাট নিযুক্ত ঠিকাদার। নির্দিষ্ট বাৎসরিক নজর এবং প্রয়োজনের সময় লোক-লস্কর, এবং অতিরিক্ত অর্থ যোগাতে পারলে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদারী ভোগ করতে পারতেন বটে, কিন্তু যে কোন সময়ে নিঃস্ব হওয়ার খড়্গও তাদের মাথার উপর সততঃ উত্তোলিত ছিল। এ সামন্তশ্রেণীই ছিল দিল্লীর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ভিত। এই অনিশ্চিত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকার কারণে সামন্তশ্রেণী এবং সম্রাটের মধ্যে পারস্পারিক অবিশ্বাস এবং অনাস্থার ভাব সততঃ বিদ্যমান ছিল। একারণে দিল্লীর প্রতিটি সম্রাটকে দেশের কোন না কোন সামন্তের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হতো।

নবাগত বৃটিশ শক্তির কাছে এই প্রাচীন ব্যবস্থা দু'দিক থেকেই ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক বিবেচিত হয়। প্রাচীন ব্যবস্থায় জমিদারদের হাতে শান্তি-শৃঙ্খলার ভার অর্পিত ছিল। তারাই আবার বিচারকও ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আপন আপন এলাকায় 'appurtenances of sovereignty'

ভোগ করতেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যবস্থায় কোম্পানীর মুনাফার না ছিল নিশ্চয়তা না ছিল পরিমাণগত প্রাচুর্য। কোম্পানী তাই প্রথমে সর্বোচ্চ ডাকে বার্ষিক ইজারা দেয়ার ব্যবস্থা, দ্বিতীয় পর্যায়ে দশসালা ইজারা ব্যবস্থা এবং তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ইজারা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের হাত থেকে শান্তিরক্ষা ও বিচার আচারের অধিকার কেড়ে নেয়। ভূমি ব্যবস্থায় এই পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সাধনের সময় কোম্পানী কখনও সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হয়নি। সুতরাং ডাকাডাকির সময়ে প্রাচীন জমিদার শ্রেণীটি লোপ পায়, কেননা নগদ টাকা সঞ্চয়ের চাইতে বরং ব্যয় করার প্রবণতাই ছিল ওদের মধ্যে অধিক। ফ্রি-ফর-অল্ প্রক্রিয়ায় নগদ টাকা জমা হয়েছিল কোম্পানীর বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দালাল, ফড়ে এবং ইংরেজ আমলাদের অধীনস্থ দেশীয় চাকুরেদের হাতে। এরা এবং কোম্পানীর কিছু ইংরেজ আমলা তাদের অধীনস্থ চাকর-বাকরদের বেনামিতে বাংলার প্রায় সমস্ত ভূমি চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় ভাগবাটোয়ারা করে নেয়। এ-ব্যবস্থা দ্বারা কোম্পানী একদিকে রাজস্ববৃদ্ধি এবং অপরদিকে একটি বড়সড় কৃতজ্ঞ বিশ্বাসভাজন দল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। প্রশাসনিক ক্ষমতা-হীন নির্ঝঞ্ঝাট ও স্থায়ী অনোপার্জিত আয়ের মালিক এই নতুন জমিদার তালুকদার শ্রেণীটি পরবর্তী শতাধিক বৎসর বৃটিশ শাসনের অনুকূলে সামাজিক সমর্থন যুগিয়েছে।

এ শ্রেণীটি তার অধীনে আরো বহু রকমের মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে। বাংলার আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী নির্মাণে এই শেষোক্ত ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্ব ভোগীগণের অবদানও অনুল্লেখযোগ্য নয়।

বাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণেচ্ছায় যে কোম্পানী সরকার এ সব কার্য করেনি, তার প্রমাণ, কোম্পানীর বাৎসরিক প্রাপ্য এবং আদায় খরচ বাদে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনকালে ভূম্যাধিকারীর জন্যে মাত্র শতকরা দশ টাকা মুনাফা রক্ষিত হয়। কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে নানা দফায় যদৃচ্ছা অর্থ আদায়ের লিখিত এবং অলিখিত অনুমতি জমিদারদেরকে দেয়া ছিল।

অপরদিকে কোম্পানীর চাকর নফরদের অতি সামান্য বেতন দেয়া হতো। লণ্ডন শহরের যত দুর্বৃত্ত বোম্বেটে এবং চোর বদমাশকে কোম্পানীর চাকরিতে ভর্তি ক'রে ভারতে পাঠান হতো। দেশীয়েরা কোম্পানীর অধীনে দেওয়ান

অর্থাৎ কলেক্টরের সেরাস্তাদারের উপরের কোন পদ পেতো না। ঐ তথাকথিত দেওয়ানদের মাসিক সর্বোচ্চ বেতন ছিল একশত টাকা মাত্র। কোম্পানীর এসব বিলেতী এবং দেশী চাকরদেরকে বেতনের ঘাটতিটা জনসাধারণের কাছ থেকে জোর জুলুম ও ব্যাবসার নামে নামমাত্র মূল্যে উৎপাদিত দ্রব্যাদি লুণ্ঠনের দ্বারা পূরণ করে নেয়ার অলিখিত অনুমতি দেয়া ছিল। পরোক্ষ সরকারী অনুমোদনে অব্যাহত এ-লুণ্ঠন এবং সরকারীভাবে এ দেশের গ্রাম কেন্দ্রিক কুটিরশিল্প বন্ধ করে দেবার নীতি অনুসরণের ফলে বাংলাদেশ শ্মশানে পরিণত। স্মরণীয় যে বাংলার সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং তৎপরবর্তীকালীন অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা কলকাতার নির্মীয়মান বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি। তারা তখন বারবণিতা, পায়রা, বুলবুলি, মদ্য ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত।

অবশ্য এই ফ্রী-ফর-অল্ অর্থাৎ যার যেমন খুশী লুণ্ঠন শোষণক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহ হয় নি এমন নয়। স্থানে স্থানে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল, কিন্তু আদর্শ, লক্ষ্য, সাংগঠনিক উৎকর্ষ এবং সর্বোপরি যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্বের অভাবে ঐসব বিদ্রোহ সফলতা লাভ করতে পারে নি। এমন কি করলেও ভারতের পক্ষে তা কতটুকু মঙ্গলজনক হতো তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত রায় দেয়া যায় না। ঐ সব বিদ্রোহের নেতাগণ হয় মূর্খ ছিলেন অথবা গুড্ ওল্ড ডেজ এ প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ ইতিহাসের গতিকে পশ্চাদ্দিকে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। মীর কাসিম আলী খাঁর বিদ্রোহ, ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের কৃষকদের বিদ্রোহ, বাকুঁরা বিষ্ণুপুরে কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতি কোন বিদ্রোহই সর্বাত্মক জাতীয় বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেনি। সর্বভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহরূপে সিপাহী বিদ্রোহকে চিহ্নিত করা হয়ত যায়, কিন্তু সেটাও ছিল ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় সামন্তশ্রেণীর সম্মিলিত অভিযান। দিল্লীর বাদশাহকে পুনরায় দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর করা তাদের লক্ষ্য ছিল। বিলেতের অনুকরণে গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের কোন উদ্দেশ্য সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের ছিল না। কাজেই এ বিদ্রোহও ইংরেজ তার দেশীয় সৈন্যদের সহায়তায় দমন করতে সমর্থ হয়। জাতিচেতনা থাকলে মানুষ কখনও বিদেশী শাসকের পক্ষে ভাড়াটে সৈনিকের

কাজ করে না। সিপাহী বিদ্রোহের বিশ্লেষণ ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার তাৎপর্য নির্ণয়ার্থে উল্লেখ করা হলো যদিও ঘটনাটি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর বহু পরবর্তী ঘটনা।

রামমোহন রায় বাংলাদেশের উপরিউক্ত চরম দুর্দিনের সময় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর কর্মজীবন সম্পূর্ণটাই হচ্ছে ঐ ফ্রী-ফর-অল যুগের অন্তর্ভুক্ত। রামমোহন কর্মজীবন আরম্ভ করেন কোম্পানীর চাকুরে রূপে। রংপুরে কালেক্টর ডিগবী সাহেবের দওয়ান অর্থাৎ সেরেস্তাদাররূপে তিনি তাঁর চাকরিজীবন শেষ করেন ১৭৭২-৭৪ সালের কোন এক সময়ে তিনি এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার পিতামহ এমন কি তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ বাদশাহ অথবা বাংলার নওয়াব দরবারে উচ্চপদে চাকরী করতেন। জমিদারী তালুকদারিও তাদের ছিল; কিন্তু তাঁর পিতার শেষ অবস্থায় পরিবারের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে। দেনা অনাদায়ের জন্যে তাঁর পিতা ও ভ্রাতাকে দেওয়ানী জেলেও যেতে হয়। রামমোহন বোধকরি কিছুকাল পৈত্রিক সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করেছিলেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পরে মাতার সাথে বনিবনা না হওয়ায় তিনি পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তির সাথে সম্পর্ক প্রায় বর্জন করেন বলা যায়। তাঁকে যথারীতি দলিলকরে প্রদত্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে তাঁর মাতা তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেন। মামলায় হেরে গিয়ে তাঁর মা একা তীর্থবাসে গমন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামমোহন পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তির মালিক হন বটে কিন্তু সেই সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলে মনে হয় না। পিতার জীবিতকালেই তিনি আলাদাভাবে রুজিরোজগারে মনোযোগ দেন। সেই ফ্রী-ফর-অল যুগের কি কি সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। ইংরেজ কালেক্টরের অধীনে দেওয়ানি কার্য ছাড়াও তিনি যে টাকা লগ্নি, এবং কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা করতেন তৎসম্বন্ধে বইপুস্তকে উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বোপার্জিত অর্থ দ্বারা তিনি জমিদারী-তালুকদারিও ক্রয় করেছিলেন। মোট কথা তিনি ধনী লোক ছিলেন এবং কলকাতায় এবং বিলাত প্রবাসকালে রাজার ন্যায় জীবন-যাপন করতেন। তাঁর বিদ্যাশিক্ষা কোথায় হয়েছিল, এবং তিনি ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চল এবং ভারতসন্নিকটবর্তী কোন্ কোন্ দেশ

পরিভ্রমণ করেছিলেন তৎসম্বন্ধেও সঠিক বৃত্তান্তের অভাব বিদ্যমান। তবে তিনি আরবী, ফার্সী এবং সংস্কৃত ভাষায় যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রাচ্য ভাষা বিজ্ঞানও যে তিনি জানতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং ডিগবী যে শুধু তার মনিব ছিলেন না, বরং বন্ধু ও ইংরেজী ভাষার শিক্ষক ছিলেন তাও ঠিক। তিনি হিব্রু ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। এই নিবন্ধে রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনের সন তারিখ সম্বলিত ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ দেয়া উদ্দেশ্য নয়। বৃহত্তর সামাজিক জীবনে রামমোহনের ভূমিকা এবং তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করাই বরং এ নিবন্ধের লক্ষ্য।

তাঁর সামাজিক কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো (১) তিনি এদেশে ইয়োরোপীয় কলোনাইজেশনের সমর্থক ছিলেন। অর্থাৎ দেশের সর্বত্র ইয়োরোপীয়গণ ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং কৃষিকর্মে ছড়িয়ে পড়ুক এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল এবং তজ্জন্য তিনি দেনদরবার করেন। (২) সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পরিবর্তে তিনি এদেশে ইংরেজী ভাষা ও ইয়োরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এজন্যে তিনি আজীবন চেষ্টা করেছেন। (৩) তিনি সমস্ত প্রচলিত ধর্মের নির্যাস একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে সর্বধর্মাবলম্বীর একটি মিলনস্থল স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এটাই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্ম নাম লাভ করে। (৪) তিনি হিন্দু ও মুসলিম শাস্ত্রকে পাদরিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে পলিমিক্সের আশ্রয় নেন এবং খ্রীস্টধর্মের একেশ্বরবাদ প্রমাণ করেন। তিনি ধর্মান্তর গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সেই সংগে তিনি ভারতীয় সমাজ হতে ধর্মান্ধতা ও ধর্মভিত্তিক কুসংস্কারাদি দূর করার চেষ্টাও চালান। এ প্রচেষ্টায় তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য সতীদাহ নিবারণ। (৫) ইয়োরোপ আমেরিকার গণস্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর আত্মিক সংযুক্তি। অর্থাৎ ভারতসহ পৃথিবীর সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন তাঁর কাম্য ছিল। (৬) সংবাদপত্র পরিচালনা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতি সজাগ দৃষ্টি। (৭) বাংলা সাহিত্যের সেবা।

প্রথমে কলোনাইজেশনের বিষয়টি আলোচনা করা যাক। সহসা শুনলে

বিস্ময় বোধ করার কথা। কোথায় ইংরেজ বিতাড়নের কার্যে দেশের আপামর জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করবে এবং তার নেতৃত্ব দেবেন রামমোহন রায়ের ন্যায় যোগ্য লোক, তৎপরিবর্তে কিনা দেশের সর্বত্র তিনি ইংরেজদের ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন, যাতে তারা এদেশের স্থায়ী অধিবাসী হতে পারে। এটা কোন্ ধরনের স্বদেশ প্রেম। কিন্তু বিষয়টা তখন এমন জটিল ছিল যে আজকের দিনের আলোকে তা বিচার করা যায় না। এদেশে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা করার সনদ ছিল। যাতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোক এবং তাদের চাকর বাকর ছাড়া অন্য কোন ইংলণ্ডবাসী এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য অথবা শিল্প ও কৃষি-খামার স্থাপন না করতে পারে সেজন্যেই সনদটির প্রয়োজন হল। বণিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির স্বদেশ-বিদেশ যেমন নেই তেমনি স্বজাতি বিজাতিও নেই। আপন স্বার্থে আঘাত লাগলেই শুধু স্বদেশ-বিদেশ এবং স্বজাতি বিজাতির প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তখন তারা দেশ গেলো, জাতি গেলো ধ্বনি তোলে। পরাজিত হওয়ার পূর্বে বণিক তার মুনাফায় কাউকে ভাগ বসাতে দেয় না। স্বদেশবাসী দূরের কথা আপন ভ্রাতাও যদি অনাহারে থাকে তবু বণিক তাঁকে তার ব্যবসার অংশীদ রূপে গ্রহণ করে না। আজকের দিনেও পৃথিবীর কোথাও এ নীতির ব্যতিক্রম হচ্ছে না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রাজনীতিকেরও কোন ধর্ম নেই। রাজনীতিকেরাও আপন শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার জন্যে দেশ, জাতি এবং কখনও কখনও ধর্মের কথা বলে। সাধারণ ধারণের অবস্থার উন্নতি দূরে থাকুক বরং স্বশ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষার্থে তারা প্রকৃত শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্ত দেশের অধিবাসীদেরকে কামানের খোরাক করতেও দ্বিধা বোধ করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর আজ ক'বছর ধরে ভিয়েৎনামে অগণিত মার্কিন নাগরিক নিধন করে যাচ্ছে। এর পূর্বে কোরিয়ায়ও তারা তাই করেছিল। এইহত্যালীলা অব্যাহত রেখে লাভবান হচ্ছে মার্কিনী অস্ত্রনির্মাতাগণ।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীও এ নীতি অনুসরণ করে চলছিল। যুদ্ধের সময় স্বদেশবাসীকে কামানের গোলার সমুখে ঠেলে দিলেও ব্যবসার সময় তারা কাউকে ভাগ দিত না। পূর্বেই বলা হয়েছে, লণ্ডন এবং ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য স্থানে যত বোম্বেটে, চোর, গুণ্ডা, বদমাশ, দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্তদেরকে চাকুরী

দিয়ে কোম্পানী ভারতে পাঠাতো। এরা শুধু যে কোম্পানীর স্বার্থ দেখতো তা নয়, হাটবাজার লুণ্ঠন করতো এবং ন্যায্যমূল্য না দিয়ে লোকের মাল অধিকার করতো। বিলেতে তখন বৃহৎ কলকারখানা স্থাপন শুরু হয়েছে। সে-সব কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম। প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বৃহৎ শিল্পজাতদ্রব্য বাজার দখল করে। কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী শুধু প্রতিযোগিতা করেই নিরস্ত ছিল না, তারা বলপ্রয়োগ দ্বারা বাংলার কুটির শিল্প বন্ধ করে দিয়েছিল। মসলিন বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করার জন্যে তারা ঢাকার তাঁতীদের আঙ্গুল কেটে দিয়েছিল বলেও শোনা যায়।

স্বদেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদি এই পদ্ধতিতে ভারতের বাজারে ছড়িয়ে দেবার পর তারা এদেশের কাঁচামাল এবং সোনা রূপা প্রভৃতি দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারদর হতে অনেক কম মূল্যে ক্রয় অথবা সরাসরি লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে কোম্পানী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বরদাশত করেনি। একচেটিয়া অধিকার অব্যাহত রাখার জন্যে তারা ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তু-গীজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে জলে ও স্থলে বহু স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এ দস্যুপনার সঙ্গে অধিকন্তু দোসররূপে যুক্ত হয়েছিল কোম্পানী সৃষ্ট চিরস্থায়ী স্বত্বভোগী জমিদার-তালুকদারদের জুলুম। ফলে দেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছিল এবং দেশ এক নিদারুণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছিল। সাধারণ লোক হয়ে পড়েছিল কৌপিন সর্বস্ব।

রামমোহন রায়ের প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, তিনি বাংলাদেশের তৎকালীন অসহনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্বেতনাসাগণের এ-দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং তথাকার ব্যবসায় বাণিজ্য ও উৎপাদনক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ প্রথমতঃ কোম্পানীর অন্যায় মুনাফা কথঞ্চিৎ হ্রাস করতে সমর্থ হতো, দ্বিতীয়তঃ এদেশে ইয়োরোপীয় পদ্ধতির উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রসার ঘটতো। এর ফলে এ দেশ শুধু ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যের বিক্রয় বাজারই থাকতো না, এদেশে প্রস্তুত নানা দ্রব্যাদিও ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের বাজারে রফতানি হতো। অর্থাৎ বাণিজ্যটা লেনদেন আদান-প্রদানে উন্নীত হতো। ঐরূপ অবস্থার

দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক তৎপরতা অবশ্যই বৃদ্ধি পেতো। ফলে শ্রমের মজুরি, এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য প্রভৃতি বৃদ্ধি পেতো। ইংরেজদের সাথে চলাফেরা, ভাববিনিময় এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হওয়ার ফলে এ-দেশবাসী যুগোপযোগী শিক্ষা, ও কারিগরিজ্ঞান লাভ করতে পারতো। রামমোহন রায় এবং তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী দ্বারকানাথ ঠাকুর হিসাবপত্র করে দেখিয়েছেন যে, যে-সকল স্থানে ইয়োরোপীয়গণ নীলকুঠি স্থাপন করেছে সে-সব স্থানে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। জমি ও কৃষিজাত পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে কৃষক ও শ্রমিক অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জীবন যাপন করছে—কৌপিন ছেড়ে বস্ত্র ধরেছে। তা'ছাড়াও কারখানায় নানা কার্যে নিযুক্ত আমলা, দালাল, ফড়ে প্রভৃতি মিলিয়ে একটি মধ্যবিত্ত সমাজ তৈরী হচ্ছে। অবশ্য নীলকরগণ ভগবান যীশুখ্রীস্ট ছিলেন না। কিন্তু রামমোহন দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ বলছেন, দেশীয় জমিদার তালুকদারেরাও ধর্মাবতার যুধিষ্ঠির ছিলেন না। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীও দেশের লোকের সুযোগ-সুবিধা তথা দেশের অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে নি। উভয়-পক্ষ একযোগে কলোনাইজেশনের বিরুদ্ধতা করেছে। দেশীয় জমিদার তালুকদারগণ বিরুদ্ধতা করেছে ভারতবাসীর জাতকুলমান ধর্মচ্যুতির দুশ্চিন্তায়। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধতার কারণ কোম্পানীর পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারগণের মুনাফা হ্রাস পাওয়ার আশংকা। রাজনৈতিক দিক থেকেও কলোনাইজেশনকে তারা নিরাপদ জ্ঞান করেনি। কিছুকাল পূর্বে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকানরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। বৃটেনবাসীরাই আমেরিকা কলোনাইজ করেছিল। সেজন্যই দগদগে এ দাগ যাতে তখনও ক্ষত ঘায়ের ন্যায় যন্ত্রণা দিচ্ছিল। ভারত কলোনাইজ করলেও সেই রকম একটা কিছু ঘটতে পারে এ-আশংকা বিলাতের দায়িত্বজ্ঞানশীল মহল লিখিতভাবেই প্রকাশ করেছিলেন। প্রকাশ্যে অবশ্য কোম্পানী ভারতবাসীর কল্যাণ-চিন্তায়ই কলোনাইজেশনের বিরুদ্ধতা করেছেন।

সে যাই হোক, আসলে উভয়পক্ষের আপত্তির মূল হেতু ছিল এক ও অভিন্ন। কলোনাইজেশন শুধু এ-দেশের অর্থনৈতিক তৎপরতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে না, উপরন্তু কলোনাইজেশন এ-দেশে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-

বিজ্ঞানও সাথে করে নিয়ে আসবে, তার ফলে দেশের লোকের অন্ধতা ঘুচবে এবং অন্ধতা দূর হলেই শোষণের পথে কণ্টক সৃষ্টি হবে—দেশীয় জমিদার-তালুকদার এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একযোগে কলোনাইজেশনের বিরুদ্ধতা করা এটাই ছিল প্রকৃত কারণ। অবশ্য রামমোহন রায়ও অবাধ কলোনাইজেশনের প্রস্তাব দেন নি। তিনি বাছাই করা বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সৎ ইংলণ্ডবাসীর আগমন সুপারিশ করেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, কলোনাইজেশনের পক্ষে রামমোহন এবং দ্বারকানাথের ওকালতির পশ্চাতে যুক্তি ছিল। এ-সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত দ্বারকানাথের কয়েকটি চিঠি উল্লেখযোগ্য। রামমোহন এবং দ্বারকানাথ কলোনাইজেশনের মাধ্যমে ভারতকে শিল্পায়িত, সামাজিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ নিদূরিত এবং আধুনিক শিক্ষা বিস্তার করতে চেয়েছিলেন।

জীবিতকালে রামমোহন তাঁর কলোনাইজেশন প্রস্তাবের সাফল্য দেখে যেতে পারেন নি। এবং কলোনাইজেশন বলতে যা বোঝায় ইংরেজ জাতি সেভাবে এ-দেশকে স্বদেশ করে নি। তবে, উত্তরকালে তারা মূলধন বিনিয়োগ করে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠা, বাষ্পচালিত পরিবহন প্রভৃতি দ্রুতগামী যানবাহন প্রবর্তন এবং সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি কার্য করে। তাতে দেশের অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং অধিক হতে অধিক সংখ্যক লোক চাকুরী পায়। ফলে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে। রামমোহন তাই চেয়েছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ভারত একদিন স্বাধীন হবে। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি।

এ-দেশে ইয়োরোপীয় পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ছিল রামমোহনের দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা। এ জন্যে তিনি আন্দোলন করেছেন। মনে রাখতে হবে, এ-দেশে তখন পর্যন্ত ধর্মান্ধতার যুগ চলছে। ইংরেজ শাসকগণ সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক। এই অনিচ্ছার পশ্চাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল। কোম্পানী তার লুণ্ঠিত অর্থের কোন অংশে পারতপক্ষে এ-দেশের লোকের ইহলৌকিক উন্নতিমূলক কার্যে ব্যয় করতে ইচ্ছুক ছিল না। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানী তখনও ভারত-

বর্ষের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত। হিন্দু ও মুসলিম আইনে অভিজ্ঞ কিছু সংখ্যক লোক হলেই তাদের কাজ চলতো। এ জন্যে হেস্টিংস ১৭৮২ সালে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তার দশ বৎসর পরে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ (টোল) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৯৮ সালে টিপু-সুলতান চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও নিহত হওয়ার পর, রামমোহন বোধ করি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ী হতে চলেছে। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণের ফলেই যে, ইয়োরোপীয় শক্তিসমূহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ জয় করে চলছিল, সম্ভবতঃ রামমোহনই এ-দেশের প্রথম ব্যক্তি যিনি এ-সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষা এবং তন্নিহিত জ্ঞান ইহলোকে মানুষের কোন কল্যাণ করছিল না। ষড়দর্শনের কঠিন সমস্যা এবং তৎসম্বন্ধীয় বিতর্ক সমাজের হিতের চাইতে অহিত করছিল বেশী। মুসলিম শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান দর্শন এবং মুসলমানী আইনের খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণের অতিরিক্ত বিশেষ কিছু ছিল না। মোট কথা উভয় শিক্ষা-প্রণালীই তখন অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। কোম্পানী সরকার এ-দেশের লোকের শিক্ষার জন্যে বার্ষিক একলক্ষ টাকা বরাদ্দ এবং তদ্দ্বারা সংস্কৃত স্কুল স্থাপন ও রক্ষণে অগ্রসর হলে, রামমোহন বিচলিত হয়ে পড়েন। ১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি লর্ড আমহারস্টকে লিখেন ঃ

"We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in mathematics, natural philosophy, chemistry, anatomy and other useful sciences, which the nations of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world", কিন্তু রামমোহন যখন দেখলেন ঐ টাকা দ্বারা "Government are establishing a sanscrit school under Hindu pundits to impart such knowledge as is already current in India," তখন তিনি বললেন, "This seminary similar in character to those which existed in Europe before the time of

Lord Bacon can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to the society," ... . সুতরাং, "as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful sciences, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talent and learning educated in Europe and providing a college furnished with books, instruments and other apparatus."

সে যুগে এরূপ প্রস্তাব সেনসংক্ষে পেশ করা একটি দুঃসাহসিক কার্য ছিল। রামমোহন রক্ষণশীল ধর্মান্ধদের প্রতিবন্ধকতার তোয়াক্কা করেন নি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল। ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হোক এটাই তাঁর কাম্য ছিল। সুতরাং ধর্মান্ধ হিন্দু সমাজপতিদের বিরুদ্ধতা লক্ষ্য করে তিনি হিন্দু কলেজের কমিটি থেকে আপন নাম প্রত্যাহার করেন। অবশ্য ইয়োরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন প্রচেষ্টায় তিনি ডেভিড হেয়ার, ডাফ প্রমুখ ইয়োরোপীয় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ দেশীয় বন্ধুবান্ধবদের সহায়তা লাভ করেছিলেন। অপর দিকে তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিয় এবং তাঁর ছাত্রশিষ্যগণ যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে একদিকে যেমন প্রাচীনপন্থীগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ধর্ম গেলো ধর্ম গেলো রব তুলেছিলেন তেমনি অপরদিকে তার প্রভাবও সমাজের উপর কিছু কিছু পড়ছিল। রামমোহন উগ্র নবীন দল এবং উগ্র সনাতনী পক্ষদ্বয়ের কোন পক্ষেই যোগদান না করে মধ্যপন্থা অনুসরণ করে চলছিলেন। ঈশ্বরকে বর্জন ব্যতীত আর সর্বপ্রকার অগ্রসরতার তিনি পক্ষে ছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর (১৮৩৩) অব্যবহিত পরেই এ-দেশে ইয়োরোপীয় পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে গৃহীত হয় এবং ইংরেজি সরকারী ভাষা রূপে প্রবর্তিত হয়। কলকাতা মেডিকেল কলেজও ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামমোহনের বিস্ময়কর প্রতিভার তৃতীয় এবং বোধ করি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। তাঁর চতুর্থ কার্য ধর্ম সম্পর্কিত পলিমিক্সও এ কার্যের অংশ, রূপে গণ্য হতে পারে। তাঁর ব্রাহ্মসমাজকে একটি ধর্ম সম্প্রদায়রূপে চিহ্নিত করলে রামমোহনের প্রতি চরম অবিচার করা হবে। বস্তুত:পক্ষে রামমোহনের জীবদ্দশায় ব্রাহ্মসভা ব্রাহ্মধর্মরূপে পরিগণিত হয় নি। রামমোহন কখনও অবতার বা পয়গম্বরত্বের দাবী উপস্থিত করেন নি। নিবন্ধের প্রথম দিক উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ভারতীয় বলে কোন জাতি ছিল না। জীবনযাত্রা রীতি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ফল্গুধারার যোগসূত্র থাকলেও, জাতি চেতনা গড়ে না ওঠার বহুবিধ কারণের মধ্যে প্রধান ছিল তার গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা এবং অন্যদিকে বর্ণ ও ধর্মভেদ। বিজেতারূপে এবং জীবনবোধের কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নততর ধ্যান ধারণা নিয়ে এসেছিল ইরানী সংস্কৃতি দ্বারা পরিশোধিত মুসলিম বিজেতা। রাজানুগ্রহ ও সামাজিক সাম্যের আবেদন বহু সংখ্যক নিম্নবর্ণীয় হিন্দুকে ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে। এরা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুর দাস। কাজেই ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণ উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের ইহলৌকিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে উচ্চবর্ণ হিন্দুর জীবনবোধ, দর্শন ও শিক্ষা সংস্কৃতিও যথেষ্ট উন্নতমানের ছিল, কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতিও ধর্মকে আগ্রাস করার যোগ্যতা তার ছিল না। আবার মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার যোগ্যতা ছিল না হিন্দু ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করার। সুতরাং হিন্দু ও মুসলিম দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় একটি বৃহত্তর মানবিক দেহে লীন হতে পারলো না। অপরদিকে বর্ণভেদ হিন্দু সমাজকে একটি ঐক্যবদ্ধ সমমর্যাদাসম্পন্ন মানবগোষ্ঠীতে পরিণত করার পথে পর্বতপ্রমাণ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কালক্রমে মুসলিম সমাজের উপরও হিন্দুর বর্ণভেদপ্রথা জেঁকে বসলো। ভারতীয় মুসলিম সমাজ আশরাফ আতরাফে ভাগ হয়ে গেলে। বিশেষ বিশেষ পেশায় নিযুক্ত মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হলো—একত্রে আহার বিহারে ত বটেই। মোট কথা ইংরেজের আগমনের পূর্বে এ-দেশের মানুষ কতগুলো ধর্মীয় ও বর্ণ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিলোপ করে ভারতবর্ষীয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ মানবগোষ্ঠীতে পরিণত করার প্রচেষ্টা

মহাবীর ও বুদ্ধদেব প্রাচীনকালে করেছিলেন। তাঁরা প্রথমে সফলকাম হলেও পরে ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়া সেই মনীষীদের প্রচেষ্টার চিহ্ন পর্যন্ত প্রায় বিলুপ্ত করে দেয়। মধ্যযুগের আকবর, কবীর, নানক বাংলায় শ্রী চৈতন্য প্রমুখও নানা ধর্মের সারকথার সমন্বয় ঘটিয়ে, ভারতবর্ষের শতধা বিভক্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। নানক কবীর চৈতন্য প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টার মধ্যে মহৎ মানবিক বোধ থাকলেও সচেতনভাবে ভারতীয় জাতিগঠনেচ্ছা ছিল না। সুতরাং নানক কবীর চৈতন্য প্রমুখ হয় নতুন ধর্ম প্রবর্তক অথবা সংস্কারকরূপে চিহ্নিত হলেন। বহু ধর্মের মধ্যে আরো ধর্ম কিছু যোগ হলো। আকবরের চেষ্টার পশ্চাতে অবশ্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নেচ্ছা ছিল; ছিল তৈমুরী বংশের শাসনকে দেশীয় শাসনরূপে ভারতীয়দের কাছে গ্রহণ করাবার বাসনা। কিন্তু যে-শাসন ব্যবস্থায় রাজা ব্যক্তিগতভাবে দেশের সমগ্র ভূভাগের মালিক এবং তাঁর খেয়ালখুশী দেশের আইন, সে শাসনব্যবস্থায় রাজার খেয়াল তাঁর জীবনকালাবধিই চলে। সুতরাং আকবরের দীনে এলাহি বা পরমেশ্বরের ধর্ম, অন্য কথায় খণ্ডছিন্ন ভারতবর্ষকে এক ধর্মরাজ্য পাশে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টাও পরবর্তী সম্রাটদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়।

রামমোহন একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেদিনে ভারতবর্ষের মানুষের সামাজিক কল্যাণ সাধনের সচেতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় জাতিগঠন চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্রাহ্মসভা প্রথমে ছিল একটি সাপ্তাহিক মিলন-কেন্দ্র—যাকে বলা যায় বৈঠক। পরে কিছু উৎসাহী যুবক যখন প্রস্তাব করলেন, সকল ধর্মাবলম্বীরই উপাসনাগৃহ আছে, সুতরাং আমাদেরও একটি চাই, তখন তিনি সপ্তাহে একদিন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব এবং নিরাকারত্ব উপলব্ধি করার জন্য একটি গৃহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি কোন নির্দিষ্ট উপাসনার ব্যবস্থা দেন নি। ব্রহ্মসংগীত এবং বক্তৃতা ব্যতীত ঐ গৃহে অন্য কোন অনুষ্ঠান পালিত হতো না। দ্বিতীয়ত, সমাজগৃহের দ্বার হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বীর জন্যে উন্মুক্ত ছিল। তৃতীয়ত তাঁর সময়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না—যার খুশী সমাজের সভ্য হতে পারতেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী করার প্রচেষ্টা এবং প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি তাঁর

প্রতিকুলতা হতেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজকে কখনও ধর্মসভা বা ধর্মে পরিণত করতে চান নি। তিনি ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষাদানের সুপারিশও করেন নি। অর্থাৎ তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মকে স্থান দিতে রাজী ছিলেন না। আহার বিহারের মধ্যেও তিনি বিধিবিধান প্রবর্তন করেন নি। তিনি নিজে আহার বিষয়ে বিধিবিধান মেনে চলতেন এরূপ প্রমাণও বোধ করি নেই বরং তাঁর সম্বন্ধে বিপরীত কথাই শুনতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহ'লে এদেশের মানুষকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি কেন মিশনরীদের সঙ্গে পলিমিক্সে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন? অথবা কেন ধর্মান্তর গ্রহণের বিরুদ্ধতা করেছিলেন? আমি আমার ক্ষুদ্র-জ্ঞানে মনে করি, তিনি ধর্ম পরিবর্তন এবং নতুন ধর্ম প্রবর্তন দু'টোকেই জাতিগঠনের পক্ষে সমান অন্তরায় জ্ঞান করতেন। কেননা ধর্মান্তরণ দ্বারা ধর্মান্ধতা দূর না হয়ে বরং বৃদ্ধিই পায়। তিনি বরং চেয়েছিলেন ঈশ্বরের নানা রূপ ও পরিচয় বিদূরিত করে তাঁকে সকল মানুষের ধ্যান বা উপলব্ধির বস্তুতে পরিণত করতে। শত উপচারে উপাসনায় সন্তুষ্ট করে ঈশ্বরের হাজার রকম মানুষের পরস্পর বিরুদ্ধে ইহলৌকিক স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক যন্ত্ররূপে দেখার রীতি হতে তাঁকে মুক্ত দিতে। সতীদাহ নিবারণ প্রচেষ্টার মধ্যেও তাঁর একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুকে প্রথাসিদ্ধ হিন্দুধর্ম হতে মুক্ত করার জন্যে একদিকে তিনি আকার পূজা এবং বর্ণাশ্রয়ী সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধতা করে তাদের প্রাচীন ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করছিলেন, অপরদিকে প্রথাসিদ্ধ ধর্ম-লোপ সাপেক্ষে তিনি সমাজদেহের কুসংস্কার যত-দূর সম্ভব বিদূরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি শুধু খ্রীস্টান মিশনারী-দের সঙ্গে নয়; হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গেও পলিমিক্সে লিপ্ত হয়েছিলেন। যার যেমন জ্ঞানবুদ্ধি তাঁর সঙ্গে তাঁর পর্যায়ে গিয়ে বিতর্ক করলেই ফল পাওয়া সম্ভব। রামমোহন বিদ্রোহী ছিলেন—যুগান্তকারী প্রতিভা মাত্রেই—এমন কি নতুন ধর্মপ্রবর্তনকারীও সমাজদ্রোহী বটেন কিন্তু তিনি আকাশচারী ছিলেন না। সে-যুগে যে পথে অগ্রসর হলে সাফল্য লাভ সম্ভাবনা অপেক্ষা-কৃত বেশী ছিল বলে তার কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল সে-পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। ধর্মনির্বিশেষে, ধর্মশাস্ত্রের নানা পরস্পর বিরুদ্ধ শত সহস্র শ্লোকের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করা পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। রামমোহন

এই চিরাচরিত প্রথার সনাতনী বিপক্ষ দলকে পরাস্ত করে সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার এবং ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক বৈরিতা ও বিভেদ হতে মুক্ত করে ভারতে হিন্দুজাতি নয়, একটি ভারতীয় জাতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং মনে হয়, সতীদাহ প্রথা নিবারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য হতে একটি অমানবিক আচরণ বিদূরণ কার্য শুধু নয়, এই কার্য রামমোহনের ভারতীয় জাতি নির্মাণ কার্য সম্পর্কিত নানাবিধ প্রচেষ্টার অন্যতম মাত্র, প্রধান নয়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম শাসনামলেও সতীদাহ প্রথা রদ করার কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু যতখানি বল প্রয়োগ করলে সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো ততখানি শক্তি প্রয়োগ করার সাহস মুসলিম শাসকগণ করেন নি; কেননা তাদের চেষ্টার পশ্চাতে সামাজিক সমর্থন ছিল না। রামমোহনের সময় সামাজিক সমর্থন অনেকটা তৈরী হয়েছিল। পুনরুক্তি হলেও, আবার বলতে চাই, ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা, সতীদাহ নিবারণ, মিশনারী ও পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে তাঁর পলিমিক্স, কলোনাইজেশন পক্ষপাতীত্ব প্রভৃতি রামমোহনের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ক্রিয়া করেছে ভারতবর্ষ হতে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয়চেতনা বিলোপ করে তৎস্থলে ইহলৌহকিক কল্যাণের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত সর্বভারতীয় স্বাদেশিকতাবোধ সৃষ্টির প্রেরণা।

কেশবচন্দ্র সমেত পরবর্তী ব্রাহ্মসমাজপতিগণ সকলেই রামমোহনের মূল লক্ষ্য হতে দূরে সরে যান। তারা ভারতে আরো একটি ধর্ম প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ তাঁরা ভারতবাসীর চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী রামমোহনকে অন্য কোন কবীর, নানক, চৈতন্যে পরিণত করেন, যেটা হতে তিনি আদৌ চান নি। [illegible] অর্থে তিনি কখনই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন না। রামমোহনের সাথে [illegible] তুলনা করা যায় উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক। পরস্পর বিরুদ্ধ বিভিন্ন ধর্মগুলোকে একটিমাত্র ধারায় প্রবাহিত করা এবং এর পরে কালক্রমে তাদের মন ও মানস থেকে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করে তাদেরকে শুধুমাত্র মানুষে অথবা ভারতীয় মানুষে পরিণত করা—এই ছিল আকবর এবং রামমোহনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। রামমোহনকে আধুনিক ভারতের নির্মাতা এ কারণেই বলা হয়, যদিও রামমোহন প্রদর্শিত পথে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে নি।

ইয়োরোপ আমেরিকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিশেষ করে ফরাসী বিপ্ল-

বের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি এবং তার উত্তরকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণায় পৌঁছা, রামমোহনের বিস্ময়কর প্রতিভার অন্য একটি নিদর্শন। ফরাসী বিপ্লব তাঁকে এতখানি প্রভাবিত করেছিল যে ইংলণ্ড-যাত্রার সময়ে পথে ফরাসী পতাকাবাহী একটি জাহাজ দেখে তিনি সেটাতে আরোহণ করেন এবং পরে ফরাসী দেশেও গমন করেন। স্মরণীয় যে ফরাসী বিপ্লবের ধ্বনি ছিল স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। ইংলণ্ডে লিবারেল পার্টির বিজয়েও তিনি আনন্দিত হন। পার্লামেণ্টারী কমিটির প্রশ্নমালার তিনি যে লিখিত উত্তর দেন সেটিতেও তার দূরদর্শিতা এবং তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। Exposition of the practical operation of the judicial and revenue systems of India শীর্ষক তাঁর এ-বিবৃতিতে তিনি প্রজার কর হ্রাস এবং জমিদারগণ কর্তৃক দেয় রাজস্ব লাঘব করার সুপারিশ করেন। এর ফলে হ্রাসজনিত রাজস্ব পূরণের জন্য তিনি প্রমোদ কর ধার্য এবং উচ্চ বেতনের ইংরেজ কর্মচারীর পরিবর্তে অল্প বেতনে দেশীয় লোক নিযুক্ত করতে বলেন। তিনি প্রজাকে ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রদান এবং ব্যয়বহুল স্থায়ী সৈন্যদলের পরিবর্তে প্রজাদের মধ্য হতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করে তদ্বারা দেশরক্ষার ব্যবস্থা করার উপদেশ দেন। শেখ সাদীর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন "প্রজাদের সাথে বন্ধুভাবে বাস কর, শত্রুদল হতে যুদ্ধের কোন ভয় থাকবে না। ন্যায়পরায়ণ রাজার পক্ষে প্রজাগণই তার সৈন্য।" এ থেকে রামমোহনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় সাধারণ লোকের বিচার বুদ্ধি ও দেশ প্রেমের উপর তাঁর আস্থার প্রমাণ।

মনে রাখা আবশ্যক রামমোহনের কাল ইয়োরোপে প্রকৃত জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার যুগ। নেপোলিয়ান ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে, শিল্পবিপ্লবের ঐতিহাসিক সামাজিক ভূমিকা সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক পালন করেন। সামন্ততন্ত্রের অবসানে ব্যক্তি স্বাধীনতাকেন্দ্রীক পুঁজিবাদী বিপ্লব এবং জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভবের ঐ যুগসন্ধিক্ষণে, সামন্ততন্ত্রের সন্তান এবং দিল্লীর পুতুল সম্রাট-প্রদত্ত রাজা খেতাব সানন্দে গ্রহণকারী রামমোহন রায় গণতান্ত্রিক জীবনবোধ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন একাত্মবোধ জ্ঞাপন করছিলেন। এটা যুগচেতনার পরিচয়ত বটেই। উপলব্ধ

তিনি এবং তাঁর বন্ধু এবং সঙ্গী দ্বারকানাথ ঠাকুর কেন যে এ-দেশে বৃটিশ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ জ্ঞান করতেন তারও প্রকৃত কারণ এতে খুঁজে পাওয়া যায়। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রামমোহন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে অগ্রগতির ভূমিকা ছিল তার অবসান হয়েছে, নতুন যুগ এসেছে, এবং সেটা হচ্ছে শিল্পবিপ্লবোত্তর ইয়োরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার যুগ। বৃটিশ শাসন একদিকে নিয়ে আসবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি, ইয়োরোপীয় পরিবহণ, উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা অন্যদিকে নিয়ে আসবে ইয়োরোপীয় চিন্তাবোধ, যার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে ভারতেও সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হবে। এ-উপলব্ধির ফলেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ভারতের মানুষ একদিন না একদিন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করবে এবং ভারতবর্ষ জাতিভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। তিনি নাকি বলেছিলেন, ভারত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে স্বাধীন হবে। সেটা পূরণ হয় নি। তার মৃত্যুর এক শত চৌদ্দ বৎসর পরে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারত স্বাধীন হয়।

রামমোহনের অন্য দু'টি উল্লেখযোগ্য কাজ বিভিন্ন ভাষায় সংবাদ পত্র পরিচালনা এবং বাংলা গদ্যে পুস্তক পুস্তিকা রচনা। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে কখনও কুণ্ঠিত হন নি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। কোম্পানী সরকার সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে তার প্রতিবাদে তিনি তৎপ্রকাশিত সংবাদপত্র বন্ধ করে দেন।

আধুনিক বাংলা গদ্যের জনকরূপেও তাঁকে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর পূর্বে এবং তাঁর কালে অন্যেরাও কিছু কিছু বাংলা গদ্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গদ্য বৈশিষ্ট্যসুষমায় আলাদা মর্যাদার অধিকারী। তিনি বাংলা গদ্য রচনা করেছিলেন দেশের মানুষের নানা কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতা দূর করার উদ্দেশ্যে। অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও অলঙ্কারবর্জিত তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুক্তিপূর্ণ ও বোধগম্য গদ্য। নমুনা :—

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত

বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীস্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন।"

পরিতাপের বিষয় রামমোহনের উত্তরাধিকার ভারত রক্ষা করতে পারে নি। সম্রাট আকবর যেমন পরবর্তী পরিমিষ্যকারিতা, ধর্মান্ধতা, জ্ঞান-বিমুখতা ও মুর্খতার নিকট পরাজিত হয়েছিলেন রামমোহনও তেমনি পরাজিত হন। কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্ববর্তী অরাজকতা থেকে একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় উত্তরণজ্ঞানে তিনি সেটা সমর্থন করেছিলেন। তবে সেই সঙ্গে প্রজার বোঝা লাঘবের দাবীও জানিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় কর্ণওয়ালিশ সৃষ্ট সেই জমিদার তালুকদারগণই শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতে ধর্মান্ধতা, বর্ণ-বৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ অব্যাহত রাখে। তারা নির্মীয়মান মধ্য-বিত্ত সমাজের মন ও মানসকে কলুষিত ও অন্ধ করে। কলুষিত, একদেশদর্শী, অন্ধ এবং সাম্প্রদায়িক মন নিয়ে সাহিত্য অঙ্গনায় অবতীর্ণ হলো মধ্যবিত্ত সমাজ হতে উদ্ভূত কিছু সংখ্যক প্রতিভাবান সাহিত্য-কর্মী। রামমোহনের মৃত্যুর পরে উভয়ে মিলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করলো দেশকে। বৃটিশ শাসনের স্তম্ভরূপেও কাজ করলো তাঁরা বহুকাল। সাহিত্য ও কাব্য প্রবাহিত হলো আক্রমনাত্মক ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধারায়। রাজনীতি এবং সাহিত্য উভয়ক্ষেত্রেই রামমোহন পরাজিত হলেন। ভারত বিভক্ত হলো। রামমোহনের আত্মার পরাজয় ভারত বিভক্ত হওয়ার কারণ। আবার রামমোহনের আত্মার জয় স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবের মূলে। রামমোহনের আত্মা ভবিষ্যতে আরো বৃহত্তর জয়লাভ করুক, আজ তাঁর দ্বিশতবার্ষিক জন্মোৎসবে এই হোক আমাদের কাম্য ও লক্ষ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Dr. Tarachand, History of the Freedom movement in India (Publication Divn, Govt of India)

২। R. C Majumder, H C. Roy Chowdhury, Kalikinkar Dutt, Advanced History of India

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ

৪। মনি বাগচি : রামমোহন

৫। নরহরি কবিরাজ : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা

৬। গোপাল হালদার : সংস্কৃতির রূপান্তর

৭। সৌমেন ঠাকুর : ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন (১৩৬৫-৬৬ সালে চতুরঙ্গে প্রকাশিত প্রবন্ধ)

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১ম খণ্ড। রামমোহন শীর্ষক রচনা।

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চারিত্র পূজা (রামমোহন রায নিবন্ধ

১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত আনন্দমঠ

১১। স্যার যদুনাথ সরকার : ঐ আনন্দমঠের ভূমিকা

[বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা]

শ্রাবণ-পৌষ—১৩৭৯।

বাঙ্গালী জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ছাব্বিশে মার্চ ১৯৭১ সালে। ২৬শে মার্চ ১৯৭৫ সাল। পঞ্জিকার হিসেবে চার বৎসর। ব্যক্তি মানুষের জীবনে বেশ দীর্ঘ সময়, কিন্তু সমষ্টিকে নিয়ে যে জাতি তার জীবনে পলক মাত্র। কেননা জাতি বিভাজ্য সত্তা নয়, ব্যক্তির আয়ু তার পরিমাপকও নয়। জাতি জীবনের সাথে তুল্য। জীবন কখনও নিঃশেষ হয় না—পরম্পরাক্রমে বেঁচে থাকে। জাতিও তেমনি পরম্পরাক্রমে স্থায়ী সত্তা। পৃথিবী যতটা স্থায়ী প্রাণ ও প্রাণীজগৎও হয়ত ঠিক ততটাই স্থায়ী। জাতি মহান প্রাণী জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাণ ও প্রাণী জগৎ বিবর্তনশীল। সুতরাং জাতির জীবনেও বিবর্তন হয়, কিন্তু অতি সহসা আচম্বিতে হয় না—দীর্ঘ সময় লাগে। সুতরাং মাত্র চার বৎসর কাল জাতীয় জীবনের লাভ লোকশান হিসেব করার জন্যে যথেষ্ট নয়। তবু বলবো এই অল্প সময়ের মধ্যেও আমাদের কৃতিত্বের পরিমাণ তুচ্ছ নয়। বরং কথাটাকে ঘুরিয়ে বলাই সঙ্গত: আমরা আশ্চর্য রকমের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছি, আমরা মানব জাতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোগ করেছি।

কিন্তু মাত্র চার বৎসর আগে আজকের তারিখে সহসা অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটেছিল বললে ভুল হবে। বাঙ্গালী জাতি ইতিহাসের পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ বহু আগেই যোগ করতে শুরু করেছিল। বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের অংশ ছিল বটে কিন্তু বাঙ্গালীত্ব কখনও ভারতীয়ত্বের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়নি। বাঙ্গালী বারবার বিদ্রোহ করেছে। বারো ভুঁইয়ারা বাংলা শাসন করেছে। ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফরাজী বিদ্রোহ, তীতু মীরের বিদ্রোহ, চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রভৃতি বহু রকমের অসংখ্য বিদ্রোহ বাঙ্গালী করেছে এবং বাঙ্গালীর নেতৃত্বে বাঙ্গালীরূপেই করেছে। বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিদ্রোহ করেছে। রাজা রাম মোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী

নজরুল ইসলাম প্রমুখ প্রতিভাধর ব্যক্তি সামাজিক কুসংস্কার এবং প্রাচীন ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। কে বলে বাঙ্গালীর ঐতিহ্য নেই। বাঙ্গালী সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী। মহৎ এবং অর্থবহ জীবনের জয়গান গাওয়া বাঙ্গালীর চিরন্তন স্বভাব। বাঙ্গালীর সে-সব টুকরো টুকরো কৃতিত্ব একটি মহান ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্যে ক্রমে ক্রমে সমগ্রতার রূপ পরিগ্রহ করছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সে সমগ্রতা একটি বিস্ময়কর বিপ্লবরূপে প্রকাশ পায়। বিস্ময়কর ঘটনা তার কিছু কাল আগে থেকেই ঘটছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-বিদ্রোহ, বাস্টিলের দুর্গ ভেঙ্গে বন্দী মুক্ত করার ন্যায়, বিচারপতির আখড়া পুড়িয়ে কুর্মিটোলার সেনা শিবিরকে পরাস্ত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে আনা প্রভৃতি ঘটনাও কম বিস্ময়কর ছিল না। এবং আজ একথা স্বীকার করা সম্ভবতঃ উচিত যে, ১৯৬৯ সালেই হয়ত অধিকতর বিস্ময়কর ঘটনা ঘটানো যেতো। কিন্তু সেকথা যাক—জাতীয় জীবনে বহু ভুল ত্রুটি হয়। ১৯৩৭ সালে আমরা ভুল করেছিলাম, বস্তুতঃ পক্ষে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি আমরা ক্রমাগত ভুলের ইতিহাস রচনা করেছি, ১৯৬৯ সালেও পাকিস্তানী কুট-কৌশলীগণ সময় নেয়ার জন্যে আমাদিগকে ছলনায় ভুলিয়েছিল। আজ সে-সব প্রসঙ্গ উত্থাপন অবান্তর। আমরা ভুলের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম সে অভিজ্ঞতাই ভুল সংশোধন করতেও প্রেরণা যুগিয়েছে আমাদেরকে।

আজকের দিনে বহু কথা মনে পড়ে। শুধু আমার নয় সবারই কম-বেশী মনে পড়বে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের স্মৃতি কখনও বিলীন হওয়ার নয়। মনে পড়ে ঐতিহাসিক প্যারালাল গবর্নমেন্টের কথা। আওয়ামী লীগ পার্টির তরফ হতে একের পর এক নির্দেশের বিধি-বিধান জারি হচ্ছিল। বাংলার প্রত্যেকটি মানুষ সে নির্দেশগুলোকে সরকারী নির্দেশ-রূপে মেনে নিচ্ছিল ঃ পাকিস্তানী শাসকদের ভীতি এমন কি গোলাগুলীও তাদের টলাতে পারেনি। পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র বাঙ্গালী জাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি অহিংস উপায়ে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে শুধু সম্পূর্ণরূপে বিকল নয় উপরন্তু তার স্থান নেয়ার জন্যে স্বেচ্ছামূলক বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেনি। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য ছিল আংশিক।

তা'ছাড়া সে আন্দোলনের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। শেখ মুজিবুর রহমান পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণরূপে সফল। যুগপৎ নেগেটিভ এবং পজিটিভ ভূমিকা ছিল শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের।

কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ে পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ রাত্রির কথা। কোন সচেতন বাঙ্গালী বোধ করি সে কথা কখনও ভুলবে না। বহু পরিচিত লোককে ইহজীবনে আর কখনো দেখবে না। বাংলাদেশে বোধ করি এমন পরিবার নেই যার নিকট বা দূরাত্মীয় ২৫শে মার্চ হতে যে যুদ্ধের শুরু এবং ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত জয়ের মধ্য দিয়ে যার শেষ সে যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেনি। সুতরাং পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াবহ রাত্রি আজকের দিনে অবশ্যই স্মরণ করবো। তিরিশ লক্ষ নর-নারীর আত্মাহুতি দানের সূচনা সে রাত্রিতে।

কিন্তু আজ সে কথা নয়। স্মৃতির দাহ আছে। কিন্তু স্মৃতি মন্থন করবো না আজ। আজ দেখবো আমরা কি পেয়েছি, কি এখনও পাইনি এবং আরো যা পেতে হবে তা কেমন করে কি পন্থায় পাবো। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি। এ পাওয়া যেমন তেমন পাওয়া নয়। আগেও নানা উপলক্ষে নানা স্থানে বলেছি এবং আরো অনেকেই হয়ত বলেছেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম বাঙ্গালী আলাদা জাতি সত্তারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বাঙ্গালী গঠন করেছে তার নিজস্ব স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাইরের কোন শক্তি এখন আর তাকে নির্দেশ দিতে পারে না। এখন বাঙ্গালী নিজেই নিজের পরিচালক। এ কৃতিত্ব যেমন তেমন কৃতিত্ব নয়। আজ অনুসন্ধান করে দেখার দিন, বাঙ্গালীর কোন্ গুণ তাকে এ কৃতিত্ব অর্জনে সহায়তা করেছে, বাঙ্গালী চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্য তাকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছে। এ অনুসন্ধান আবশ্যক, কেননা ক্ষাত্র শক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে সাফল্য লাভ করে সে বৈশিষ্ট্যই হয়ত তাকে পরবর্তী লক্ষ্যস্থলের দিকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাঙ্গালী কোমল প্রাণ দয়ার্দ্রচিত্ত জাতিরূপে পরিচিত। চির হরিতে সুশোভিত অসংখ্য নদ নদী বিধৌত তার বাসভূমি শান্তি ও কোমলতার অনুকূল। কিন্তু বৈশাখে আশ্বিনে যখন প্রবল ঝড় বয়, বর্ষায় পদ্মা-

মেঘনা যমুনা যখন সতত: গর্জে—প্লাবিত হয় প্রায় সমগ্র বঙ্গভূমি তখন বাঙ্গালী রুদ্র প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। সুতরাং শান্তি ও সংগ্রাম তার পরিবেশজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতিকে পরাজিত করেই বাঙ্গালী বেঁচে আছে। তার ভাটিয়ালী যেমন সত্য তেমনি কবিগানও তার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। গীতাঞ্জলির কবিও বাঙ্গালী আবার বিদ্রোহী কবিও বাঙ্গালী। কোমলতা এবং কাঠিন্য, ভাবাবেগ এবং দৃঢ় সংকল্পে অবিচলতা বাঙ্গালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিছু দৃষ্টান্ত দিলে বাঙ্গালী চরিত্রের পরস্পর-বিরুদ্ধ বিভিন্ন চারিত্রিক গুণ উপলব্ধি করা সহজ হবে।

প্রথমতঃ বাঙ্গালী লজিকের চেয়ে অধিক পরিচালিত ভাবাবেগ দ্বারা। লজিক দ্বারা পরিচালিত হলে বাঙ্গালী কখনও প্রায় দেড় হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দু'টি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড নিয়ে একটি রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্তান তৈরীর কার্যে সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করতো না। ধর্মীয় ঐক্যবোধ এবং জাতীয় ঐক্যবোধ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্ব এবং ধর্ম যে জাতি গঠনের আদৌ কোন উপাদান নয় তার দৃষ্টান্ত রূপে আরব জগৎ এবং খ্রীস্টান জগৎ বাঙ্গালীর চোখের সম্মুখে বিরাজ করছিল—এখনও বিরাজ করছে। তথাপি জিন্নাহ-লিয়াকত আলী প্রমুখের প্ররোচনায় তারা ভাবাবেগে মেতেছিল। বলা বাহুল্য, জিন্নাহ-লিয়াকত আলী প্রমুখ বাংলাদেশকে পাকিস্তানের কলোনি করার গোপন উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালীকে ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের সম্মতি না নিয়ে করাচীতে রাজধানী তৈরী করার পর তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রের কাছেই সুস্পষ্ট হয়েছিল। কিছু বাঙ্গালী এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী সমাজ তখনও বুঝতে পারেনি। পারলে তখন বাংলাদেশের পক্ষে আলাদা হয়ে যাওয়া আদৌ কঠিন হতো না। অতি সামান্য সৈন্য সামন্ত ছিল তখন বাংলাদেশে। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতার আর একটি প্রমাণ তাঁরা ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফজলুল হক সাহেবকেও বর্জন করে। অথচ ফজলুল হককে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না। মধ্যবিত্ত সমাজই ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগেছিল। পাকিস্তান যে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর দাসত্ব শৃঙ্খল তা বাঙ্গালী পরবর্তীকালে অবশ্য

বুঝেছিল এবং বুঝেছিল বলেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে কৃত আগের ভুলের মাশুলরূপে ত্রিশ লক্ষ লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে।

বাঙ্গালী চরিত্রের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য, তারা যখন কোন ব্যাপারে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাতে অটল থাকে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ তারা করেই। কোন বাধা তাদিগকে দমাতে পারে না। যৌথ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার সময় ব্যক্তিগত পর্যায়ের মতদ্বৈধতা এবং বিরোধ কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তারা বিরোধ রাখেই না। ১৯৪৬/১৯৫৪/১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন তার প্রমাণ। বাঙ্গালী পার্লামেন্টারী বিরোধী দল রাখে না, অর্থাৎ জাতীয় সমস্যা নির্ণয় ও তা সমাধানের ব্যাপারে একই দেশের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মতের বিদ্যমানতা বাঙ্গালী মানতে রাজী নয়। পাশ্চাত্য পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র বিষয়ে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ পড়াশোনা করেছে এবং ইংরেজ আমলে কিছু কিছু ট্রেনিংও নিয়েছে বটে কিন্তু পাশ্চাত্য পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের স্পিরিট না করেছে তারা উপলব্ধি না করেছে গ্রহণ। বল বাহুল্য এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য না থাকলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারতো না। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল যদি সামান্য ব্যতিক্রম হতো অর্থাৎ পার্লামেন্টে যদি জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি বিরোধী দলের অল্প সংখ্যক লোকও নির্বাচিত হতো তা'হলে আমরা প্রবল রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বাধার সম্মুখীন হতাম: স্বাধীনতা বিলম্বিত হতে পারতো। এসব দৃষ্টান্ত একটি মাত্র সিদ্ধান্তের দিকেই নিয়ে যায়: বাঙ্গালীর মন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার সিদ্ধান্তে সন্দেহ ও ইতঃস্ততার ভাব থাকে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী 'ব্লিজক্রিগ'—ত্বরিত আঘাত করার নীতি অনুযায়ী সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। রিজার্ভ ফোর্স রাখতে তারা অভ্যস্ত নয়।

বাঙ্গালী চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য জাতীয় লক্ষ্য পূরণের জন্যে বিরাট মূলধন রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। ভাবাবেগী বাঙ্গালীর মধ্যে মটিভেশন প্রবর্তনা সৃষ্টি করা সহজ। মটিভেশন সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে নিয়োগ করতে পারলে তাদের দ্বারা যে কোন দুঃসাধ্য কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব। বাঙ্গালী কখনও পরাজয়

মানতে রাজী নয়। কিন্তু এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্য একটি দিকও আছে। ভাবাবেগ কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভাবাবেগী মানুষের ধৈর্যশক্তি স্বভাবতঃই কম। তারা যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রস্তুত তেমনি ফলাফলও পেতে চায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। ফলাফল পেতে বিলম্ব হলে তারা হতাশ হয়ে হাত পা বুকে নিয়ে বসে থাকে না। প্রথমে তারা নেতিবাচক সমালোচনায় লিপ্ত হয়। পরে তারা মতামত পাল্টায়। গ্রহণ করতেও যেমন দেরী হয় না তেমনি বর্জন করতেও দেরী হয় না।

আজকের দিনে বাঙ্গালীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা করা উচিত। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা জটিল। অগণিত মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে কালাতিপাত করছে। অপর দিকে এক শ্রেণীর মানুষ জনগণের নিরক্ষরতা, দারিদ্র এবং অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ঐশ্বর্যের পাহাড় সৃষ্টি করছে। তারাই আবার জনগণের নসীহতও করছে। অর্থাৎ তাদের কথা ও কার্যের সঙ্গতি নেই। জনগণের চোখে তারা ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে। চিহ্নিতও হয়ে গেছে কারা জনগণকে প্রবঞ্চনা করছে। সুতরাং নেতৃত্বকে অনতিবিলম্বে সজাগ হতে হবে। জনগণকে প্রবঞ্চনা করে যারা সমাজপতি হওয়ার চেষ্টায় রত তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সকল প্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে নেতৃত্বকে। তা'হলে সর্বপ্রকার জাতীয় সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় শক্তি প্রয়োগ করা আদৌ কঠিন হবে না। নিজে পরিচ্ছন্ন হয়েই শুধু অপরের মনে পরিচ্ছন্ন হওয়ার মটিভেশন সৃষ্টি করা যায়।

(পূর্বদেশ—২৬ ৩ ৭৫)

যুবসমাজ, জাতি এবং জাতীয়তা

বয়স যত বৃদ্ধি পায় মানুষের দিগন্ত তত সঙ্কুচিত হতে থাকে। অবশেষে এমন একটা সময় আসে যখন সমুখে অন্তিম পরিণতির সাদা পাখা ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। এ বিষয়টি স্মরণ রাখলে প্রবীণ ব্যক্তির আচরণ বিচার-বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তি বারবার পশ্চাৎ ফিরে তাকায়। অতীতের কাঠামোতে ফেলতে চায় সমকালীন সমাজ জীবনকে। তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে চায় সেখানে। কিন্তু অতীত যেমন কখনও ফিরে আসে না তেমনি অতীত অভিজ্ঞতাকেও হুবহু প্রয়োগ করা যায় না। এ-জন্যেই বলা হয় ইতিহাসের হুবহু পুনরাবৃত্তি কখনও ঘটে না। প্রবীণকে উপেক্ষা করা বা স্বাগতম জ্ঞাপনের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আপন অস্তিত্বের সাথে সমকালীন দাবী-দাওয়ার সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম প্রবীণই শুধু যুব সমাজের স্বীকৃতি পান। অন্য কথায় সমকালে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ বারবার নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করা যেতে পারে। বারবার নিজেকে অতিক্রম করতে পারার অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারার দরুণই তিনি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কবিরূপে বেঁচেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যতিক্রম। সাধারণ প্রবীণ তা পারেন না। তাঁরা বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ইত্যাদির মুখোশ পরে সমকালীন সমস্যা পাশ কাটিয়ে যেতে চান অথবা বিলম্বিত করতে চান ইতিহাসের গতিকে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়ে তাঁরা প্রথমে ধিকৃত এবং পরে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হন।

যৌবনের ধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাঙেও সে গড়েও সে। তরুণ চিন্তা-ভাবনা করে না এমন নয়, কিন্তু যেখানে সে স্রষ্টা সেখানে অগ্রপশ্চাৎ ভাবনার সুযোগ কম। মানুষ অগ্রপশ্চাৎ ভেবে জৈবধর্ম পালন করে না। জৈবধর্ম পালন করা তার জন্মগত স্বভাব—অভ্যাস নয়। বংশবৃদ্ধি সহ সর্ব প্রকার

সৃষ্টির উৎসমূলে রয়েছে জৈব আবেগ। আবেগের বশবর্তী হয়েই সে নতুন কাজ করে। ভাঙ্গাও তার কাছে নতুন কাজ, কেননা গড়ার জন্মেই সে ভাঙ্গে। ভাবাবেগে সে সৃষ্টি করে যায়। পরে আসে যুক্তিতর্ক বিচার-বিবেচনা। বিচার শক্তিরও উৎস ভাবাবেগ কিনা তৎসম্বন্ধে বোধ করি এখন পর্যন্ত দার্শনিকগণ স্থির রায় দেন নি। কাজ সম্পাদন করার পর তার পক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ধর্মীয় এবং জাগতিক নীতিমালার মূলে রয়েছে বাস্তব জীবন, অর্থাৎ সম্পাদিত কার্যাবলী। আগে কর্ম নিষ্পন্ন হয় পরে তার পক্ষে যুক্তি উত্থাপিত হয়—এই হচ্ছে জগৎ। যুব-সমাজ কাজ সম্পাদন করে। মানুষের ইতিহাস তার কাজের বিবরণ। কাজে সফল হলে তার বিবরণ গৌরবগাথারূপে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে গীত হয়। নীতিমালার উৎপত্তি সেখান থেকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র গীতারও জন্মক্ষেত্র।

বাংলাদেশের যুবশক্তিকে ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিশ্ব যুবশক্তির অংশরূপেই বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশের যুবশক্তিও গৌরবজনক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যুব-সমাজ বাংলা দেশের বুক হতে হাজার হাজার বছরের পরাধীনতার জগদ্দল পাথর অপসারণ করেছে। তারা প্রমাণ করেছে জাতি গঠনে ধর্মের কোন স্থান নেই। তারা বৈদেশিক শাসক-শোষকের শক্তিশালী দুর্গ ধ্বংস করেছে। কিন্তু দুর্গ ধ্বংস হলেও তার ভগ্নস্তূপ রয়ে গেছে। প্রাচীন মূল্যবোধ এবং বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা অবহমান কাল ধরে বিদেশী শাসনের ভিত্তিরূপে কাজ করেছে। আকস্মিক ঝড় উপর থেকে ছাদ উড়িয়ে নিয়ে গেছে বটে কিন্তু ভিতটা রয়ে গেছে। ভগ্নস্তূপে ভিতটা চাপা পড়ে আছে। সেই ভিতও উপড়ে ফেলতে হবে এবং ধ্বংস-স্তূপের সাথে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হবে।

ইতিহাসের জন্মকাল হতে পরাধীন একটি দেশের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন বিশেষ করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন সাধারণ ঘটনা নয়—ওটা প্রকৃত অর্থেই বিপ্লব ঃ এ বিপ্লব শুধু বাইরের বিপ্লব নয়—মন ও মানসেরও বিপ্লব। পাকিস্তানী বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে ঃ হরণ করেছে নারীর ইজ্জত এবং লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেছে অগাধ সম্পত্তি। মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সেনানীরূপে বাংলাদেশের যুব সমাজ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরূপে পরিচিত পাকি-

স্তানী সেনা বাহিনীর ঐ পৈশাচিক বর্বরতা এবং জংগলী পশুর চেয়ে হীন আচরণ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করেছে। পাকিস্তানী বাহিনী এ দেশের উপর সুদীর্ঘ নয় মাস ধরে যে নির্যাতন, নরহত্যা, লুণ্ঠন এবং পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে তা চেংগিস-আটিলার আচরণকে ম্লান করে দেয়। পাকিস্তান বাহিনী ইসলামের নামে ইসলাম ধর্ম রক্ষার জন্যেই না কি বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে জেহাদে নেমেছিল। বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী ধর্মভীরু মুসলমান হয়েও ইসলামী ভাইদের অনৈসলামিক বর্বরতার শিকার হয়েছে। তরুণ সমাজ সেই বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, যুদ্ধ করেছে এবং পরিণামে জয়ী হয়েছে। এই ভয়ানক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় তারা মুখ ও মুখোশ এবং আসল ও মেকির পার্থক্য নির্ধারণ করতে শিখেছে। তার পরেও সুপ্রাচীন মূল্যবোধ এবং সুদীর্ঘকাল ধরে পালিত নীতিমালার উপর আস্থা অব্যাহত রাখা যুব সমাজের পক্ষে অসম্ভব। পাকিস্তানী বাহিনী শুধু তার একদার ভ্রাতৃকুলগৌরব বাঙ্গালী মুসলমান হত্যা করেনি, সেই সঙ্গে তারা সুদীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গালী সমাজ কর্তৃক সম্মানিত এবং পালিত মূল্যবোধ এবং নীতিমালার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। যুবসমাজের সহসা জাগ্রত হওয়ার কারণও এই। এক প্রচণ্ড আবেগে তারা রণে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং শুধু বাংলাদেশকেই মুক্ত করলো না, নিজেরাও বহু কালের কুসংস্কার এবং অন্ধ ধ্যান-ধারণার শৃঙ্খল ভাংলো। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের বিশেষ তাৎপর্য এই যে, অপসারিত শাসন প্রণালীর ভিত্তিস্বরূপ কাজ করে যে সামাজিক ধ্যান-ধারণাও মূল্যবোধ তারও অবসান অনিবার্য হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু অনিবার্য হলেও তা অনায়াসে বা অবিলম্বেই ঘটে না। এমন কি সশস্ত্র সংগ্রামে শরিক যোদ্ধার চক্ষুও উন্মিলিত হয় ক্রমে ক্রমে। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় তার চেতনা ও কর্তব্য বোধ। কিন্তু দুর্ভোগ শুরু হয় তখনই যখন প্রবীণেরা পুরাতন ধ্যান-ধারণা এবং নীতিমালা আঁকড়ে ধরে থাকেন। অবশ্য তা ছাড়া তাদের গতিইবা কি? পুরাতন ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস ইত্যাদির কল্যাণেই তাঁরা সমাজ-পতি। হয়ত তাঁরা ধরে নিয়েছেন, জাতীয় স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরই স্বাধীনতা। বিদেশী শাসক-শোষকের স্থলবর্তী হয়েছেন তাঁরা। তাঁরা মনে করেন, বিদেশী শাসনের অবসান মানে ক্ষমতার হাত বদল মাত্র।

বিতাড়িতদের স্থানে আসীন তাঁরা এবং যদৃচ্ছা শাসন করতে পারেন দেশ, যত খুশী টাকাকড়ি ধন দৌলত কামাই করতে পারেন এবং যেমন খুশী বিচরণ করতে পারেন সমাজে। কিন্তু বাংলাদেশের যুব সমাজ রাজনৈতিক স্বাধীনতার এরূপ কদর্থে বিশ্বাসী বলে মনে হয় না। তারা আশা করেছিল, স্বাধীনতা সামাজিক রাজনৈতিক বিপ্লবও বটে—আড়ে এবং খাড়ায় উভয় ভাবেই এমন এক বিপ্লব যা মানুষের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে বিষয় সম্পত্তির সম্পর্ক নতুন করে নিরূপণ করবে। তা'ছাড়াও সামাজিক আচার-আচরণ এবং আস্থা ইত্যাদিরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবে।

বাংলাদেশের বর্তমান সঙ্কট এখানে। স্বাধীনতার যুদ্ধ চলাকালে যুব-সমাজ যে আশা পোষণ করছিল তার সাথে বর্তমান বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য নেই। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামকালীন ভাবাবেগের অবসান হয়েছে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদে তারা প্রাণ দিতে এগিয়ে গিয়েছিল, প্রাণ দিয়েছিলও। সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন ছিল তেমনি মহৎ কিন্তু নতুন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নতুন ভাবাবেগের। প্রবীণেরা স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ভাবাবেগ। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী কালের বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে যে স্থায়ী ভাবাবেগ সঞ্চার করা আবশ্যক ছিল সেটা তৈরী করতে পারেন নি। এ ব্যাপারে তাঁরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রবীণ নেতৃত্ব এখন পর্যন্ত পুরাতন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর বসে অন্ধকারে দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। তাদের কাছে এখনও পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার অনেক কিছু অত্যন্ত মূল্যবান এবং পবিত্র। তারা সেগুলো বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা করছেন।

সুবিখ্যাত ফরাসী লেখক আদ্রে ম্যালরু তাঁর আত্মজীবনীর এক স্থানে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট দ্যগলের সাথে তাঁর কথোপকথনের বিবরণ দিয়েছেন। দ্যগলে নাকি তাঁকে বলেছিলেন, জাতীয়তা বোধ এবং জাতি এক কথা নয়, দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। দ্যগলের এই উক্তিটির ব্যাখ্যা ম্যালরু প্রদত্ত বিবরণে নেই। আমার মনে হয় দ্যগলে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, জাতীয়তাবোধ একটি নেতিবাচক (negative) ভাবাবেগ মাত্র। বহিরাক্রমণের

সময় বিশেষ করে এ ভাবের সক্রিয় এবং সবল বিকিরণ দেখা যায়। পক্ষান্তরে জাতি বলতে বোঝায় বিশেষ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর এমন একটি ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব যার মূল লক্ষ্য এবং আদর্শ এক ও অভিন্ন। জাতির একাংশের সাথে অপরাংশের সম্পর্ক কখনও দুই মেরুর দূরত্বের সম্পর্ক হতে পারে না। অসংখ্য লোক নিয়ে গঠিত হলেও জাতি একটি যৌথ একক—বলা যায় যৌথ দায়িত্ব এবং কর্তব্যে বিশ্বাসী একটি সমবায় সমিতি। জাতি এমন একটি অস্তিত্ব যার যে কোন একটি মানুষ দেখলেই সম্পূর্ণ জাতিকে চেনা ও জানা যায়। জাতীয় পর্যায়ে কৃত্য অথবা সম্পাদিত সমস্ত কার্যাবলীর প্রশংসা ও নিন্দা যৌথভাবে জাতির প্রাপ্য। সুতরাং জাতীয় পর্যায়ে কৃত্য কার্যাবলীর পশ্চাতে বিশেষ লক্ষ্য এবং আদর্শ থাকতেই হবে। এ জন্যে চাই আগাম সংকল্প ও পরিকল্পনা। যৌথ লক্ষ্য ও আদর্শ মাত্রেকেই ব্যক্তিগত অভিপ্সা, অভিলাষ প্রভৃতির ঊর্ধ্বে থাকতে হবে ঃ জাতীয় লক্ষ্য এবং আদর্শ একই সমতল থেকে উত্থিত হবে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রকৃত জাতি গঠিত হওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছিল। সবাই আশা করেছিল অতঃপর যে কোন একজন বাঙ্গালীকে দেখলেই তার জাতীয় পরিচয় জানা যাবে। কিন্তু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হয়নি এবং এখনও করা হচ্ছে না। প্রবীণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের চেহারা অনেকখানি বদলেছে সন্দেহ নেই। বিভাগ পূর্ব ভারতে তারা ছিলেন অত্যন্ত সোচ্চার এবং সক্রিয় মুসলিম লীগার। তারা মুসলিম লীগের বামপন্থী বলে পরিচয় দিতেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলেন উগ্র ডানপন্থী। তথাকথিত ডানপন্থীদের পক্ষে ভারত ভাগ করা কখনও সম্ভব হতো না। সেই উগ্র মুসলিম লীগার থেকে সম্প্রসারিত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলে উত্তরণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক পরিবর্তন। বলা বাহুল্য তারাই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বও প্রদান করেন। তা সত্ত্বেও তারা স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে না ছিলেন আগাম সচেতন, না ছিলেন তা গ্রহণের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। স্বাধীনতা পূর্বকালীন নানা অনাচার অব্যাহত থাকলো। সামাজিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি আগের চেয়ে বরং বৃদ্ধি পেলো।

উল্লেখ্য যে এ-নেতৃত্ব পাকিস্তানী আমলে কিছুকাল ক্ষমতাসীন ছিল।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তৎকালীন চারিত্রিক দুর্বলতা পরিত্যাগ করা সম্ভব হলো না। বাংলাদেশ কখনও সার্বভৌম স্বাধীনতা ভোগ করেনি। স্বাধীনতার দায়িত্ব এবং স্বাধীন নেতৃত্বের কর্তব্য সম্বন্ধে তারা অবহিত ছিলেন না। সুতরাং অনভিজ্ঞ নেতৃত্বের পক্ষে ভুল ত্রুটি করা স্বাভাবিক কিন্তু নানা জটিল সমস্যা সমাধানের উপযোগী সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী প্রণয়নে অপারগতা কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় বস্তু নয়। নব গঠিত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষাত্রবল প্রকৃত বল নয়। তার প্রকৃত বল জাতির যৌথ কর্তব্যবোধ এবং আদর্শগত ঐক্য। সে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে দেশের যুব সমাজ। কিন্তু তারা সে ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়নি। যুব সমাজের প্রতিভাকে কেমন করে কাজে লাগাতে হয় নেতৃত্ব তা বিষয়ে ছিলেন অজ্ঞ। এ ব্যর্থতাও হয়ত উপেক্ষা করা যেতো। কিন্তু ব্যর্থতা ঢাকা দেবার জন্যেই কিনা জানি না, তারা ক্ষমতার রাজনীতির পুরাতন খেলায় অবতীর্ণ হলেন। নিন্দনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো। বিভাগ করা হলো যুব শক্তিকে। তার ফলে যুব সমাজে নৈরাশ্য দেখা দিল। তারা হলো বিভ্রান্ত এবং ভ্রান্ত পথে পরিচালিত। ক্ষমতার জন্যে রাজনীতি করা হয়। এটা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। কিন্তু স্বাধীন দেশের ক্ষমতার রাজনীতির চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। এ বোধ থাকা উচিৎ ছিল।

যুদ্ধের পূর্বেও যুব সমাজ নানা দল উপদলে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধ চলা-কালে একটি ঐক্যবদ্ধ কমন ফ্রন্ট গঠিত হলেও কিছু অংশ বাইরে থেকেই যায়। যুদ্ধ চলাকালেও বিপ্লবীরূপে পরিচিত একটি ক্ষুদ্র দল অখণ্ড পাকিস্তানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা অধিক উজ্জ্বল জ্ঞান করতো। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে না কি তারা পাকিস্তানী শাসকদের সাথে সহযোগিতা করার নীতিও গ্রহণ করেছিল। অপর একটি দল একই সংগে মুক্তি বাহিনী এবং পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অপর দিকে মওদুদীর জমাতে ইসলামীর গোঁড়া এবং নিয়মিত বেতনভুক সদস্য সংখ্যা নাকি ছিল দেড় লক্ষ। জমাতে ইস-লামীর সকল সদস্য মাদ্রাসার মৌলভি এবং ছাত্র ছিল না। কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপকও তাদের মধ্যে ছিল। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে

আশশামস এবং আলবদর বাহিনী ওদের নিয়েই গঠিত হয় এবং ওরাই পাকিস্তানী বাহিনীর জল্লাদ এজেণ্টরূপে কাজ করে। যুদ্ধশেষে তারা আত্ম-গোপন করে আত্মরক্ষা করে। বর্তমান বিশৃঙ্খলা এবং লক্ষ্যহীনতার সুযোগ যদি তারা না নিয়ে থাকে তা'হলে তাদেরকে নির্বোধ মনে করতে হয়। কিন্তু নির্বোধ তারা নয় এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা মানবিক চরিত্র। নানা ছদ্মনামে তারা মাঠে অবতীর্ণ হয়েছে মনে করার কারণ আছে। প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বিভিন্ন হলেও সাময়িক সুবিধার্থে অতি দক্ষিণ এবং অতি বামের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যদিও অন্তিমে অতি বামেরাই ঠকে এবং অনেক সময় অতি দক্ষিণদের হাতেই নিশ্চিহ্ন হয়, তবু মানুষ কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করে না। লেলিন যখন ব্রেসটলিটভসকের সন্ধি করেন তখন দলের উগ্র পিওরিটিশিয়ানরা তাঁর কার্যকে বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য বলেছিল। লেনিনের ব্যক্তিত্ব দলীয় ভাঙন রোধ করতে সমর্থ হয়। তার মৃত্যুর পরের অবস্থা সকলেই জ্ঞাত আছেন। বাংলাদেশেও অতি দক্ষিণ এবং অতি বামের ঐক্যফ্রণ্ট গঠনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে এখনও নামের পূর্বে "পূর্ব পাকিস্তান" লাগানো গোপন উগ্র বামপন্থী দলের অস্তিত্ব বাংলাদেশে আছে। মাঝে মাঝে তাদের পক্ষ হতে প্রচার-পত্র বিলি হয়। পুনরায় পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়ে সমগ্র পাকিস্তানে বিপ্লব করা নাকি তাদের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য।

আইয়ুব-মোনায়েম শাহীর সমর্থক এবং তৎকালীন সুযোগ সুবিধার ফায়দাভোগী কোন কোন মুসলিম লীগারও এখন ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাবার পক্ষে প্রকাশ্য প্রচারে অবতীর্ণ হয়েছেন। যত কৌশলেই বলা হোক ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগানোর অর্থ যে পুনরায় পাকিস্তানভুক্তির সুপারিশ তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। ইংগিতে মুসলিম লীগ আমলের তথাকথিত "সাধু সজ্জন" ব্যক্তিদেরকে পুনরায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুনর্বহাল করার সুপারিশও করা হচ্ছে সংবাদপত্রের কলামে।

এই বিশৃংখল অবস্থার প্রভাব নির্দলীয় যুবকদের উপরও পড়ছে। ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থনকারী ছাত্র-যুবকগণ রবি অলাকালে যার যার খড় শুকিয়ে নিচ্ছে। প্রকাশ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাদের কীর্তিকলাপ।

ফলে নির্দলীয় যুবকগণ সঠিক পথ নির্ণয় করতে পারছে না। অনেকে নিরাশ হয়ে পড়ছে; তারা কোনরূপ জাতীয় কর্মতৎপরতায় শরিক হতে পারছে না। অনেকে অন্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুযোগ সুবিধা-বাদীদের দলে যোগ দিয়েছে। একাংশ বৈপ্লবিক রোমানটিসিজমের ব্যাধিতে আক্রান্ত। বাকীরা রপ্ত করছে মার্কিন হিপ্পীদের আচরণ। যুবশক্তি বহুধা-বিভক্ত হওয়ার ফলাফল দেশ ও সমাজের জন্যে ভালো হয়নি। উপদলীয় যুদ্ধে লিপ্ত যুবকদের কাছে সম্পত্তি দূরের কথা, মানবজীবনেরও কোন মূল্য নেই। মানবিক মূল্যবোধের কোন কিছু অবশিষ্ট আছে বলে মনে হচ্ছে না। কোন কোন দলের কাছে বিপ্লবের আবশ্যকতা মানুষের জন্যে নয়, বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লবের আবশ্যকতা। অপরেরা মনে করছে স্বাধীনতা এসেছে তাদের আর্থিক তরক্কির জন্যে। ফলে এমন দিন যাচ্ছে না যেদিন নরহত্যা, হাইজাক, ডাকাতি, নারী নির্যাতন, লুণ্ঠন ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে না।

এ আলোচনা দৃষ্টে অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয় সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে এখনও অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রবীণ নেতৃত্বের যে মোহ এখনও বিদ্যমান সেটা তাদিগকে ত্যাগ করতে হবে এবং সেই সংগে ত্যাগ করতে হবে বহু অন্ধ আস্থা এবং দুর্বলতা। নেতাদের কথা এবং কাজের মধ্যে যে গুরুতর বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান সেটাও অনতিবিলম্বে দূর করতে হবে। সশস্ত্র যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যুবকদের মন থেকে মৃত্যুভয় কমিয়ে দিয়েছে। অস্ত্রও ব্যবহার করতে শিখেছে তারা। পোশাকী জৌলুস, শ্রদ্ধা-ভক্তির উপর ভরসা অথবা বল প্রয়োগ করে যুব শক্তিকে পরিচালিত করার দিন আর নেই। নেতারা অন্যদের দ্বারা যা করাতে চান বা চাইবেন সেটা আগে নিজেরা শুরু করতে হবে। সমাজতন্ত্রের নাম করে যে শ্রেণীবৈষম্য বিগত আড়াই বছরের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে অনতিবিলম্বে তার অবসান ঘটাতে হবে। পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে উপদেশ বর্ষণ করে এখন আর ফল লাভ করার সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশ আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতেই নেতৃত্বের সৃষ্টি। এখানে সবাই সবাইকে চিনে জানে। কারো পক্ষেই ভিতরের খবর গোপন করা সম্ভব নয় এদেশে। সুতরাং যুবশক্তিকে দেশের কল্যাণ সাধনের কাজে লাগাতে হলে নেতৃত্বকে দেশের সৎ সাধারণ মানুষের স্তরে এসে দাঁড়াতে হবে। (বাংলার বাণী-১৭.১০.৭৪)

গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

গণতন্ত্র একটি বিশেষ ধরনের মূল্যবোধ। রেনেসাঁ উত্তর ইয়োরোপে এ-বোধের জন্ম। লাইসেজ ফেরারি অর্থাৎ অবাধ অর্থনৈতিক তৎপরতার অধিকার স্বীকৃতির সাথে সাথে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিস্তৃতি। আরো ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়ঃ অবাধ উৎপাদন-এবং বাণিজ্য প্রথা হলো ভিত্তি, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তার সুপারস্ট্রাকচার বা উপরের ইমারত। ঐ ভিত্তির অন্য উপাদান আমার মতে জাতীয়তাবাদ।

ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লব এবং অবাধ অর্থনীতির আধিপত্য একই সঙ্গে শুরু হয়। বস্তুতঃপক্ষে উভয় ক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরকরূপে তখন কাজ করেছে। অবাধ অর্থনীতির সামাজিক রূপ ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্থাৎ যার যেমন খুশী সাংসারিক জীবন যাপনের অধিকার। কিন্তু বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণরূপে অনন্যনির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষা করতেই হয়। সেই যোগসূত্রকে যথাসম্ভব শিথিল করতে পারলেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা অর্জিত হলো বলা যায়। শিল্পবিপ্লবের পূর্বে ইয়োরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের মাধ্যমে দেশের লোকের যে পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষা করা হতো, তার মধ্যে সাধারণ মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য ছিল না। সুতরাং, তার মধ্যে জাতীয়তাবোধ বলতেও বিশেষ কিছু ছিল না। শিল্পবিপ্লব এবং লাইসেজ ফেয়ারি অর্থনীতি মানুষের কর্মের ক্ষেত্র বৃদ্ধি এবং স্বাধীনভাবে কর্ম ও পেশা নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি করার সাথে সাথে একদিকে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের মাধ্যমে সামাজিক যোগসূত্র রক্ষা করার রীতি যেমন অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব হয়ে ওঠে অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানী এবং কাঁচামাল আমদানী ব্যাপারে ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা এমন কি সশস্ত্র সংঘর্ষ পর্যন্ত হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদের বুনিয়াদও দৃঢ় হতে থাকে। এ ধরনের

স্বাধীন তৎপরতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঐচ্ছিক যোগসূত্র স্থাপনের আবশ্যকতা ছিল। সেই আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ইয়োরোপের সব দেশে একই সময়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। কোন কোন ইয়োরোপীয় দেশে এখন পর্যন্ত ফ্যাসীবাদী বা অন্য ধরনের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চলছে।

প্রাচীনতম গণতন্ত্র বৃটেনে। কিন্তু সেখানেও গণতান্ত্রিক চেতনা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে খুব বেশী দিনের কথা নয়। দু'শ বৎসর এখনও হয়নি। বৃটেনে সর্বাগ্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় হওয়ার মূলে সাহায্য করেছে ভারতবর্ষসহ ওর অধিকৃত বিভিন্ন উপনিবেশ। যদৃচ্ছা ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে যে ধন সেখানে নিয়মিতভাবে পৌঁছেছে সেটার ভাগ কম-বেশী সকলেই পেয়েছে। অধিকৃত রাজ্যে রপ্তানী বৃদ্ধির প্রয়োজনে কল-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে—সেসব প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হয়েছে দেশের মানুষ। অপরদিকে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী এবং কাঁচামাল আমদানীর ফলে একদিকে যেমন জাহাজ শিল্পের পরিবৃদ্ধি হয়েছে, অপরদিকে তেমনি ওসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য লোক রোজগার করার সুবিধা পেয়েছে। অর্থাৎ দেশের সাধারণ লোক মোটামুটি অভাবমুক্ত রয়েছে এবং তার ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ ও অধিকার দু-ই ভোগ করেছে। এরূপ একটি অনুকূল অবস্থার মধ্যে পারস্পরিক অধিকারের সীমা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পেরেছে তারা। এই স্বাধীন চিন্তা সৃষ্টি করেছে সহনশীলতাবোধ। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল কথাই হলো এই সহনশীলতা। সহনশীলতার দু'টি স্তর আছে। একটি হচ্ছে তার বাস্তব পার্থিব রূপ। যার যার পেশা চলবে, চালাবার স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং সরকারকে দেয় কর ইত্যাদি বাদে যার যত খুশী রোজগার করবে, যার যেমন খুশী খাবেদাবে, পোশাক পরিচ্ছদ পরবে, এতে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে না, প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে না—এটা হচ্ছে সহনশীলতার সাধারণ পার্থিব রূপ। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এ শ্রেণীর সহনশীল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে শ্রেণী-বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সমগ্র লোকের জীবনযাত্রার মধ্যে একটি

মোটামুটি সামঞ্জস্য। জীবন যাত্রার সর্বনিম্ন মানবিক মান রক্ষিত হলেই শুধু এরূপ সামঞ্জস্য সাধিত হওয়া সম্ভব। বৃটেনের সমস্ত শ্রেণীর লোক এক ধরনের পোশাক পরিধান করে; প্রায় একই রকমের খাদ্য ভক্ষণ করে এবং মোটামুটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও মানুষের বাসযোগ্য গৃহে বসবাস করে। চিকিৎসাও পায় সকলে। বেকার হলে তার ভাতাও পায়। সাধারণভাবে দেশের সকল লোকের এসব সুযোগ-সুবিধা যত বৃদ্ধি পেয়েছে সহনশীলতাও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। সহনশীলতার অন্য অর্থ অপেক্ষা করার ধৈর্য। অপেক্ষা করার ধৈর্য তখনই জন্মে যখন অপেক্ষা করা সম্ভব হয়।

সহনশীলতার অন্য স্তরটি চিন্তার জগতে। দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের অভাবমুক্তি মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেয়। পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে তার বাহ্য রূপ হলো সঙ্গী নির্বাচন, আহার্য নির্বাচন, ধর্ম নির্বাচন বা বর্জন প্রভৃতি ব্যাপারে উদারতা। অর্থাৎ অপরের ব্যক্তিগত জীবনবোধ এবং আচরণ নিয়ে মাথা না ঘামানো। সহনশীলতার প্রথম স্তর হতেই দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছা সম্ভব। পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকা সহনশীলতার এই দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছেছে খুবই অল্পকাল পূর্বে। আন্দোলনটাই শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে। যুদ্ধের পরে সেটা বিস্তার লাভ করে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি সামগ্রিক মূল্যবোধ যার সৃষ্টির মূলে রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। প্রথম উপকরণ শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার। দ্বিতীয় উপকরণ মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাত্রা। তৃতীয় উপকরণ জাতীয়তাবোধ। অবশ্য, জাতীয়তাবোধ প্রথম দু'টি উপকরণের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফল। বিদেশের বিরুদ্ধে দুর্বলের বিদ্বেষ নয়—সমানে সমানে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখতে পারি। উল্লেখ্য যে, গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য। সুতরাং স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, আমরা প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার অপেক্ষায় আছি। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত আমরা পশ্চাতে পড়ে আছি। আমাদের অন্য একটি মহৎ লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র প্রবর্তন ব্যাপারে আমরা একপ্রাণ। এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু আমি বলতে

চাই সাধারণ মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দৃঢ় হওয়ার পূর্বে এদেশে সমাজতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কারণটা আলোচনার মধ্যে পরিস্ফুট হবে।

প্রথম কথা, বাংলাদেশের মানুষ এখন পর্যন্ত জাতি চেতনার প্রাথমিক স্তরে। বাংলাদেশ বিগত কয়েক শ' বৎসরকাল মধ্যে কখনও স্বাধীন ছিল না। বৃটিশ শাসনের পূর্ববর্তী মোগল-পাঠান শাসনও প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদেশিক শাসন ছিল। মোগল পাঠান শাসকগণ ভারতবর্ষকে তাদের স্থায়ী বাসভূমিরূপে বরণ করে নিলেও বাংলাদেশ প্রকৃত বাংলাদেশবাসী অর্থাৎ বাংলাভাষাভাষী এবং আচার আচরণে বাংগালী দ্বারা শাসিত হয়নি। বরং অবাঙ্গালী শাসকগণ বাঙ্গালীদেরকে, বিশেষ করে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজকে সদা-সর্বদা বিভ্রান্ত করে রেখেছে। শতকরা পঁচানব্বই-জন বাঙ্গালী মুসলমান বাংলাদেশের প্রাচীন মানবগোষ্ঠী ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে বাঙ্গালী জ্ঞান না করে জ্ঞান করেছে স্বদেশে প্রবাসী। তাদের দৃষ্টি রয়েছে ইরান, তুরান, আরব প্রভৃতি দেশের দিকে। তারপরে দৃষ্টি রয়েছে দিল্লী, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানের দিকে। নিজেদেরকে বাঙ্গালী মুসলমান না ভেবে শুধু মুসলমান ভেবেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে এবং পরে পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানের নেতৃত্ব ও শাসন মেনে নেয়ার এটাই কারণ। নইলে দেশ ভাগ হওয়ার পরে বাঙ্গালী কখনও পাঞ্জাবী শাসন মেনে নিত না। মেনে না নিলে সে সময়ে মিঃ জিন্নাহর সাধ্য ছিল না বাংলাদেশকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বিদ্যমান থাকলে বিভাগ পরে বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্র হতো। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অভাব আমরা বাঙ্গালী মুসলমানের রচিত সাহিত্যেও দেখতে পাই। নজরুল ইসলাম, জসীমুদ্দীন প্রমুখের আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমানের রচনার মালমসলা প্রধানতঃ পশ্চিম এশিয়া হতে আহৃত হতো। অন্য একটি ধারায় রয়েছে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের দুর্বল জবাব। কিন্তু কোন ধারাতেই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন নেই।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মূলে বাঙ্গালী চেতনা সক্রিয় ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটা যতটা না ছিল অর্থক সুসংবদ্ধ বোধ তার চাইতে বেশী

ছিল বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। বলা বাহুল্য, সুসংবদ্ধ মূল্যবোধ একটি সদর্থক গুণ। পক্ষান্তরে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আক্রান্তের সাময়িক ব্যবস্থার সমতুল্য। এ ধরনের ক্রিয়াকে নঞর্থক গুণ বললেও সম্ভবতঃ ভুল করা হয় না। আমার বক্তব্যের প্রমাণ স্বাধীনতা লাভের অল্পকাল পর হতেই পাওয়া যাচ্ছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে মুসলিম বাংলা শ্লোগান উত্থাপন, হিন্দু বিদ্বেষ এবং আপন দোষ ও অপরাধ চাপা দেওয়া বা স্খলনের উদ্দেশ্যে ভারত বিদ্বেষ প্রচার প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ তথা বাঙ্গালী মুসলমানিত্ব অস্বীকৃতিরই নামান্তর। যার আরো বিশদ অর্থ পাকিস্তান প্রীতি। বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত স্বাধীনতার মধ্যে জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিস্তারের যেমন সুযোগ রয়েছে তেমনি রয়েছে দীর্ঘকালব্যাপী বঞ্চনার ফলে ক্রোধ এবং অনমনীয় মনোভাব প্রসারের সমান সুযোগ। কারণ যাই হোক দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে খুব দরিদ্র বিধায় বঞ্চিতদের অভাব আশু পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ তারা চায় সমস্ত অভাব এই মুহূর্তে পূর্ণ হোক। সেটা হচ্ছে না বিধায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ক্রোধ রয়ে গেছে। এই ক্রোধ দু'টি ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। সাধারণ বঞ্চিত মানুষ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হচ্ছে এবং তার বিনাশ সাধনের দিকে ঝুঁকছে। অপরদিকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুযোগে কিছুসংখ্যক মানুষ সুযোগ-সুবিধা করে নিয়েছে। তারা নিজেদের অপরাধ ঢাকা দেবার জন্যে সাধারণ মানুষের কাছে কল্পিত একটি তৃতীয় পক্ষকে শত্রুরূপে উপস্থিত করছে। তৃতীয় পক্ষ ভারত, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের যে-কোন একটি। দেশের অভ্যন্তরে কল্পিত তৃতীয় পক্ষ বেচারা সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানকে শত্রুপক্ষরূপে উপস্থিত করা হচ্ছে না, যদিও পাকিস্তান তিরিশ লক্ষ বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে। সৌদী আরব এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবু, সেদেশে হজ করতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন সদাশয় সরকার। তার উপরেও জনৈক স্বনামধন্য নেতা 'গরীব মানুষে'র হজ করার সহজ সুযোগ করে দেয়ার দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু কেন? গরীব মানুষের উপর হজ ফরজ নয় বলেই জানি। এবং ধনী ব্যক্তির জন্যেও হজ জীবনে একবার মাত্র ফরজ। সৌদী আরব কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি

না দেখার সঙ্গত অর্থ সে বাংলাদেশকে সম্ভবতঃ দারুল হরব জ্ঞান করে। পক্ষান্তরে বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতিকে 'বাধ্য করি জ্ঞান করে দারুল ইসলাম বা ঐ রকম কিছু। মুসলমানের বাসভূমি একটি দেশকে অপর যে মুসলমান দেশ স্বীকৃতি দেয় না তাকে কি আমরা মিত্র দেশ জ্ঞান করবো? বলা বাহুল্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের উপরোক্ত প্রচারের ফলে বঞ্চিত সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে ও তারা পুনরায় পাকিস্তানী যুগসুলভ আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তারা শুধু কল্পিত তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধেই ক্রুদ্ধ হচ্ছে না, সবপ্রকার দেশীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও ক্রুদ্ধ হচ্ছে। ক্রুদ্ধ হওয়ার পরবর্তী পর্যায় ধ্বংসাত্মক কার্য।

উপরোক্ত মনস্তত্ত্ব থাকার ফলে যুদ্ধ চলাকালে যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিত হয়েছিল, তাতে ভাটা পড়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, পারস্পরিক পার্থক্যবোধ বিদ্বেষ ও সন্দেহ-বিভেদ প্রভৃতি ক্রমে প্রাধান্য পাচ্ছে। জাতীয়তাবাদ বলতে যে একটি সর্বজনীন একাত্মতা, ঐক্যবোধ এবং ভৌগোলিক জাতি চেতনার প্রতি আনুগত্য বোঝায় সেটি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারছে না। ফলে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও সৃষ্টি হচ্ছে না। কেননা, পূর্বেই বলেছি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সহনশীলতা অর্থাৎ সিদ্ধিলাভে বিলম্ব দেখতে পেলেও তজ্জন্য ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করা।

বাংলাদেশের সমস্যা খুবই জটিল। এখানে দু'চার-দশ বৎসরের মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করার উপযোগী সম্পদ এবং কারিগরি ও প্রশাসনিক দক্ষতা নেই। তা ছাড়াও রয়েছে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এখানে খুব উজ্জ্বল নয়। ঐতিহাসিক। গণতান্ত্রিক ... এটাও সত্য যে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা না হলে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব।

আমার উক্তি নৈরাশ্যব্যঞ্জক—এ অভিযোগ অনেকে করবেন। উত্তরে বলবো, আমি বাস্তব অবস্থার বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি। প্রতিকার নেই এমন কথা বলছি না। রাজনৈতিক দলগুলো কল্পিত তৃতীয় পক্ষকে সকল দুঃখের কারণরূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা ত্যাগ করলে জাতীয়তাবাদকে গণজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রারম্ভিক কাজ শুরু হবে। আমলাতন্ত্র সহ দেশের

প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বস্তরের ক্ষমতাবান লোককে বিলাস ও ব্যয়বহুল জীবন-যাপন পরিহার করতে হবে। দেশের শতকরা নব্বইজন মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে হবে তাদেরকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সর্বস্তরে বর্তমানে যে কোন উপায়ে অর্থ-বিত্ত সংগ্রহ এবং তদ্বারা উচ্চ জীবন যাপনের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে সেটাকে সংযত করতে হবে। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং তাদের সহচর-অনুচরগণ প্রথমে আদর্শ স্থাপন করবেন। তারপর অত্যন্ত কঠোর হস্তে উচ্চ এবং ব্যয়বহুল জীবন যাপনের পথ বন্ধ করবেন। এক কথায়, দেশের সাধারণ মানুষকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, শাসক শ্রেণীও তাদের দুঃখের ভার বহন করছে; বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার মধ্যে উৎকট পার্থক্য নেই। দেশে যা কিছু আছে, তা সকলেই যথাসাধ্য সমানভাবে ভাগ করে খাচ্ছে। এরূপ নীতি অনুসৃত হলে মানুষের মনের ক্রোধ কমবে এবং বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করবে। তখন দেশের সবস্তরের মানুষের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ জন্মাবে। আত্মীয়তাবোধ জন্মাবার সাথে সাথে সহনশীলতার গুণটিও প্রসার লাভ করবে। একই সঙ্গে জাতীয়তাবোধ এবং গণতন্ত্র দু-ই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

পরবর্তী পর্যায়ে আসবে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র হচ্ছে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক উন্নত প্রকারের গণতন্ত্র। এখানে রয়েছে মানুষে মানুষে বিদ্যমান সমস্ত প্রকার ভেদাভেদ দূর হওয়ার প্রতিশ্রুতি। শুধু তাই নয়, চিন্তার জগৎও আভিজাত্য-অনাভিজাত্যের বোধ থেকে মুক্ত হবে।

প্রথম কাজ প্রথমে হওয়া আবশ্যক।

(ইত্তেফাক ২৮. ১০. ৭৩)

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভারতবর্ষ, যাকে আজকাল আমরা উপমহাদেশ বলতে অভ্যস্ত হয়েছি, যখন বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হলো, তখন হৃদয়ে আনন্দের দোলা অনুভব করেছি, সেই উৎসবে যোগদানও করেছি, কিন্তু সেদিন অসীমের ভয়াবহ বিপুলতা অনুভব করিনি, অনুভব করিনি একই সঙ্গে আপন ক্ষুদ্রত্ব এবং অসীমের বল। আমরা জানতাম ইংরাজ বিদেশী জাতি, যতই শক্ত হোক তার মুষ্টি একদিন না একদিন সেটা শিথিল হবেই, যতই দৃঢ় হোক তার কারাগারের দেয়াল, একদিন না একদিন তা ধূলিসাৎ হবেই এবং আমরা মুক্ত হবো, কেননা, কোন জাতি কখনও আবহমান কাল পরাধীন থাকেনি, ইতিহাসে তেমন নজীর নেই। সুতরাং আমরা মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম এবং শুভদিনটির অপেক্ষা করছিলাম। যখন সে শুভ দিনটি এলো আমরা আনন্দিত হলাম। কিন্তু বিহ্বল হইনি, হইনি বিমূঢ়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার এটা ষষ্ঠ মাস। ষষ্ঠ মাসেও আমার বিহ্বলতা যায়নি। এমন একটি মহাভয়ঙ্কর ঘটনা নিজ জীবনকালে প্রত্যক্ষ করবো কোন দিন তা ভাবিনি। তাই কবিগুরুর জন্মদিনে বার বার পশ্চাৎ ফিরে স্মরণ করছি ঃ

মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম,
আজি এ নব প্রভাতের শিখর চূড়ায়।
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরনো নাম ... ।

ধর্মীয় অন্ধতাপ্রসূত ভাবাবেগবশে আমরা একটি সুপ্রাচীন ও সুমহান নাম বর্জন করে একটি অস্বাভাবিক ও হীন নাম গ্রহণ করেছিলাম। ন'মাসে "অজস্র মৃত্যু" পার হয়ে পুনরায় স্বাভাবিক ও মহান নাম গ্রহণ করলাম। পশ্চাতে ফেলে এলাম স্বহস্তে প্রদত্ত অগ্নির লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত

অস্বাভাবিক ইমারতের ভস্মস্তূপ। এই যে স্বাভাবিকতায় ফিরে এলাম, এইটিই হচ্ছে নব-প্রভাতের শিখরচূড়া।" এ শিখরচূড়ার আরোহণ করতে যে অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসতে হয়েছে, আমার বিহ্বলতা শুধু সেটা স্মরণ করে নয়। আমি নির্বাক, আমি বিহ্বল হই যখন উপলব্ধি করি ইতিহাসের বিপুলতা। মনে হয় ভূমিকম্পে আলোড়িত-উদ্বেলিত সপ্ত সাগরের উত্তাল ঊর্মি ও জলোচ্ছাসের আবর্তের মধ্য হতে ফিনিক্সের মহিমায় উৎক্ষিপ্ত উত্তোলিত হলাম আমি। আমি আমার প্রকৃত সত্তাকে ফিরে পেলাম। কিন্তু কেমন করে ফিরে পেলাম, কে সৃষ্টি করলো আমার মধ্যে টর্ণাডোর ভয়াবহ মহিমা ও বেগ? আমার পর্বত প্রমাণ ভ্রান্তিকে কে করল অপসারিত? আমার চৈতন্যকে কে দান করলো মুক্তি? কে বিকশিত করলো আমার শক্তি?

কোন জটিল প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হয় না। কিন্তু শত উত্তরের মধ্যে, শত কথার মধ্যে একটি নাম প্রথমেই উদয় হয়। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ ন'মাসের মহা আবর্তের মূলে সততঃ সক্রিয় ছিলেন কবিগুরু। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর নেতৃত্ব। তিনি দীপক রাগে গাইছিলেন:

> ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
> একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো
> দুন্দুভিতে হলরে কার আঘাত শুরু
> বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু
> পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে দেখা মন্দভালো।

চব্বিশ বর্ষব্যাপী "সুপ্তিরাতের স্বপ্নে দেখা মন্দভালো" ছিল সত্য সত্যই আবর্জনা। আবর্জনাময় পঙ্কের মধ্যে ডুবেছিলাম আমরা। আমরা বিভ্রান্ত ছিলাম, হারিয়ে ফেলেছিলাম দৃষ্টির স্বচ্ছতা। কুলুর বলদের মতো অন্তহীন চক্রের মধ্যে ঘুরছিলাম আমরা। স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভুলে আমরা অন্ধ ধর্মীয় সংস্কারের বেদীতে মাথা খুঁড়ে মরছিলাম। ধর্ম কোনদিন জাতীয়-তার ভিত্তি হতে পারেনি; ধর্মীয় জাতীয়তার একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসে নেই। তবু শ্রেণীস্বার্থান্ধ একদল কৌশলী মানুষের জালে আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়া মাছির মতো। এই জাল ছিন্ন করার প্রয়োজন সম্বন্ধে আমরা প্রথম সচেতন হলাম, যখন দুর্বৃত্তেরা

আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে আমাদিগকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্র করলো। এ চেতনা আমরা ফিরে পেলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে। কেননা, আজ যে ভাষায় আমরা কথা বলি, যে ভাষায় গ্রন্থ রচনা করি, যে ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করি, সে যে তাঁরই সৃষ্টি। বাংলা ভাষা তার আগেও ছিল, কিন্তু সে-ভাষা আজ প্রচলিত নেই; সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সমাস সন্ধির দুর্ভেদ্য প্রাচীর হেলায় ভেঙ্গে একা তিনি আমাদের মুখের ভাষাকে দান করলেন আভিজাত্য, দিলেন বিশ্বে মর্যাদা। আমাদের চিন্তায়, আমাদের কর্মে, আমাদের স্বপ্নে, জাগরণে তাঁর ভাষা ব্যবহার করছি। তাই যখন ভাষার উপর ওরা কৃপাণ উদ্যত করলো, তখন সে আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে আমরা নির্মাতার শরণ নিলাম। কবির কণ্ঠকে আপন কণ্ঠে ধারণ করে আমরা উত্তর দিলাম:

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায়রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি।

আমাদের নবচেতনা এলো, এবং আক্রমণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতেও তৈরী হলাম। ১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিলাম।

আরো ঝড় এলো। এলো আঘাত। ১৯৬২ সাল ১৯৬৫-৬৬ সাল। আমরাও রক্তে প্রত্যুত্তর দিলাম। বললাম:

"আমি ভয় করব না,
ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে
মরব না ভাই, মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে,
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরব না।
শক্ত যা তাই সাধতে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে—"

আরও রক্ত দিলাম, কেননা রক্তদান ব্যতীত কোন মহৎ কার্য সমাধা

এখন পর্যন্ত হয়নি—এটা মানব জাতির কলঙ্কের ইতিহাস। কবিও তা জানতেন, তাই রবীন্দ্রনাথ মানবতার সাধক হয়েও বলতে বাধ্য হয়েছেন,

দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জেনো।"

ওরা বাঁধন আরো শক্ত করলো। সকল অনর্থের মূলে রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ওরা নিষিদ্ধ করলো রবীন্দ্রসাহিত্য। আমরা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম, রবীন্দ্রসাহিত্য বিসর্জন মানে বাংলা ভাষা বিসর্জন, কেননা, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে যে বাংলা ভাষা অবশিষ্ট থাকে সে-ভাষা দ্বারা আমরা প্রকাশিত হতে পারি না, পারি না দিতে সত্তার পরিচয়। সুতরাং আমরা গাইলাম,

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥

এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই,
তন্দ্রা ততই ছুটবে
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥

ওরা ভাঙতে যতই চাইবে জোরে
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা
ততই যে ঢেউ উঠবে।"

সত্য সত্যই বাঁধন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে লাগলো। আমরাও সে বাঁধন ছিন্নভিন্ন করার জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলাম। আমরা রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দিতে পারি না, সোচ্চারে ঘোষণা করলাম। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দুশ্চরিত্র পামরেরা ধর্মের জিগির তুললো। আমরা বললাম, ধর্ম যার যার নিজের, দেশ ও জাতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। দেশে সকল

ধর্মের স্থান হয়, কিন্তু ধর্মের মধ্যে সকল দেশের স্থান কখনও হয়নি, হতেও পারে না। বললাম, আমাদের দেশ এমনি যে,

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক হুন দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন,

সুতরাং আমরা ধর্মের ভেদে জাতিকে ভেদ করতে পারি না। আমাদের চব্বিশ বৎসরের ভ্রান্তি দূর হলো। বললাম, আমরা, আমরা তোমরা তোমরা। আমার দেশ বাংলাদেশ। আমরা বাঙালী। সোচ্চারে গাইলাম:

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশ,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক হে ভগবান।

দুর্বৃত্ত ইয়াহিইয়া বাহিনী তখন আর্টিলার চেয়েও নিষ্ঠুরতায় আক্রমণ করলো। ব্যাপক নরহত্যা, লুন্ঠন, নারী-নির্যাতন এবং অগ্নিপ্রদানে মেতে উঠলো নরূরূপী পশুর দল। বাঙালী আমরা। আমরা শান্তির মানুষ। তাই একদা সুদূর শান্তির দিনে কবি গেয়েছিলেন:

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো গো,
এসো মোর হৃদয়নীরে।"

আমরাও তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে বাণীর মর্যাদা দুর্বৃত্তের দল মুর্খের দল, কেমন করে বুঝবে? সুতরাং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার যে আহ্বান জানিয়েছেন কবি, তার শরণ নিলাম:

মুহূর্ত তুলিয়া শির
একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত
সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,

যখনি জাগিবে তুমি,
তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি
সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো
সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে।

আমরা কবির আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' 'চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।'

লক্ষকণ্ঠে গাইতে গাইতে পথকুক্কুরের দল 'বিতাড়নে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সারমেয় বাহিনী লেজ গুটিয়ে আত্মসমর্পণ করলো। আমরা আমাদের সোনার বাংলাকে ফিরে পেলাম, মায়ের ভাষায় অকুতোভয়ে মুক্ত কণ্ঠে বলার ও লেখার স্বাধীনতা ফিরে পেলাম। শুধু তাই নয়, ফিরে পেলাম সত্তা। উপলব্ধি করলাম আপনাকে। পৃথিবীতে আপনাকে চেনাই সবচাইতে বড় চেনা।

আমরা পথ হারিয়েছিলাম। সঠিক পথে ফিরিয়ে আনলেন কবি। পৃথিবীতে এমন ক'টি দৃষ্টান্ত আছে, যে একজন কবি একটি জাতির উন্মেষ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন। যতই এ কথা ভাবি ততই অভিভূত হই এবং বারবার স্মরণ করি সেই কবিকে যার আহ্বানে আমরা আমাদের 'পুরনো নাম' বিসর্জন দিয়ে "নব প্রভাতের শিখর চূড়ায়" আরোহণ করলাম।

[ইত্তেফাক, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৮, (১৯৭২)]

উপন্যাসের উপকরণ

গল্প ও উপন্যাস সম্বন্ধে নতুন কথা বলার সুযোগ কম। এত মানুষ এতকাল অবধি এত কথা বলেছেন যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে যা নতুন কথা মনে হয় আসলে তাও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পুরনো কথা।

লেখকের মন সংবেদনশীল এবং অত্যন্ত নরম। পরিবেশ এবং নিত্য ঘটমান ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া তার উপর হয় এবং খুব গভীরভাবেই হয়। কিন্তু তাকে কাজ করতে হয় একা। এ জন্যে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্দেশ অচল। আমার মনে হয় মানবেতিহাসের সবটাই উপন্যাস। সাধারণ ইতিহাসও বর্ণনার কুশলতায় চমৎকার উপন্যাস হয়ে ওঠে। হেরোডোটাস পড়লে মনে হয় উপন্যাস পড়ছি। সেন্ট অগাস্টিন, রুশো এবং গন্ধীর আত্মজীবনী পাঠ করলে মনে হয় কল্পিত কাহিনীর চেয়ে অনেক উন্নত উপন্যাস পাঠ করছি। বনমানুষ ছিলাম। তা থেকে হলাম যূথবদ্ধ মানুষ। গঠন করলাম মাতৃ-প্রধান সমাজ। সেখানে থেকে পিতৃ-প্রধান সমাজে উত্তরণ হলো। ভলগা থেকে গঙ্গায় এলাম। মেম্ফিস, থিবেস, ব্যাবিলন, পার্সেপলিস, সুমা, এথেনস, ট্রয়, হস্তিনাপুর, পুরুষপুর, কুরুক্ষেত্র কত না জনপদ গঠন করেছি এবং ধ্বংস করেছি। ছিলাম মুক্ত। সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সাথে সাথে হলাম শৃংখলাবদ্ধ সামাজিক মানুষ। সেখান থেকে ভূমিদাস, তারপর ভূমিদাস থেকে যন্ত্রের দাস। যন্ত্রের দাস থেকে অরওয়েল কল্পিত বিগ ব্রাদার বা মহাশক্তিসমূহের দাস হতে চলছি বলে আশঙ্কা হচ্ছে। অর্থাৎ কিনা পরমাণু এবং সাংগঠনিক যন্ত্রের দাস হওয়ার পথে আজকের মানুষ। তা ছাড়াও নানা ইজম এবং বোধের দাস—আচার-আচরণ এবং আস্থার দাস। অপরদিকে মুক্তি এবং নিভেজাল স্বাধীনতার নামে সেই পুরোনো নিয়তির দাস - এস্কাইলাস এবং জাঁ-পল সার্তের দাস। তা ছাড়াও নানা ক্ষেত্রে কীর্তিমান ব্যক্তিদের বাণী ও নির্দেশাবলীর দাস, গণবক্তৃতা-

(ডেমাগগি) এবং চিল্লা-চিল্লির (হ্যারাঙ্গ) দাস-উত্তেজনার দাস এমনকি সম্মোহিত জনতার দাস। অপর দিকটা ও কম উল্লেখযোগ্য নয়। পিতৃপ্রধান সমাজে পিতা স্বাধীন, তারপর কামপতি স্বাধীন। অতঃপর রাজা, মহারাজ, ভূস্বামী, জমিদার ও লুকদার, প্লুটক্র্যাসি, অলিগারকি, ব্যুরোক্র্যাসি, ধণিক-স্বাধীন। তাদের সভাষদ, পারিষদ, উমেদার এবং তাবেদারগণও যার যার সীমা-সরহদ্দের মধ্যে স্বাধীন। এই হচ্ছে মানবেতিহাসের বিবর্তন। সঙ্গে সঙ্গে শংকা জাগে বুঝিবা দ্রুত সংবর্তনের দিকেও এগিয়ে যাচ্ছি। তাই মানব-জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসটাই উপন্যাস নয় কি? আবার প্রতিটি মানব-জীবনও উপন্যাস। কত কথা, কত গান, কত না স্বপ্নের সমষ্টি প্রতিটি মানব জীবন—এক জোড়া মানবজীবন এবং একটি পরিবারের জীবন। মানব জীবনের এ কাহিনী বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে ও কৌশলে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কখনও মহাকাব্য, কখনও রূপক, কখনও নাটকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে মানুষের জীবন কথা। আবার প্রকৃতি যখন ছিল শুধু বিস্ময় ও ভীতি তখন দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবের কাহিনীরূপেও মানুষের কথা রচিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনী রচনার সর্বক্ষেত্রেই একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। সেটি হচ্ছে মুক্তির আকুতি—অধঃপাত থেকে, অন্যায় উৎপীড়ন থেকে এবং নানা কুসংস্কার থেকে মুক্তির আকুতি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অন্তরে জ্বালাবোধ করলে মানুষ তা নিরসনেরও পথ খোঁজে। কথাটা ঘুরিয়ে অন্যভাবেও বলা যায়। মানুষ চায় তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হোক। বাস্তব জীবনে যা কাম্য, শিল্পে সাহিত্যেও তার প্রতিফলন সে দেখতে চায়। লেখক মাত্রেই অত্যন্ত সংবেদনশীল বলে তার অন্তঃর্জ্বালার গভীরতাও বেশী। এই অন্তঃর্জ্বালার নিরপেক্ষ জড় পদার্থ বা প্রাণী নয়। তার সবটাই পরি-বেশের প্রতিক্রিয়া। সমকালীন পরিবেশের অসংগতিজনিত সংঘাত এবং অন্তর্বিরোধ ঔপন্যাসিকসহ সব লেখকের মনকে নাড়া দেয়। তখন সে লেখনী হাতে নেয়। রাজনীতিক অথবা সমাজ সেবী মানবতাবাদীর ন্যায় ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক কাজ করেন না বটে, কিন্তু তাই বলে লেখক বিশেষ করে উপন্যাসে লেখক কখনও উদ্দেশ্য হীন কারিগর নয়। অঘোষিত হলেও সে একটি দায়িত্ব পালন করে। তার কার্যের সামাজিক মূল্য রাজ-নীতিক পালিত দায়িত্বের চেয়ে অনেক বেশী, কেননা সে মানুষের মূল্যবোধ

বিবর্তনে সাহায্য করে। সাহায্য করে বললে বরং ওঁর অবদানকে লঘু করে বলা হয়। টলষ্টয় গগোল দস্তভয়স্কি চেকভ গর্কী প্রমুখ মনীষীর বিচিত্র রচনা সম্ভার পথ প্রস্তুত না করে দিলে ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রুশ জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হতো না। ঠিক তেমনি রুশো, ভলতেয়ার, হিয়োগো, স্তাদাল, ইবসেন, বালজাক, মোপাসা প্রমুখের জন্ম না হলে পশ্চিম ইয়োরোপীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হতো, অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের পূর্বে আসে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সেটা ঘটান লেখক সম্প্রদায়। আধুনিক যুগতে ঔপন্যাসিকের স্থান লেখক সম্প্রদায়ের অগ্রে। সুতরাং ঔপন্যাসিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্য পালন করেন। তাঁর রচনা একার সৃষ্টি কিন্তু রচনা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে তা সামাজিক সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়; কেননা কোন লোক শুধু নিজের সন্তুষ্টির জন্যে রচনা করেন না—প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্যে ঐ অমানবিক পরিশ্রমের কোন আবশ্যকতাই নেই। অন্য যে কোন মানুষের ন্যায় ঔপন্যাসিকসহ সকল শ্রেণীর লেখক সামাজিক মানুষ—সমাজের বাইরে লেখক রূপে তার কোন অবস্থিতি নেই। এ অবস্থাটি কেই দায়িত্ব এবং কর্তব্যরূপে চিহ্নিত করে আধুনিককালে নাম দেয়া হয়েছে সমাজ চেতনা; আরো যারা অগ্রসর তারা বলেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধ।

বাংলাভাষায় সকল উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে—বঙ্কিমচন্দ্র থেকে। প্রেরণা ও উৎস ইয়োরোপ। তদবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রচনাকৌশল ব্যতীত উপন্যাসের ক্ষেত্রে অন্য কিছু অনুকরণীয় নয়, কেননা ঔপন্যাসিককে বাধ্য হয়েই তার স্বদেশের মাটি ও সমাজ-জীবন থেকেই যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু স্বদেশের সর্বস্তরের সমাজ জীবনের সংগে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম লেখকেরই হয়। সুতরাং বাংলা উপন্যাসেও উপন্যাস লেখকের পরিচিত সমাজ স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ বাংলা উপন্যাসের লেখক মধ্যবিত্ত শ্রেণী হ'তে উদ্ভূত। উপরের শ্রেণীর মানুষের রচনাও কিছু কিছু আছে। সুতরাং উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নর-নারীর সমাজ জীবন নিয়েই গড়ে ওঠেছে বাংলার শক্তিশালী উপন্যাস সাহিত্য।

সাহিত্য কর্মের মূল্য কখনও লেখকের ধর্মবিশ্বাস দ্বারা নির্ধারিত হয় না।

বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় শিল্প সৃষ্টির এই বিশেষ দিকে প্রবেশ করেছে অনেক বিলম্বে—কম করে বললেও হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী পরে : অপরদিকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা তৎকালে একটি সর্ব ভারতীয় ব্যাধি ছিল। একের সমাজ জীবনের সংগে অপরের গভীর পরিচয় ছিল না। সুতরাং মুসলিম সমাজ জীবনে বাংলা উপন্যাস স্থান পেয়েছে কম। ইদানীং সে অভাব দ্রুত পূরণ হতে চলছে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের ঔপন্যাসিক উভয় সম্প্রদায়ের জন-জীবন হতে উপকরণ সংগ্রহ করে উপন্যাস লিখছেন।

তা'ছাড়া'ও বিগত দু'দশকের মধ্যে বাংলা ঔপন্যাসিকের বিচরণ ক্ষেত্র আগের চেয়ে অনেক বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজ সচেতন এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধমূলক উপন্যাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কার-খানার শ্রমিক, কামার, কুমোর, সুতার, চাষী, তাঁতীর সমাজ হতে উদ্ভূত না হয়েও অনেকে সমাজের সর্ব নিম্নস্তরের মানব জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভি-জ্ঞতা সঞ্চয় এবং তার গভীরে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে। সেই মূল্যবান অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তাদেরকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতামূলক উপন্যাস রচনায় সাহায্য করছে। অপরদিকে ঔপন্যাসিকের দেশে—এখানে আমি বিশেষ-ভাবে পশ্চিম বাংলাকেই মনে করছি একটি শক্তি উচ্চবিত্ত এবং মন ও মানসে প্রায় ইয়োরোপীয় সমাজ গড়ে ওঠায় তারা ঐ সমাজ হতে উপকরণ সংগ্রহ করে পশ্চিম ইয়োরোপীয় এবং মার্কিনী উপন্যাস সাহিত্যের সর্বশেষ আঙ্গিক এবং মন ও মানসগত নানা প্রবণতা রচনার মধ্যে আনছেন। আমাদের কথা স্বতন্ত্র। স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স সবে তিন বৎসরে পড়লো। একে ত সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান। এখনও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। উল্লেখ্য যে, কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম সমাজের প্রথম আধুনিক উপন্যাসের লেখক। পাকিস্তানী শাসনামলে লেখকের স্বাধীনতা ছিল না। বাংলা ভাষার চর্চা বন্ধ করাই ছিল শাসকশ্রেণীর উদ্দেশ্য। বাঙ্গালী লেখকদের অবস্থা তখন জেলের কয়েদীর ন্যায়। তবু তারা চুপ ছিলেন না। অনেকে রূপকের সাহায্যে অন্তর্জালা প্রকাশ করেছেন—ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে মোচড় দিয়ে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। শওকত ওসমানের ক্রীতদাসের হাসি এ ধরনের একটি গ্রন্থ। ঐ সময়ে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখিত

হয়েছে। শহীদুল্লাহ্‌ কায়সারের সারেং বউ এবং সংশপ্তকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

অপরদিকে পাকিস্তানী আমলেই সর্বাধুনিক পশ্চিম ইউরোপীয় ভাবধারা বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রবেশ করতে থাকে। এ ব্যাপারে অগ্রপথিক পরলোকগত সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্‌। চাঁদের অমাবস্যা এবং কাঁদো নদী কাঁদো তাঁর রচিত দু'টি উপন্যাস। উভয় গ্রন্থ ফরাসী ভাবধারায় প্রভাবিত। ক্যামু এবং সার্ত্রীয় দর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঐ দু'টি গ্রন্থে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলাদেশের সবচাইতে সাবধানী, কর্তব্য সচেতন এবং শক্তিশালী লেখক ছিলেন বললে সম্ভবতঃ অত্যুক্তি করা হয় না। সুতরাং দার্শনিক মতবাদ যাই হোক, তার রচনা বাংলার মাটির রসে স্নিগ্ধ। দার্শনিক মতবাদ প্রক্ষেপের কারণে উপন্যাস দু'টির কোন কোন চরিত্রের আচরণ কিছুটা খাপছাড়া এবং কিছুটা ব্যতিক্রম মনে হলেও অপরিচিত এবং সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক মনে হয় না।

১৯৬৮ সালের শেষ দিক হতেই বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকে। ১৯৭১ সালের শেষ অবধি সে সংগ্রাম চলে। যার শেষ ন'মাস ছিল সশস্ত্র যুদ্ধ। ঐ সময় সাহিত্য কর্ম করা সহজ ছিল না। সমাজ সচেতন লেখকের পক্ষে বড় রকমের কাজে হাত দেয়া অসম্ভব ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে লেখক মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছে। তারা লিখছেনও। তবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বড় রকমের বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরেই তাকে ভিত্তি করে বড় এবং মহৎ কাজ সাধারণতঃ হয় না। নেপোলিয়ন কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের প্রায় দু' যুগ পরে টলস্টয় জন্মগ্রহণ করেন এবং ওয়ার এণ্ড পীস রচনা করেন আরো বহুকাল পরে। বাংলাদেশ উপর্যুপরি কয়েকবার প্রকৃতির রুদ্ররোষে পতিত হয়েছে। তারপরে পরেই অগণিত লোককে জীবন দান করতে হয়েছে নর-রূপী পাকিস্তানী সামরের বাহিনীর হাতে। অসংখ্য নারী নির্যাতিত হয়েছেন, বিধ্বস্ত হয়েছে অসংখ্য জনপদ। অতএব বাংলাদেশে উপন্যাসের উপকরণের অভাব নেই। ন'মাসের রক্তাক্ত যুদ্ধকালের মধ্যে রয়েছে বহু এপিকের মালমসলা—বহু নাটকেরও মাল-মসলা। আবার যুদ্ধোত্তর কালেও সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন উপকরণ। সংঘাত ও বিরোধ বহু। এক-

দিকে রাতারাতি ঐশ্বর্যবান হচ্ছে লোক। অপর দিকে দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হচ্ছে। রাজনীতি বেপরোয়া হয়ে উঠছে। হিটলারের অভ্যুদয়ের অনেক আগে ডি, এফ, কাফকাপেনাল কলোনী লিখেছিলেন। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে হিটলার চরিত্রের পুনর্মূল্যায়নের দাবী উঠেছে। এরূপ রচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। প্রশংসা করা হয়েছে হিটলারকে। রাজনীতিতে হিটলার মুসোলিনীর আদর্শ অনুসৃত হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে মূল্যবোধে পুরাতন স্তম্ভটি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনেই। কোন অন্যায়কেই অন্যায় মনে করা হচ্ছে না। ধর্মভিত্তিক মূল্যবোধ প্রতিরোধ করতে পারছে না এই ভাঙ্গনকে। সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে না। সংস্কৃতি ও সভ্যতা লোপ পেয়েছে এমন কথাও বলতে চাই না। কেননা এখনও আমরা টিকে আছি—তবে এ কথা বোধ করি সমাজ সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্রুত অবনতি ঘটেছে। অসামাজিকতার প্রতি যে ভয়াবহ প্রবণতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—পুরাতন মূল্যবোধ কেন সেটা রোধ করতে পারছে না তৎসম্বন্ধে বক্তব্য রাখার স্থান এটা নয়। উপরোক্ত নানা সংঘাতের বিষয় উল্লেখ করার একমাত্র কারণ, এগুলো উপন্যাসের অত্যন্ত ভালো উপকরণ। যুদ্ধকালের ন্যায় যুদ্ধ পরবর্তীকালেও অসংখ্য উপন্যাস রচনা করে চলেছে। শুধু বাণীরূপ দিতে পারলেই হয় এবং ক্রমে ক্রমে বাণীরূপ পাচ্ছেও। যুদ্ধকালের বিষয়বস্তু নিয়ে কয়েকটি ছোট-খাটো উপন্যাস ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে শওকত ওসমানের নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক এবং শহীদ আনোয়ার পাশার রাইফেল কটি আওরত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশেষভাবে ব্যক্তি মানুষের আচরণ তার চেতনা স্রোত এবং মন বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস রচনায়ও কেউ কেউ হাত দিচ্ছেন। আঙ্গিক নিয়েও অনেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলায় দাড়ি কমা প্রভৃতি যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হতো না। দাড়ি কমা প্রভৃতি যতিব্যবহার এবং পরিচ্ছেদ অনুচ্ছেদ প্রভৃতিতে রচনাকে ভাগ করে পাঠককে শ্বাস গ্রহণের সুযোগ না দেয়ার কৌশল পশ্চিম ইয়োরোপের কোন কোন নামজাদা উপন্যাস লেখক বেশ কিছুকাল পূর্বেই প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন। জনৈক বাংলাদেশী লেখক একটি অতি সাম্প্রতিক রচনায় সে কৌশল প্রয়োগ করেছেন।

পূর্বেই বলেছি শিল্পীর উপর নির্দেশ অচল। তার চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ঔপন্যাসিক চরিত্র সৃষ্টি করে চলেন। তখন তিনি জানেন না পরের মুহূর্তে সেটা কি রূপ নেবে। এমন কি পরের বাক্যটি কি হবে তাও সম্ভবতঃ বলতে পারেন না। অতএব কোনরূপ নির্দেশ প্রদানের প্রশ্ন ওঠে না। তবে দেশের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে সকলেই সমর্থ। এ দেশের শতকরা ৮০/৮৫ জনেরও বেশী সংখ্যক লোকের প্রধান জ্বালা পেটের জ্বালা। তার পরের সমস্যা বাসগৃহ, বস্ত্র, রোগ চিকিৎসা ইত্যাদি। অপর দিকে আছেন অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অর্থবিত্ত স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনযাত্রার মান ও প্রণালীতে যারা ইয়োরোপ-আমেরিকার ধনী ও পুঁজিপতিদের সমতুল্য, কিন্তু মানসিকতায় এখন পর্যন্ত মধ্যযুগে বাস করছেন। ঐশ্বর্য ও বিত্ত দিচ্ছে ভোগ-বিলাসের সুযোগ; দিচ্ছে অবসর। ঐ অবসর সময়টা যখন কাটে না তখন নানা জ্বালার সৃষ্টি হয়। সেই জ্বালাকে মুনশিয়ানার প্রকাশ করার নাম মনোবীক্ষণ। বলা বাহুল্য, এ ধরনের জ্বালা সস্থষ্ট এবং শতকরা ৯০ জনের দৃষ্টিতে বিলাস। এই বিলাসকে কেন্দ্র করেও উপন্যাস রচনায় কিছু কিছু চেষ্টা এখানে চলছে; কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ দেশের বর্তমান পরিবেশ এবং সামাজিক অবস্থাধীনে এ ধরনের বিলাস বাস্তবতা-বোধের বিপরীত। সুতরাং না সমাজ চেতনামূলক না সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা-বোধের পরিচায়ক। তা'ছাড়া যে দেশের সবক'টি রাজনৈতিক দল তথা প্রায় সকল মানুষের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ঘোষিত রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যও যেখানে যথাশীঘ্র সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সে দেশের ঔপন্যাসিকের পক্ষে সমাজতন্ত্রের অনুকুল মূল্যবোধ তৈরীর উপযোগী কাহিনী রচনা করাই অধিকতর স্বাভাবিক।

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক পশ্চাতে পড়ে থাকবেন মনে করার কোন কারণ নেই।

[জনপদ—২৬. ৩ ৭৪]

নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ

ও

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিদ্যমান বস্তুর ব্যবহার প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের মধ্যেই যেমন বৈজ্ঞানিকের মৌলিকত্ব তেমনি জানা কিন্তু প্রায় বিস্মৃত বিষয়াদি পুনরায় জনসমক্ষে (হতে পারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে) উপস্থিত করার মধ্যেই কলাবিদের মৌলিকত্ব। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকদের এই বিশেষ আধিপত্যের ক্ষেত্রটিতে আমার অনুপ্রবেশ অনধিকারপ্রবেশ বলে গণ্য নাও হতে পারে।

স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট ১৮৫৯-৬২ সালে বাংলার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর ছিলেন। নীলকরদের বিরুদ্ধে রায়তদের আন্দোলন বহু পূর্ব থেকেই চলছিল—তাঁর সময়ে কুঠিয়ালদের অত্যাচার যেমন চরমে ওঠে রায়তদের আন্দোলনও তেমনি প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হয়। নীলকর সমিতি এতে স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন হয় এবং লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি দাখিল করে। তাদের একটি দাবী গবর্নর সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নেন এবং অন্য দাবীটি যাতে পূরণ হয় তজ্জন্য ১৮৬০ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে তদানীন্তন ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করা হয়। ৩১শে মার্চ তারিখে আইনটি ১৮৬০ সালের ১১ নং আইনরূপে ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদন লাভ করে এবং সেটি যথারীতি জারি করা হয়। এই আইনটির উদ্দেশ্য ছিল "নীল-চাষের চুক্তি বলবৎ করা এবং একটি তদন্ত কমিশন গঠন।"

ইতিমধ্যে অবস্থা প্রায় আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল "আরঙ্গাবাদ মহকুমায় প্রথম প্রথম গোলমাল উপস্থিত হয়। মিস্টার এণ্ড্রুর আনকুরা ফ্যাক্টরি এবং মিস্টার লিয়নের বানিয়াগাও ফ্যাক্টরি লাঠিয়াল এবং রায়তদের

দ্বারা আক্রান্ত হয়।...নীল চাষ প্রতিরোধের জন্য একত্রিত এক জনতা পাবনার জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তার সঙ্গী সামরিক পুলিশ বাহিনীকে পরাজিত করে। তারা পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে।... সরকার এসব রিপোর্ট পাওয়ামাত্র যেসব জেলায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল সেসব জেলায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং প্রয়োজনমত বল প্রয়োগ করে রায়তদের মধ্যে ভীতি বিস্তার করেন। এ উপায়ে সর্বপ্রকার আক্রমণাত্মক বিদ্রোহ প্রশমিত করা হয়"[১]

এদিকে নতুন আইন অনুসারে প্রচুর মামলা-মোকদ্দমা দায়ের হতে থাকে। মে মাসের শেষের দিকে নদীয়া জেলায় এই আইনের মামলার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, দু'জন সদর আমিনকেও চুক্তি ভঙ্গের মামলা নিষ্পত্তির জন্যে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিতে হয়।

ইতিমধ্যে নীল-কমিশনও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় (১) ডব্লিউ. এস. সিটনকার—বাংলা সরকারের সেক্রেটারী—সভাপতি (২) রাজস্ব বোর্ডের সভ্য আর টেম্পল (৩) রেভারেণ্ড জে, সেইল—রায়ত এবং মিশনারীদের প্রতিনিধি (৪) ডব্লিউ এফ ফার্গুসন—নীলকরদেয় প্রতিনিধি এবং (৫) বাবু চন্দ্রমোহন বানার্জি, জমিদারদের প্রতিনিধি রূপে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সমিতি কর্তৃক মনোনীত। ১৮৬০ সালের ১৪ই মে তারিখে এই কমিশনের প্রথম গোপন অধিবেশন বসে। প্রকাশ্য অধিবেশন ১৮ই মে থেকে শুরু হয় এবং ১৪ই আগস্ট তারিখে শেষ হয়। মোট ১৩৪ জন সাক্ষী গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ১৫ জন ছিলেন সরকারী কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন মিশনারী, ১৩ জন দেশীয় জমিদার-তালুকদার, ৭৭-জন রায়ত-স্বত্ববান রায়ত অথবা দখলী স্বত্বে স্বত্ববান রায়ত।[২]

বিলাতে ভারত-সচিবের অনুমোদন লাভ না করায় ১৮৭০ সালের ৪ঠা অক্টোবর উক্ত অস্থায়ী আইনটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ঐ সালের হেমন্তে অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে ওঠে; গবর্নর জেনারেল লর্ড কেনিং মন্তব্য করেন, "এ ব্যাপার এক সপ্তাহ ধরে আমাকে এত বিচলিত করে যে দিল্লীর ঘটনার পরে আমি আর কখনও এত বিচলিত হয়নি। সেদিন

১ Bengal under the Lt Governors. p—188.

২. Ibid. p—188.

থেকে আমার মনে হতো কোন অবিবেচক নীলকুঠিয়াল ক্রোধে অথবা ভয়ে যদি একটি গুলীও কোথাও ছোড়ে তা'লে বাংলা দেশের প্রত্যেকটি নীল-কুঠিরে আগুন লাগবে।" [৩]

স্যার জে. পি. গ্র্যান্ট ১৮৬০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মন্তব্য করেন, "আমি প্রস্তাবিত ঢাকা-রেলপথ সম্বন্ধে—নীলচাষ সম্বন্ধে নয়; তদন্তের জন্ম জলপথে সিরাজগঞ্জে গিয়েছিলাম।...নীলচাষ না করার আবেদন নিয়ে বিভিন্নস্থানে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হতে থাকে। কয়েকদিন পরে আমি যখন ফিরছি তখন প্রায় ৬০।৭০ মাইল দীর্ঘ নদী পথের দু'তীর লোকে লোকাকীর্ণ হয়ে যায়। সব গ্রামবাসী। তারা এ-ব্যাপারে সুবিচার প্রার্থনা করছিল। স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকেরাও জমায়েত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ নরনারী এবং শিশুদের এ-সমাবেশ বিনা কারণে ঘটেছিল এরূপ ধারণা করা অত্যন্ত বোকামীর পরিচায়ক হবে। দেশের একটি বিরাট অঞ্চল জুড়ে একই সময়ে এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ গণ-বিক্ষোভের পিছনে যে সংগঠনশক্তি ক্রিয়া করছে তার গুরুত্ব বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।" [৪]

এ সময়ে জনরব ওঠে যে, অক্টোবর মাসে রায়তেরা নীল বুনায় বাধা সৃষ্টি করবে। সরকার সম্ভাব্য এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে নদীয়া ও যশোহর জেলার নদীগুলোতে টহল দিয়ে ফেরার জন্ম দু'টি ছোট রণতরী (gun-boat) এবং জেলাগুলোর সামরিক পুলিশ-বাহিনী অধিকতর শক্তিশালী করার জন্ম দেশীয় পদাতিক বাহিনী প্রেরণ করেন। অক্টোবরের শেষের দিকে ফরাজীদের আবাসভূমি ফরিদপুরেও গোলযোগ দেখা দেয়। [৫]

নীল চাষ করে চাষী কি পেতো তার বিবরণ নীল-কমিশনের রিপোর্ট থেকে যা জানা যায়, তা এরূপ ঃ

> নীলকরদের মতে প্রতি বিঘায় ৮-৯ অথবা ১০ বোঝা নীল উৎপাদিত হয়। গড়ে পাঁচ-ছ' বোঝার দাম দেওয়া হয় ১ টাকা; খুব বেশী দিলে চার বোঝায় ১ টাকা—

---

৩. Ibid—p. 192.

৪. Ibid—p. 192.

৫. Ibid —p 193.

> অর্থাৎ এক বিঘা জমিতে নীল চাষ করার মূল্য হয় মাত্র দু'টাকা ; তার মধ্য থেকে বীজ সরবরাহ বাবৎ চার আনা থেকে আট আনা, চার থেকে আট আনা স্ট্যাম্পের দাম এবং চার থেকে সাত এমন কি ক্ষেত্রবিশেষ তেরো আনা পর্যন্ত গাড়ীভাড়া কেটে নেওয়া হয়। মিঃ লারমোর (Larmour) প্রমাণসিদ্ধ দলিল দিয়ে দেখান যে, ১৮৫৮-৫৯ সালে মোট ৩৩,২০০ নীলচাষীর মধ্যে মাত্র ২,৪৪৮ জন নগদ—কিছু না কিছু পায়।[৬]

বাবু জয়চাঁদ পাল চৌধুরী ছিলেন মস্তবড় জমিদার। তাঁর নিজের ছিল বত্রিশটি নীলকুঠি ; আরো নয়টিতে তিনি অংশীদার ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, "বিগত কুড়ি বছর ধরে রায়তেরা যদি নীল চাষ করতে না-ই চেয়ে থাকে তবে এদ্দিন এ-কৃষি চালানো হলো কেমন করে?" উত্তরে তিনি বলেন, 'নানা প্রকার অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা দ্বারা এবং বল-প্রয়োগ করে, রায়তদিগকে গুদামে অর্গলাবদ্ধ রেখে, তাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে এবং পিটিয়ে।"[৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই নীলকর সাহেবদের "গঠনমূলক কার্যা-বলীরই" প্রশংসা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

বাংলা দেশের যখন এ-অবস্থা, তখন রায় দীনবন্ধু মিত্র "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করেন। পুস্তকটি ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (শকাব্দ ১৭৮২, ২রা আশ্বিন) ঢাকা থেকে মুদ্রাকর শ্রী রামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক "বাংলা যন্ত্রে" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০ + ৶। নাম-পৃষ্ঠায় দীনবন্ধু মিত্রের নাম ছিল না।

বাংলা ১২৩৮ সালে পশ্চিম বাংলার কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটবর্তী চৌবেড়িয়া নামক স্থানে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। দীন-বন্ধু হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করার পর মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে পাটনার পোস্টমাস্টারের চাকরি গ্রহণ করেন। দেড় বছর

৬ এবং ৭. Ibid—p 252

পরে পদোন্নতি লাভ করে তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইনসপেকটিং পোস্ট-মাস্টার নিযুক্ত হন। সেখান থেকে তিনি প্রথমে নদীয়া এবং পরে ঢাকা বিভাগে বদলী হন। "এই সময়ে নীল বিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে "নীলদর্পণ" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করেন।"[৮]

দীনবন্ধু-সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

> দীনবন্ধুর এই দু'টি গুণ (১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি, তাঁহার কাজের গুণ-দোষের কারণ—যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিস্ফল হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার প্রধান নায়ক-নায়িকা তাঁহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহা তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল ; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা, চরিত্র ও ভাষা উভয় বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক ও সর্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিস্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব।—যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশীপের পাত্রী নহে—যথা সৌরিন্ধ্রী—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই।
>
> দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার এমন নাটক (নীলদর্পণ) প্রণয়ন।

৮. বঙ্কিম চন্দ্র—দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী।

> নীলকরের তৎকালিক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন।…তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির ফলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনিমুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাংলার Uncle Tom's Cabin…।[৯]

উপরে বর্ণিত নীল চাষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক বাংলা 'নীলদর্পণের' এই যথাথ মূল্যায়নকে পশ্চাদ্ভূমি হিসাবে স্মরণ রেখেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক অনূদিত বলে কথিত ইংরেজী "The Indigo Planting mirror"-এর বিচার করতে হবে। নীলদর্পণ ইংরেজী অনুবাদ করার কারণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত এবং অবমানিত হয়েছিলেন এবং সুপ্রিম কোর্টের চাকরি পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তাঁর এ-দাবীর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে সময়ে সুপ্রীম কোর্টে চাকরি করতেন না, চাকরি করতেন পুলিশ কোর্টে। তাঁর কাজ ছিল দোভাষীর এবং ১২০ টাকা বেতন পেতেন। মিস্টার টাকার নামক এক ব্যক্তি পুলিশ কোর্ট থেকে স্মল কস কোর্টের চাকরিতে চলে গেলে পদটি খালি হয়। এ-চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরী চাঁদ মিত্র। দ্রষ্টব্য ভোলানাথ চন্দ্রের স্মৃতিকথা: বাবু গৌরদাস বসাককে ২, ৯, ১৮৯৪ তারিখে লিখিত পরিশিষ্ট, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত — যোগীন্দ্রনাথ বসু)।

এ-সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু বলেন, "১৮৬০ সালের শেষে যখন মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় আসি, তখন সেই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে হেড ক্লার্কের কাজ করিতেছেন।" দ্রষ্টব্য: বাবু রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক

৯. বঙ্কিমচন্দ্র—দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩-র ১৯-এ পৌষ তারিখে বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পত্র।)

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে মে মাসে বাবু গৌরদাস বসাক যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখেন :

> When in 1855 his paternal house at Kidderpur became the subject of dispute...I felt the necessity of having Madhu up here atonce ..As soon as he alighted from the steamer he ran to me ...He had not a pice in his pocket. It was, therefore, absolutely necessary that some provision should be made for him. .I asked Kishory who appreciated his genius and who was then the junior Magistrate of Calcutta Northern Divn, to use his best efforts to help Madhu by securing for him some employment. The post of Interpreter in his court soon after fell vacant and Madhu was given the appointment.

বাবু গৌরদাস বসাকের পরামর্শেই যে, পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়—প্রতাপ চন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ—মধুসূদনকে রত্নাবলী নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করার কার্যে নিযুক্ত করেন, তিনি তাঁর পত্রে এ-কথারও উল্লেখ করেন।

১৮৬০ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৬২ সালে মধুসূদনের বিলাত গমন সময়ের মধ্যে তাঁর নিজের লিখিত পত্রাদিতে তিনি তিলোত্তমা রচনা ও মুদ্রণ, মেঘনাদ বধ রচনা এবং শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী সম্বন্ধে বহু কথা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। ১৮৬২ সালের ৪ঠা জুন তারিখে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে যে পত্র লিখেন সেটিই সম্ভবতঃ তাঁর বিলাত যাওয়ার পূর্বে লিখিত শেষ পত্র। সে-পত্রে তিনি ৯ই জুন তারিখে Candida জাহাজ যোগে বিলাত যাত্রার কথা জানাচ্ছেন।

১৮৬০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে লিখিত রাজনারায়ণ বসুকে

লিখিত তাঁর পত্রের সংগে তিনি "invocation of my মেঘনাদ" প্রেরণ করছেন। এবং তারপরে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট লিখিত তাঁর প্রায় প্রতিটি পত্রেই তিনি যে "মেঘনাদ" রচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে-ছেন সে কথার উল্লেখ আছে।

১৪. ৭. ১৮৬০ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রে তিনি বলছেন:

> There never was a fellow more madly after the muses then your poor friend. Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghnad. If you do, I shall begin to rave The muses before every-thing is my motto. It won't cost you more than a couple of nights to get over it. I am anxious that the work should be finished by the the end of the year.

(দ্রষ্টব্য: মধুস্মৃতি—নগেন সোম: ৬০৩ পৃষ্ঠা) এই পত্রেই তিনি জানাচ্ছেন "I have nearly done one half of the second Book of Meghnad"। ৩,৮, ১৮৬০ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রে তিনি জানাচ্ছেন I mean to extend it to ৭ সর্গs"
১৮৬০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কেশব চন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখছেন:

"But I must finish my Meghnad."

কিছুদিন পরে লিখিত একটি পত্রে তিনি জানাচ্ছেন:

"Kissen Cumari was finished two days ago. Begun 6th august finished 7th sept—rather quick work, old fellow."

এই পত্রের এক জায়গায় নাটকটি অভিনয় ব্যাপারে "ছোট রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি কেশব গাঙ্গুলীকে অনুরোধ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলছেন: "Take Denoo mea with you"

১৬ই জানুয়ারী ১৮৬১ সালে কেশব গাঙ্গুলীকে লিখিত পত্রে তিনি জানাচ্ছেন: "The first five books of Meghnada are ready" অথাৎ মেঘনাদ বধের মুদ্রণকার্য তখন শেষ হয়েছে।

১৮৬১ সালের ১৯শে জুন তারিখে লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর স্যার জে. পি.

গ্র্যাণ্ট যে বিবরণী গভর্ন'র জেনারেলের কাছে প্রেরণ করেন তার মধ্যে তিনি লিখেন ঃ "ভূতপূর্ব সেক্রেটারীর অসাবধানতাজনিত ভুলে ব্যাপারটা ঘটে। কয়েক মাস পূর্বে মিস্টার সিটন কার আমাকে জানান যে, একটি অদ্ভুত বাংলা নাটক রচিত হয়েছে, যার বিষয়বস্তু নীল। এটি একটি খাঁটি দেশীয় রচনা। কোন দেশীয় লোক দ্বারা এর ইংরেজী অনুবাদ করানো যেতে পারে এবং অতি সামান্য খরচে কিছুসংখ্যক কপি মুদ্রণ করা যায়। কতকটা কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে এবং এ-বিষয়ে জনসাধারণের মনোভাব নিরূপণের জন্য আমি পুস্তকটি দেখতে চাই। আমি এও ভেবেছিলাম যে, সাহিত্যমূল্য ছাড়াও আমি যে উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুস্তকটি দেখতে চেয়েছিলাম, এর অনুবাদ বন্ধুস্থানীয় সরকারী এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরিত হলে, তারাও আমার উদ্দেশ্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। ... মিস্টার সিটন কারও আমার সঙ্গে একমত হন। আলোচনা শেষে আমি ভেবেছিলাম যে, এ-পুস্তকের অনুবাদ ও কিছুসংখ্যক কপি মুদ্রণ নিতান্তই বেসরকারী ব্যাপার থাকবে।

"পরেশনাথে আমার কাছে পরিচয় লিপি ব্যতিরেকে প্রেরিত পুস্তকটির একটি মুদ্রিত কপি প্রেরণের পূর্বে আমি এ-বিষয়ে আর কোন কথা শুনেছি বলে মনে হয় না।"

"পুস্তকটি সরকারীভাবে বিতরিত হবার পর যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার পূর্বে আমার সঙ্গে সেক্রেটারীর সাক্ষাৎ হয়। তখন বুঝতে পারি, সেক্রেটারী ভেবেছিলেন যে, সরকারী ব্যয়ে এর অনুবাদ হবে। আমি তার এ-ভুল সংশোধন করি। আমি এও দেখতে পাই যে, পুস্তকটি ইতিমধ্যেই সরকারীভাবে বিতরণ করা হয়ে গেছে। এ-ভুল সংশোধন করার আর কোন উপায় ছিল না।"[১০]

The Indigo Planting Mirror ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে C. H. Manuel কর্তৃক Printing and Publishing press ১০ নং ওয়েলেসলী স্ট্রীট থেকে প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ দেওয়া না হলেও অনুমান করা চলে যে, হয় ১৮৬১ সালের প্রথম দিকে অথবা ১৮৬০ সালের শেষ তিন মাসের মধ্যে পুস্তকটি অনূদিত হয়, কেননা ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জুন

১০. Bengal under the Lt Governors pp 198—199.

তারিখে গভর্নর বলছেন যে, "কয়েক মাস পূর্বে" সেক্রেটারী সিটন কার পুস্তকটি অনুবাদের অনুমতি তাঁর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। মুদ্রণ সম্বন্ধেও এ-কথা জোরের সাথেই বলা চলে যে, ১৯শে জুন তারিখের বেশ কিছুকাল পূর্বেই কার্যটি সাধিত হয়েছিল; কেননা পুস্তকটি বিতরিত হবার পরে আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার পরে গভর্নর তাঁর উল্লিখিত বিবরণী ১৯. ৬. ১৮৬১ তারিখে লিখেন। মুদ্রণের জন্যেও অন্ততঃপক্ষে দু-চার মাস সময় ব্যয় হয়েছিল এ-অনুমান করাও অসঙ্গত হবে না।

উপরে যেসকল চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছি তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যেটা নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদকাল, সে সময়ে মধুসূদন একান্তভাবে মেঘনাদ বধ কাব্য রচনায় নিরত ছিলেন। পুলিশ কোর্টের চাকরিও তখন তাঁর আছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৮৫৬—১৮৬২ সালের মধ্যে মধুসূদন কর্তৃক বন্ধু-বান্ধবদের কাছে লিখিত পত্রাদিতে তাঁর নীলদর্পণ ইংরেজী অনুবাদের কথা আদৌ উল্লেখ নেই। এমন কি ১৮৬২ সালে বিদেশ যাওয়ার পরে বিলাত ও ফ্রান্স প্রভৃতি স্থান থেকে দেশের বিভিন্ন লোককে লিখিত কোন পত্রেও এ-বিষয়টির উল্লেখ নেই। যাঁরা মধুসূদনের জীবনী লেখার মাল-মসলা যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং নগেন্দ্রনাথ সোমকে সরবরাহ করেছিলেন তাঁরা কেউ মৌখিক কিংবা তাঁদের চিঠিপত্রে আলোচ্য অনুবাদের কথা উল্লেখমাত্র করেন নি। মধুসূদনের অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তাঁর কোন লেখায় বা চিঠিতে এ-অনুবাদের উল্লেখ নেই। গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখার্জি, বঙ্কু বিহারী দত্ত, লাল বিহারী বসাক, দীননাথ ধর, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাসবিহারী মুখার্জি, রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ কোন ব্যক্তিই মধুসূদন কর্তৃক নীলদর্পণ অনুবাদের কথা বলেন নি।

নীলদর্পণ অনুবাদ করার অপরাধে মধুসূদন তিরস্কৃত হন এবং তিনি সুপ্রীম কোর্টের চাকরি হারান বলে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি নীলদর্পণ অনূদিত হওয়ার সময়ে মধুসূদন সুপ্রীম কোর্টে চাকরি করতেন না; চাকরি করতেন পুলিশ কোর্টে। বিলাত থেকে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রায় তিন বৎসরকাল হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করার পর ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে মধুসূদন প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড কাচ কর্তৃক "হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিল আপিলের

অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের" পদে নিযুক্ত হন। এই নিযুক্তি সম্বন্ধে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৩ জুন তারিখের "The Englishman" পত্রিকায় নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

> The appointment of Mr. M. S. Datta, Barristar-at-law, to the post of Examiner of the Privy Council Records in the High Court appears from every point of view quite unobjectionable. The duties pertaining to this office are of great importance, and can only adequately be discharged by an officer of approved ability and high professional character. A better choice could hardly have been made, nor would it be easy to find another Native gentleman so thorougly intimate with the English language.

মধুসূদনকে লিখিত তাঁর আসাম-প্রবাসী এক আত্মীয়ের পত্র থেকে জানা যায়, ভদ্রলোক ২৪. ৬. ১৮৭০ তারিখ সন্ধ্যায় খবরের কাগজে তাঁর "Chief Examiner of the Privy Council papers" পদে নিযুক্তির সংবাদ দেখতে পান। এ থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঐ সালের জুন মাসের প্রথম দিকেই তিনি এ-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১১] সুতরাং "নীলদর্পণ" অনুবাদের জন্য তিরস্কৃত এবং সুপ্রীম কোর্টের চাকরি হারানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এ-কথা ঠিক যে, বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে এ্যাডভোকেট হিসাবে হাইকোর্টের সনদ পেতে মধুসূদনকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মধুসূদন সনদ পাওয়ার জন্য প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নস পিককের নিকট আবেদন করেন। সম্ভবতঃ মধুসূদন দেশীয় লোক বিধায় তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে হাইকোর্টের জজদের মধ্যে মিস্টার জষ্টিস এ. জি. ম্যাকফারসন, মিস্টার জষ্টিস নরম্যান, এবং মিস্টার জষ্টিস ফীয়ার নানা প্রকার বিরূপ মন্তব্য করেন। মিস্টার জষ্টিস ম্যাকফারসন আরো অভিযোগ করেন যে, দোভাষী হিসাবে পুলিশ কোর্টে চাকরি করার কালের রিপোর্টও তাঁর ভাল নয়। তিনজন জজের আপত্তির ফলে

১১. মধুস্মৃতি—নগেন সোম, পৃষ্ঠা—৩১৮—৩২৩।

মধুসূদন সে-যাত্রা এ্যাডভোকেটের সনদ লাভে বঞ্চিত হন। এ-ঘটনা ৪. ৪ ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ঘটে। মধুসূদন ২৫. ৪. ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে হাইকোর্টে কতকগুলো সুপারিশপত্র দাখিল করেন। এই সুপারিশ পত্রগুলো পাওয়ার পর তিনি সনদ পান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ সিটন কা'র বাঙ্গলা সরকারের সেক্রেটারী হিসাবে নীলদর্পণ "জনৈক নেটিভ" দ্বারা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। তিনি তখন হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তিনি আগাগোড়া মধুসূদনের সনদ-প্রাপ্তির পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।[১২]

জজদের মধ্যে যারা মধুসূদনের সনদপ্রাপ্তির বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন; নীলদর্পণ ইংরেজীতে অনুবাদ করার অভিযোগ করেন নি। নীলদর্পণ অনুবাদের তখন প্রায় সাত বৎসর-কাল অতিক্রান্ত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মধুসূদন কর্তৃক সম্পন্ন এমন একটি ইংরেজ বিরোধী কর্মের কথা আপত্তি উত্থাপনকারী জজেরা জানতেন না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত।

নীলদর্পণ ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে মিস্টার সিটন কার যথেষ্ট নাজেহাল হয়েছিলেন। এ-অপরাধের জন্য তাঁকে "Englishman" পত্রিকায় প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। ১৮৬১ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে তিনি বঙ্গীয় সরকারকে এ-বিষয়ে একটি পত্র লিখে এ-ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব বিশ্লেষণ করেন। এই পত্রে তিনি বলেন "যেসকল দেশীয় পুস্তক-পুস্তিকায় সাধারণের মনোভাব প্রতিফলিত হয় সেগুলোর দৃষ্টি প্রতি আকর্ষণ করা আমার কর্তব্য; এ-জ্ঞানেই আমি এ রচনাটির বিষয় লেফটেনাণ্ট গভর্নরের কাছে উল্লেখ করি। লেফটেনাণ্ট গভর্নর এবং আরো অনেকে নাটকটির অনুবাদ দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। মিঃ লঙ্গ আমাকে জানান যে, জনৈক দেশীয় লোক এটি অনুবাদ করতে রাজী আছেন। সুতরাং আমার মঞ্জুরিতে এটি অনুবাদ করা হয়।"

"এ পর্যন্ত এ-ব্যাপারে আমি যাবতীয় কাজ লেফটেনাণ্ট গভর্নরের গোচরে এবং তার মঞ্জুরি নিয়েই করেছিলাম। অনুবাদ করানো এবং মুদ্রণে তাঁর

১২. মধুস্মৃতি—নগেন সোম, পৃষ্ঠা—১৬৮—১৬৯।

সম্মতি ছিল ; কিন্তু ৫০০ শত কপির মতো একটা বিপুল সংখ্যা মুদ্রিত হোক, লেফটেনাণ্ট গভর্নর তেমন অভিলাষ কখনও ব্যক্ত করেন নি। তিনি সম্ভবতঃ অল্পসংখ্যক পুস্তক মুদ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন।"[১৩]

অতঃপর মিস্টার সিটন কার জানাচ্ছেন যে, পুস্তকটির অনুবাদ শেষ হবার পর মিস্টার লঙ্গ তাঁকে কতকগুলো নাম দেন। তার সঙ্গে তিনি নিজেও কতকগুলো নাম যোগ করেন। পুস্তকগুলো তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের কাছে সরকারী মোড়কে প্রেরিত হয়। এই প্রেরণ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজ দায়িত্বে এবং জ্ঞাতসারে হয় ; লেফটেনাণ্ট গভর্নর তার বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না। এই বিবৃতির উপসংহারে মিস্টার সিটন কার তার অসাবধানতামূলক ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মিস্টার লঙ্গের বিরুদ্ধে আনীত মামলার রায় ২৫শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত হয়। ঐ তারিখেই মিস্টার কার তাঁর আইনসভার সদস্যপদ এবং বাংলা সরকারের সেক্রেটারীর পদে ইস্তফা দেন।

কিন্তু লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যার জে. পি. গ্রাণ্ট তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে আপন মন্তব্যসহ গভর্নর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করেন। লেফটেনাণ্ট গভর্নর মিস্টার কারকে তাঁর পদে বহাল রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন ; কিন্তু সপারিষদ গভর্নর জেনারেল ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তারিখে এ ব্যাপারে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবে মিস্টার সিটন কারকে আইন সভার সভ্য এবং বাংলা সরকারের সেক্রেটারী এই দুই পদ থেকেই অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ ব্যাপারে ১৮৬১ সালের ২০শে জুন তারিখে পাদ্রী লঙ্গ সাহেবের একটি বিবৃতিও প্রকাশিত হয়। এ বিবৃতিতে তিনি অনুশোচনা প্রকাশ করে বলেন যে, "অনুবাদে পুস্তকটির স্থূল অংশগুলো হয় বাদ দেওয়া হয়েছিল অথবা পরিবর্তন করে অপেক্ষাকৃত মার্জিত করা হয়েছিল। তারপরেও যে-সব আপত্তিজনক অংশ রয়ে গেছে তা অসাবধানতার ফল।"[১৪] কিন্তু এই অনুশোচনা প্রকাশ সত্ত্বেও পাদ্রী লঙ্গ রেহাই পান নি। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে মুদ্রাকরকে জরিমানা করা হয় এবং পাদ্রী লঙ্গকে ১,০০০. এক হাজার

১৩. Bengal under the Lt. Governors pp. 199—200.

১৪. Bengal under the Lt. Governors PP. 205—206.

টাকা জরিমানা এবং এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। (২৪শে জুলাই ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ)।

প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখযোগ্য যে, নীলদর্পণের এই ইংরেজী অনুবাদটি বিলাতে পার্লামেণ্টের সভ্য এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে প্রেরণ করা হয়। ভারত-সচিবের অফিসে কুড়িটি পুস্তক পৌঁছে। ভারত-সচিব মিস্টার সিটন কারকে বাঙলা সরকারের সেক্রেটারীর পদে যোগদান করতে না দেওয়ার ব্যাপারে একমত হলেও তাঁর মতো একজন "যোগ্য এবং প্রখ্যাতনামা লোককে অন্য কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে" বহাল করার সুপারিশ করেন। ফলে মিস্টার সিটন কার হাইকোর্টের জজ এবং পরে ভারত-সরকারের বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।[১৫]

যে নীলদর্পণ ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে মিস্টার সিটন কারকে এতখানি নাজেহাল হতে হয়েছিল, তার অনুবাদক যদি সত্যসত্যই মধুসূদন হতেন তবে তাঁর প্রতি মিস্টার কারের বিশেষ প্রসন্ন থাকার কথা নয়।

তা'ছাড়া প্রধান বিচারপতি পীকক এবং বিচারপতি গ্রোভারও তার সনদপ্রাপ্তির পক্ষে অমিভত প্রকাশ করেন। বিচারপতি পিটার্স'ন মধুসূদনের মদ্যাসক্তি এবং বদ-মেজাজের কথা উল্লেখ করলেও সনদপ্রাপ্তির অনুকুলে ছিলেন। মোটকথা বিচারকদের মধ্যে কেউ তাঁর নীলদর্পণ অনুবাদ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি; যদিও এ-বিষয় না জানার এবং উত্থাপন না করার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না; কেননা এ-নিয়ে শুধু কলকাতার শেতাঙ্গ মহলেই তুমুল হৈ-চৈ হয় নি, বিলাতেও যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ ১৮৬২ সালেই অনুবাদটির প্রথম বিলাতী সংস্করণের প্রকাশ। একজন শেতাঙ্গ পাদ্রী এবং মুদ্রাকরের কারাদণ্ড ও জরিমানাও শেতাঙ্গ মহলের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তা'ছাড়াও জজ হিসাবে মিস্টার সিটন কারের পক্ষে তাঁর সঙ্গী জজদের কাছে এ-তথ্য ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার সময়ে ব্যক্ত করা অস্বাভাবিক ছিল না। মিস্টার সিটন কার অনুবাদকের নাম-ধাম ও পরিচয় আদৌ জানতেন না এরূপ অনুমান করাও সঙ্গত হবে বলে মনে হয় না; কেননা পাদ্রী লঙ এবং মিস্টার সিটন কারের মধ্যে সদ্ভাব ছিল এবং

১৫. Bengal under Lt. Governors pp. 205—206.

পাদ্রী লঙের পক্ষে অনুবাদকের নাম মিঃ সিটন কারের গোচরে আনাই স্বাভাবিক ছিল।

Englishman পত্রিকা নীলদর্পণ ইংরেজী অনুবাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ছিল। বস্তুতঃ এ পত্রিকাটি ছিল নীলকরদের অনুগ্রহপুষ্ট। সুতরাং যদি মধুসূদনই পুস্তকটির অনুবাদক হতেন তবে পত্রিকাটি মধুসূদনের Examiner of Privy Council Records পদে নিযুক্তিতে পুলকিত হতেন না; এ নিযুক্তির বিরোধিতা করাই বরং তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। দশ বৎসরের মধ্যেও Englishman পত্রিকা অনুবাদকের নাম জানতে পারে নি, এরূপ অনুমান করা কঠিন।

পাদ্রী লঙ এবং মিস্টার সিটন কারই ছিলেন নীলদর্পণ ইংরেজীতে অনুবাদ করানোর ব্যাপারে উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তা। তাঁদের বিবৃতি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নীরবতা এবং ১৮৭০ সালে মধুসূদনের Examiner of Privy Council Records পদে নিযুক্তিতে Englishman পত্রিকার সন্তোষ প্রভৃতি বিষয় থেকে দুটি জিনিস প্রমাণিত হয়। এক ঃ মধুসূদন দত্তই যে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন— তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণসিদ্ধ দলিল নেই। জনৈক দেশীয় লোক পুস্তকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন পাদ্রী লঙ এবং মিস্টার কার শুধু ঐ-কথাই বলছেন। সেই দেশীয় লোক মধুসূদন দত্তকেই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। মামলা চলাকালে বরং বিপক্ষের কৌসুলী এবং কোন একজন বিচারপতি মিস্টার লঙকেই পুস্তকটির অনুবাদক বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। মিস্টার লঙ ভাল বাংলা জানতেন। তিনি বহু প্রচারমূলক পুস্তক বাংলায় লিখেছিলেনও। কিছু কিছু বাংলা পুস্তক তিনি ইংরেজীতে অনুবাদও করেছিলেন। অবশ্য এ-সন্দেহের মূলে কোন সত্য আছে এরূপ দাবী আমরা করি না। ইংরেজী অনুবাদের সাথে পাদ্রী লঙের লিখিত যে ভূমিকাটি প্রকাশিত হয় তাতেও "জনৈক দেশীয় লোক এর অনুবাদ করেছেন" বলা হয়। দুই : অনুবাদের সর্বত্র মূলের অনুসরণ করা হয় নি এবং গ্রন্থটির ইংরেজী যে উঁচুদরের নয় তা ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত না হয়েও বলা চলে। অথচ মধুসূদন যে ইংরেজের মতো ইংরেজী জানতেন তার অন্যান্য লেখাই শুধু তার প্রমাণ নয়, এ-সম্বন্ধে Englishman পত্রিকার স্বীকৃতিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মধুসূদন ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মধুসূদনের সাহিত্যখ্যাতির কাল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য খ্যাতির কাল এক এবং অভিন্ন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মাইকেলের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাইকেল বহু লোকের কাছে পত্র লিখেছেন, তার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। দু'জনের মধ্যে যে পরিচয় ছিল এমন আভাসও কোথাও নেই, বন্ধুত্ব তো দূরের কথা। সুতরাং যে সংবাদ মধুসূদনের পরিচিত বন্ধু-মিত্রের মধ্যে কেউ আমাদের দেন নি, বঙ্কিমচন্দ্র তা কেমন করে জানবেন এ-প্রশ্ন স্বভাবতঃই উদয় হয়। এবং বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত কিছু তথ্য যে ভুল, তা উপরের বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির স্বপক্ষে বলা চলে যে, সমসাময়িক লোকের বক্তব্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না; কিন্তু সম-সাময়িক ব্যক্তি মাত্রেই তার সমস্ত সম-সাময়িক ব্যক্তির জীবনের সকল তথ্য অবগত থাকবেন এ-যুক্তি অচল। বঙ্কিমচন্দ্র গুজবও লিখে গেছেন পরে। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র যে গুজবই লিখছেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা'' নামক রচনাটি ''দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর'' ভূমিকারূপে ১২৮৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মধুসূদনের মৃত্যুর চার বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে জানালেন যে, মধুসূদন ছিলেন নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোষণাটি এই: ''ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁর জীবন-নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।''[১৬] বঙ্কিমচন্দ্র যে ''শুনিয়াছি''-র উপরও নির্ভর করতেন বা করেছিলেন এ উদ্ধৃতি তার প্রমাণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নীলদর্পণ সম্পর্কিত মামলার নয় বছর পরে মধুসূদন হাইকোর্টের চাকরিতে নিযুক্ত হন। সুতরাং নীলদর্পণ অনুবাদ করার অপরাধে তাঁর চাকরি যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। মাত্র কয়েক বছর আগে এবং নিজের জীবনকালের

১৬. বঙ্কিম রচনাবলী: পৃষ্ঠা—৮২০, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ।

মধ্যে ঘটা ঘটনার এমন ভুল তথ্য যিনি পরিবেশন করতে পারেন তার কোন বিবৃতির উপর নির্ভর করা যায় কি ?

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাংলা ১২৩৮ অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। সুতরাং তিনিও সাহিত্য জীবনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসাময়িক। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা এবং মধুসূদন দত্তের সাহিত্য প্রতিভা একই সময়ে বিকশিত হয়। কিন্তু মধুসূদন কোন চিঠিপত্রে, কিংবা তাঁর নিকট-বন্ধু রাজনারায়ণ বসু, গৌর বসাক প্রমুখ ব্যক্তি দ্বারা লিখিত চিঠিপত্রে দীনবন্ধু মিত্রের নাম কোথাও উল্লিখিত নেই। যাঁর পুস্তকটি মাইকেল অনুবাদ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোন কৌতুহলই মধুসূদনের মনে জাগল না এটাইবা কেমন কথা! আর পরিচয় থাকলে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট চিঠিপত্রে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে আদৌ কোন উল্লেখই-বা কেন তিনি করলেন না, তা-ও দুর্বোধ্য। কেশব গাঙ্গুলীকে লিখিত পত্রে যে 'Denoo mea'-র উল্লেখ আছে তিনিই যদি দীনবন্ধু মিত্র হন তা'হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

এখন আমরা অনুবাদটি বিচার করে দেখার চেষ্টা করব। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, আমি ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত নই—কোন অ-ইংরেজই তা নয়; সুতরাং যে-সব জায়গায় আমার বিবেচনায় অনুবাদ সাবলীল অথবা শুদ্ধ নয়, কোন মন্তব্য না করে তার একটি বিবরণীমাত্র লিপিবদ্ধ করেই আমার কাজ সমাধা করব। এ বিবরণী তৈরী করতে আমি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' কর্তৃক "১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে" পুনর্মুদ্রিত "নীলদর্পণ" এবং কলকাতার ৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে "ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী" কর্তৃক ১৯০৩ সালে এ. এন. আন্দিনী কোম্পানী প্রকাশিত "The Indigo planting Mirror"-এর দ্বিতীয় ভারতীয় সংস্করণ থেকে পুনর্মুদ্রিত "Nil Darpan or the Indigo planting Mirror" পুস্তকদ্বয় ব্যবহার করেছি। এ. এন. আন্দিনী কোম্পানী প্রকাশিত দ্বিতীয় ভারতীয় সংস্করণ প্রথম ভারতীয় সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ কিনা, তার নিশ্চয়তা প্রদান করা লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। ১৮৬২ সালে লণ্ডন থেকে সিম্পকিন মার্শাল এণ্ড কোং পুস্তকটির যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন, তা পরীক্ষা করে দেখার সৌভাগ্যও আমার হয় নি। প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখযোগ্য যে, ইস্টার্ন

ট্রেডিং কোম্পানী প্রকাশিত Nil Darpan or The Indigo planting Mirror" ও দ্বিতীয় ভারতীয় সংস্করণ থেকে হুবহু পুনর্মুদ্রণ নয়। সম্পাদক সুধী প্রধান মহাশয় পুস্তকটির ইংরেজী বহুস্থানে শুদ্ধ করেছেন, এবং যে-সকল স্থানের অনুবাদ ছিল না, অথচ অনুবাদ থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেছেন, সে-সকল স্থান নিজে অনুবাদ করে দিয়েছেন। এই সংশোধন এবং পরিবর্তনের একটি তালিকাটির পরিশিষ্টে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বিবরণী ঐ তালিকও পুস্তকটির পরিশিষ্টে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বিবরণী ঐ তালিকার সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং সম্পূর্ণই আমার নিজের। অর্থাৎ সুধী প্রধান সম্পাদিত এবং সংশোধিত সংস্করণেও যে-সব বিভ্রান্তি রয়ে গেছে বলে আমার ধারণা, আমি সেগুলোই লিপিবদ্ধ করেছি।

বিবরণীতে বাঁ দিকে 'নীলদর্পণ'-এর বাংলা এবং ডান দিকে ইংরেজী দেওয়া হল :

পৃষ্ঠা ৫ দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না।

P 3. We can not bear to turn our eyes in the southern direction towards the house of the heads of the villages (Mandal)

পৃষ্ঠা ৫. দু'বেলায় ৬০-খান পাত পড়তো।

P 3. About sixty men used to make a daily feast in the house.

পৃষ্ঠা ৬ কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড় দৌড়ের মাঠ।

P 3. As to the court-yard it was crowded like as at the horse races

পৃষ্ঠা ৬. যখন আসধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্ম-ফুল ফুটে রয়েছে।

P 3. When they used to arrange the ricks of corn it appearred, as it were, that the lotus had expanded itself on the surface of a lake bordered by sandal groves.

পৃষ্ঠা ৬. গোয়ালখানা ছিল যেন একটি পাহাড়।

P 3. The granary was as large as a hill.

পৃষ্ঠা ৬. মেজো সেজো দু'ভাইকে।

P 4. Majo & Seju Babus

পৃষ্ঠা ৭. তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।

P 4. shall make you eat your rice in the factory godown.

পৃষ্ঠা ৭. অন্ন বিনাই মারা যেতে হবে।

P 5. Then we shall die without rice crops.

পৃষ্ঠা ৭. সম্বৎসর।

P 5. Every year through.

পৃষ্ঠা ৭. বেতন।

P 5. hire

পৃষ্ঠা ৮. নাছোড় হইলে হাত কি ?

P 5. অনুবাদ করা হয় নি।

পৃষ্ঠা ৮ এ-ভিটায়।

P 6. In this land.

পৃষ্ঠা ৯. আমিন সুমুন্দি।

P 6. The stupid Amin

পৃষ্ঠা ৯. বচ্ছোর যাবে কেমন করে।

P 7. How shall I pass the year.

পৃষ্ঠা ১০. দু'কাটা চালের খরচ।

P 7. Two recas (nearly 5 lbs).

পৃষ্ঠা ১০. দুই এক বিঘা নোনা যেলা।

P 7. Which are become saltish.

পৃষ্ঠা ১০, সে স্‌ঙ্গে এসেছি।

P 7-8 Punished him with saying

পৃষ্ঠা ১০ ফৌজদুরি করবো।

P 8 I shall bring this before the court

পৃষ্ঠা ১০ পেয়াদা।

P 8. Servants.

পৃষ্ঠা ১০ বেটে শালাকে বাঁধ।

P 8. Bind the hands of this villain

পৃষ্ঠা ১১ হাবাতেও ফকির হলো।

P 8. The ignorant fool is become a beggar

পৃষ্ঠা ১১ ও যে একক্ষণে দু'বার খায়।

P 9 He ought to take a second meal.

পৃষ্ঠ ১১ সাহেবের দোহাই।

P 9 I ask for the sahib's grace

পৃষ্ঠা ১২ আই, আই, উড্‌।

P 9 J J wood

পৃষ্ঠা ১২ জ্ঞান শালা বড় নালায়েক আছে।

P 9. inexperienced .

পৃষ্ঠা ১২ তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

Without their punishment no cultivation of indigo .

পৃষ্ঠ ১৩ খুড়কি হানা।

P 10. অনুবাদ করা হয় না।

পৃষ্ঠ ১৩, জুতো মারকে নিকাল দেও।

P 10 I shall drive you out

পৃষ্ঠা ১৩ নবীন মাধব শালা।

P 10. That fool, Nabin Madhab.

পৃষ্ঠা ১৩ কেস্তাবে রূপেয়া লেয়ণ

P 11. Takes the advances from me.

পৃষ্ঠা ১৩. বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা" ।

P 11. That fool himself prepared the draft of the petition.

পৃষ্ঠা ১৩ উকিল মোক্তারদিগের।

P 11. Attorney.

পৃষ্ঠা ১৩ দুই বৎসর মেয়াদ খাটে।

P 11. Was confined for two years

পৃষ্ঠা ১৪. গোবিন্দ প্রজা রক্ষার্থে দীক্ষিত হইয়াছি।

P 11 Enlisted myself in order to save the poor ryots.

পৃষ্ঠা ১৪ একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি।

P 11. If I can preserve one poor ryot

পৃষ্ঠা ১৪. এ নীলকরীতে পদার্পণ করিয়াছি।

P 11. have entered into this indigo profession

পৃষ্ঠা ১৪ গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা—

P 11. destroying of cows

পৃষ্ঠা ১৪ জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

P 11. I now lie down in bed keeping the jail in my pillow (Thinking of it

পৃষ্ঠা ১৪ নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই।

P 11. I do nothing unjust against your indigo.

পৃষ্ঠা ১৪ নীল করিছি।

P 12. Prepared the indigo

পৃষ্ঠা ১৫. আবাদ হল বিশ বিঘা তাঁর মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে।

P 12. ···give nine bighas out of that for indigo.

পৃষ্ঠা ১৫· তবে কাজেই চটতে হয়।
P 12 That must occassion my death

পৃষ্ঠা ১৫· বেটা।
P 12. That fool

পৃষ্ঠা ১৫· সদর নায়েব।
P 12 Court Naib (deputy)

পৃষ্ঠা ১৫ বিশ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।
P 12 bringing the whole twenty bighas within our power.

পৃষ্ঠা ১৫ দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আম।
P 13 You must take the money in advance ; you must cultivate the land

পৃষ্ঠা ১৬· বড় বাবু।
P 13 O, Thou Babo

পৃষ্ঠা ১৭· যদি উহারে একপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন, তবে আপনারই লোকসানই।
P 13— 14 If with such severe beating, you make such cruel advances to them, that is only your loss

পৃষ্ঠা ১৮ সাহেব কি কথায় ভোলে।
P 15 Does the Saheb forgets his words ?

পৃষ্ঠা ১৮· বাড়া ভাতে — ছাই — নাই।
P 15. Rendered into prose.

পৃষ্ঠা ২০ তবে ও রা যখন ঠাকুরপোকে চিঠি লিখবেন সেই সময় পাঁচ রঙের সুতার কথা লিখে দিতে বলবো।
P 16. When they write a letter, this time to my husband's brothers, we shall send to ask for threads of various colours

পৃষ্ঠা ২০. আমি কি তামাক পোড়ার কটোটা আনি নি।
P 17. Have I not brought with me my huka.

পৃষ্ঠা ২০. যেমন একদণ্ড তামাক পোড়া নইলে বাঁচি নি।
অনুবাদ করা হয় নি।

পৃষ্ঠা ২০. ও আদর, তামাক পোড়ার কটোটা আন না দিদি।
P 17. Aduri, will you just go and bring me some ashes of tobacco?

পৃষ্ঠা ২১ খামারে।
P 17. threshing floor

পৃষ্ঠা ২১ ডান।
P 17 Dain

পৃষ্ঠা ২১ মোরে বাউ দিতে চেয়েছিল।
(বাউ এখানে সোনার বলয় অর্থে)
P 18 Wanted to give me a daughter-in-law

পৃষ্ঠা ২২ ছোট বউয়ের মতো পাগল আর ·
P 18. a greater fool, ···

পৃষ্ঠা ২৩ ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন?
(মাথায় অলঙ্কার অথবা কানের পাশে ঝুলাইয়া রাখা কেশগুচ্ছ)
P 19 Why did you cut off the curls of your hair?

পৃষ্ঠা ২৩ আয় ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি—
bring down the clothes

(এই অনুবাদ পড়ে, আদুরীর পরবর্তী বাক্য "ছোট হালদার আগে বাড়ীই আসুক···অর্থবোধক হবে না—মন্তব্য লেখকের)

পৃষ্ঠা ২৪ তাকে শান্ত করো ··
P 20. অনুবাদ করা হয় নি।

পৃষ্ঠা ২৪. ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে।
P 20. My Nabın is become very weak by mere vain thoughts

পৃষ্ঠা ২৫ ও নচ্ছার বেটি।
P 21 That nasty fool

পৃষ্ঠা ২৫. নাম লেখালেই হয়।
P 21 She has only to write her name in the public notices.

পৃষ্ঠা ২৫ ধানের জমি ছেড়ে দেবে।
P 21 give grants of lands for cultivation of rice

পৃষ্ঠা ২৫ বিটী সাহেবের নোক।
P 21. That fool was an agent of the saheb

পৃষ্ঠা ২৬. তবে নেঠেল দিয়ে ধরো নিয়ে যাবে।
P 21. I shall take her away by certain latyals

পৃষ্ঠা ২৬. মগের মুল্লুক আব কি।
P 22 What more is the Burmese (Mug) power?

পৃষ্ঠা ২৬ মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতে চাই নি বলো ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধরো নিয়ে গিয়েলো।

P 22 because certain parties did not agree to sign a fictitious receipt of advances, they broke down this house, and took away by force the wife of one of the Babus

পৃষ্ঠা ২৭ আবার কলুবাড়ী দিযে তেল নিযে যাব, তবে সাঁজ জ্বলবে।
P 23 I shall buy some oil from the shop, then there will be light in the house.

পৃষ্ঠা ২৯. মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড় বাবুর নুন খাই নি—তা করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না।

P 27. Have we a film on our eyes ; did we not serve our eldest Babu ? Are we devoid of all sense of shame ? And has not our eldest Babu given us salt to eat ?

পৃষ্ঠা ২৬ সর্বনাশী বলে।

P 21. unfortunate fool says.

পৃষ্ঠা ২৯. এমনি থাপ্পোড় ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি।

P 27. With one slap I can raise him in the air, and atonce put a stop to all his gad-dams and other words of chastisement.

পৃষ্ঠা ৩০. মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, বল্লিও খাটবে না।

P 27. It won't cut ice if I say, I refused to take indigo advance under the influence of the Babus.

পৃষ্ঠা ৩০. এবরে ও সুমিন্দির ইকদুল (আইন নির্দিষ্ট ধারা মতে আটক) করা বেইরে গেছে।

P 28. Now this torturing is all put a stop to.

পৃষ্ঠা ৩০. কোমেট কত্তি লেগেছে (শলা-পরামর্শ)।

P 28. Holding a meeting

পৃষ্ঠা ৩১. মামদো-ভুতে পালি নাকি ঝকোতে ছাড়ে না ?

P 29. If the ghost of the burden once attack a person…

পৃষ্ঠা ৩১. এ জেলার মাচেরটক না—ও জেলার মাচেরটকের দোষ পালে কি তাও তো বুঝতি পারচি নে।

P 28. I can not understand how the magistrate of this Zillah has found fault with the magistrate of the other Zillah.

পৃষ্ঠা ৩১. বচোরুদ্দি নানা

P 29. My Uncle Bochoruddi

পৃষ্ঠা ৩২. জাত মারলে পাদরি ধরে।

P 30. The missionaries have destroyed the caste.

পৃষ্ঠা ৩২. জমিডের মার্গ মারলে।

P 30. Took possession of the whole peice.

পৃষ্ঠা ৩২. সমিন্দি।

P 30. The fool.

পৃষ্ঠা ৩২. ওমনি সাহেবের মাগ মারে।

P 30. immediately gives notice of it to the Saheb.

পৃষ্ঠা ৩৩. মাম্রির ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোসচেন।

Not translated

পৃষ্ঠা ৩৩. পাঁচ বিঘা হারে দাদন।

P 31. Advance for five bighas of land

পৃষ্ঠা ৩৪. মুই ঝরকা দিয়ে।

P 32. Not translated.

পৃষ্ঠা ৩৪. এরা সব দোরস্ত হয়েছে।

P 32. These are all well-prepared.

পৃষ্ঠা ৩৪. বাবারে।

P 32. O my father!

পৃষ্ঠা ৩৫, গেসান।

P 33. filth.

পৃষ্ঠা ৩৫. মুক্তিয়ারকে লেখ।

P 33. Write to the attorney

পৃষ্ঠা ৩৫ ভাবরার ঘর (খোলার ঘর)

P 33. Steam engine room.

পৃষ্ঠা ৩৭. আমারি—তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

P 35. As to myself I have full confidence as to that.

পৃষ্ঠা ৪০. আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে।

P 37. Have I any power to go out in the town ?

পৃষ্ঠা ৪২. বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়।
a school be established in this country

পৃষ্ঠা ৪৪. কায়স্থকুল তিলক।

P 42. grandeur of the Bose family.

পৃষ্ঠা ৪৫. তোমারদিগের চরিতার্থ করিব।

P 42. shall do good unto you.

পৃষ্ঠা ৪৬. এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যালেয়ে নে বেড়াবে'।

P 45. He is not so much the son of keot, (shoe-maker caste) that he shall direct the saheb like unto one leading a monkey.

পৃষ্ঠা ৪৭. আমারে ঘোল বলাইয়াছে (জব্দ করিয়াছে)।

P 46. I am, as it were, become mad.

পৃষ্ঠা ৪৭. শ্যামনগরের ৭।৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে।

P 46. seven or eight ryots of Shamnagara have all given up.

পৃষ্ঠা ৪৭. ভাল মতলব বার করেছিলে।

P 46. You have formed a very good plan.

পৃষ্ঠা ৪৭. বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাষ দেওয়া হইয়াছে।

P 46. Our indigo cultivation has been nearly made on the sides of his tank.

পৃষ্ঠা ৪৭. বাক্‌ত।

P 46. Fool.

পৃষ্ঠা ৪৮· বেটা নালিশ করিয়াছে।

P 46 And the fool brought an action in the court.

পৃষ্ঠা ৪৮ এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

P 47. This act is the become brother of the Shamchand.

পৃষ্ঠা ৪৮· তোমছে কাম বেহেতার চলেগা।

P 47 Work may be carried on by you without loss·

পৃষ্ঠা ৪৮ উঠান।

P 47. ground

পৃষ্ঠা ৪৯ চন্দ্রগোলদার সাত্তান (সাতেশান খাওনা দিতে সক্ষম)।

,, ৪৮ সাতান শব্দের অনুবাদ নেই।

পৃষ্ঠা ৪৯· ধর্মাবতার বেয়াদবি মাফ হয়।

P 48. Saheb, grant pardon for this bad conduct.

পৃষ্ঠা ৪৯· বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে, বাঞ্চৎকো হামারা বটনেকা ঘরমে ভেজ দেগা।

P 48 I must give that wicked fool some instruction very soon.

পৃষ্ঠা ৫০· বধুমাতার অলঙ্কার লইলে তেমন রোদন করবেন।

P 50 ··· Bou weeps when her ornaments are taken away

পৃষ্ঠা ৫১ বড় মায়ের কাজ।

P 50. Elder sister.

পৃষ্ঠা ৫১-৫২ আহা আমার এমন সংসার এমন হইল।

P 50. Is this my family reduced to this state

পৃষ্ঠা ৫২-৫৩· জন মাইন্দার (মাইনে করা চাকর)।

P 50 Fifty harrows.

পৃষ্ঠা ৫৩· খোকায় আশীর্বাদ জানিবেন।

P 52. Dear friend.

পৃষ্ঠা ৫৪ উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে।

P 53 Several kinds of grain in their yards are being dried up their kine in the rooms are all remaining bound in their places

পৃষ্ঠা ৫৪. ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্মূল হল না।

P 53 The wild grass in the rice fields is not cut off

পৃষ্ঠা ৬১. সম্রিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মো'র তেমনি হাতের পোঁচা।

P 59 If he makes a face I have a strong fist

পৃষ্ঠা ৬১. মোক্তার সম্রিন্দির।

P 59. Attorney's.

পৃষ্ঠা ৬১ পোঁচা করতল।

P 59. fist

পৃষ্ঠা ৬১ বুনোপাড়া।

P 59. Pig-raisers

পৃষ্ঠা ৬১. তারপর নাত করো জরু ছাবাল ঘর পোরলাম।

P 59 In the night came to my wife & children.

পৃষ্ঠা ৬১. এই সম্রিন্দিইত ওটালে।

P 59. This planter has stopped everything.

পৃষ্ঠা ৬১. কই শালা।

P 59. Now sir,

পৃষ্ঠা ৬২. তোর বড় বাবারে।

(Mr. wood গালিচ্ছলে)

P 59, your old father.

পৃষ্ঠা ৬২ ও সমিন্দি নেয়েত ফেরার হলি ঝে কুটি কবরের মধ্যে ঢোকবে ।
P 60. When the ryots abscond en masse your factory will go to ruins

পৃষ্ঠা ৬৩ ফোজ্দুরিতে ধরো নে গেল ।
P 60 The peadas taking him away

পৃষ্ঠা ৬৩ তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না ।
P 60 He takes food prepared by no other hand but that of the eldest Bou

পৃষ্ঠা ৬৩. বাবা আমার কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করলেন ।
P 61, No Translation

পৃষ্ঠা ৬৩ এই কি তোর মার প্রাণ ।
P 61. Is this the life thy mother should spend

পৃষ্ঠা ৬৬. অসৎ কর্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক ।
P 66. Not only taking evil actions into consideration ,

পৃষ্ঠা ৬৬. হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোযাল হইয়াছিল ।
P 66 My Lord, many questions were put to my witnesses.

পৃষ্ঠা ৬৭ গামছা ।
P 66 handkerchiefs

পৃষ্ঠা ৬৭ সর্বনাশ উপস্থিত হয় ।
P 66 It proves an entire loss.

পৃষ্ঠা ৬৭. (উডের সহিত পরামর্শ) ।
P 67. (as advised by Mr Wood).

পৃষ্ঠা ৬৭. বেওরাওয়ারি করিয়া (জোর করিয়া) ।
P 67. Having make known to them the particulers of the matter.

পৃষ্ঠা ৬৮. মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল।

P 67 As the dog who received the blow on the head.

পৃষ্ঠা ৬৮ প্রতারণা।

P 67. Forgery

পৃষ্ঠা ৬৮ করাল নীলকর নিশাচর।

P 68 Gaint-like indigo planters

পৃষ্ঠা ৬৯ আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।

P 68 losing this case, if we be obliged again to engage in the indigo cultivation, all will be obliged to do the same afterward

পৃষ্ঠা ৬৯, টিকিরি (ঠিকা মজুর)।

P 69. Tikiri caste.

পৃষ্ঠা ৬৯. তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই।

P 69 He has no knowlege of what a plough is

পৃষ্ঠা ৬৯ সারেজমিনে তদারক।

P 69. Proper examination

পৃষ্ঠা ৬৯ সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অসমর্থ।

P 69 Not translated.

পৃষ্ঠা ৭০. আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

P 69. I am writting with my finger, not with my ears.

পৃষ্ঠা ৭০ সওয়ালের কৌশলে।

P 69. not translated.

পৃষ্ঠা ৭১ আসামীর নিকট হইতে ২০০৲ টাকা ডাইনে (হারে, প্রত্যেকে) ২ জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

P. 70. That the defendant is to give 200 or two persons as security and that the sub-poenas be sent to the truthful witnesses.

পৃষ্ঠা ৭১. রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

P 70. Take the security bond from the defendant properly,

পৃষ্ঠা ৭২. কিরূপে পিতার উদরে দু'টি অন্ন দিব।

P 71. ...how I can able be to make my father take some boiled rice.

পৃষ্ঠা ৭২. মূঢ়মতি।

P 71. অনুবাদ করা হয় নি।

পৃষ্ঠা ৭৩. প্রতিকুল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি খণ্ডন কর মন।

P 72. will destroy the evil desires of the unfriendly magistrate.

পৃষ্ঠা ৭৪. বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

P 73. was not able to attend Bindu Madhab at all.

পৃষ্ঠা ৭৪. ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয়, আমার তাহাতে এই শরীর

P 73. —much am I.

পৃষ্ঠা ৭৪. বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন করো (বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে বৃষ বন্ধনের খুঁটি)।

P 73. Like a bull yoked to the plough.

পৃষ্ঠা ৭৫. কাজির কাছে হিন্দুর পরোব।

P 73. Can the Hindu celebrate his religious services before the Kazi.

পৃষ্ঠা ৭৯. আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে।

P 77. —as they had taken the advance for indigo, so why should they have to go to the godown again.

পৃষ্ঠা ৭৯. কিন্তু ক্রমশঃ পাদরি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং নীলকর - পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের

দুঃখে পদরি সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন উঁহারা তাহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল।

P 77. But as the ryots, found by and by, the bounty, mildness and forgiving temper of these gentlemen, they began to wonder, and as much as the missionaries showed heartfelt sorrow for the tortures which the poor people suffered from the indigo planters, so much the more the began to love them, and to have faith in them

পৃষ্ঠা ৮০ গারনাল সাহেব টুপি না খুলে এসতি পারে না পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়।

P 81 The judge or magistrate when they come to him take off their hats Even the Governor takes off his hat while coming to meet him (প্রথম বাক্যটি অতিরিক্ত)

পৃষ্ঠা ৮০. তাইতে বিবির ম্যাক'ৎ মেযে পরদা করেছে।

P 82 Therefore, they have brought their femails into public like English Ladies.

পৃষ্ঠা ৮১ চুপ কর গুওড, সাহেব শুনলে এথনি অমাবস্যা বার করবে।

P 82 Thou braggart fool, if the Saheb hear this, he will bring out your new moon

পৃষ্ঠা ৮১ গুওড নন্দর বংশ ভোগোলের শেষ (যে ভোগায়)।

P 83. This filth eater of Nanda's family is very senseless.

পৃষ্ঠা ৮২ শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না।

P 84 The fool, while he has taken his caeha, will not be able to increase the row greatly.

পৃষ্ঠা ৮৩. গিধ্বড়কি শালা, তোমারা মোনাসেফ না হোয় কাম ছোড় দেও।

P 81. If you don't desire it, leave your business, thou great fool.

পৃষ্ঠা ৮৩. ও শালা, পাজি, নেমকহারাম বেইমান! মাহিয়ানার টাকায় তোমাদের কি হইয়া থাকে?

P 85. Thou, stupid ungrateful creature! What becomes of your salaries?

পৃষ্ঠা ৮৪ পাদরি সাহেবের কাছে।

P 85. To the missionaries

পৃষ্ঠা ৮৪. গুপে গুওটা।

P 85. Cursed Gopi

পৃষ্ঠা ৮৪ উমেদার।

P 85. Apprentice.

পৃষ্ঠা ৮৫ মহাজনের ধান্য দেড়া-বাড়ীতে অথবা সাড়ে সইযে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়।

P 86. They send to the Mahajan's house. a part half-preparred.

পৃষ্ঠা ৮৫. ...খাজানা বলিয়া যত টাকা.. খাতকে চাহিয়াছে।

P. 87. for which the debtors have asked the revenue from them

পৃষ্ঠা ৮৫ নীলমামদো।

P 87. Indigo giants

পৃষ্ঠা ৮৫. ধর্মাবতার এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

P 87. Sir, the stupid, shameless mahajans speak thus

পৃষ্ঠা ৮৬. বজ্জাত।

P 87. Stupid.

পৃষ্ঠা ৮৬. বাঙ্গৎ।

P 87. The fool.

পৃষ্ঠা ৮৬. শালা না লায়েক।
P 87 Ignorant fool

পৃষ্ঠা ৮৬. চপ্‌রাও, ইউ ব্যাসটার্ড অভ্‌ হোরস বিচ।
P 87. Stop, thou upstart of a son.

পৃষ্ঠা ৮৬ কালকো কাম দেখকে হাম তোমকো আপনে জেলমে ভেজ দেগা।
P 88 Were it not for your work on tomorrow, I would send you to the jail

পৃষ্ঠা ৮৬. সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়।
P 88. A person becomes the Dewan of an Indigo Planter after being born a vulture seven hundred time

পৃষ্ঠা ৮৯ বড় বাবুকে ঘেরাও করিল।
P 90 stood round him

পৃষ্ঠা ৯০. মো র উপর স্মার্মিন্দের বড় গোষা।
P 91. The fools hate me very much

পৃষ্ঠা ৯০ মারামারি হবে জানলি মুই কি নুকয়ে থাকি।
P 91 Do I hide myself when there is a tumult ?

পৃষ্ঠা ৯০ কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড় বাবুর নিকটে বসে রোদন করিতেছে।
P 91. But a person of a different caste and of another village is weeping near the Babu

পৃষ্ঠা ৯০ নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ক্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে বড় সাহেবের নাক কামড়ে লইয়ে পালিয়েছিল।
P 91-92. Like an ichneuman making a noise when its tail is cut off, he in agony from the pain of hand, flew off after seizing with a bite the nose of the elder saheb.

পৃষ্ঠা ৯২. নাক্‌টা মুই গাঁটি গুঁজে নেকেচি।

P 92. That nose I have kept with me

পৃষ্ঠা ৯৩ জীবনাধা'র পুত্রশোক।

P 94. Being grieved for her son

পৃষ্ঠা ৯৫ পিতার পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন।

P 96 again he took the cachi for the celebration of his funeral ceremony but before that was done he is preparing to go up to heaven to die).

পৃষ্ঠা ৯৫ বিপদ বান্ধব কর বিপদে বিধান।

P 96 Oh friend of the distressed.

(বাকী অংশের অনুবাদ নেই।

পৃষ্ঠা ৯৬ আরে দু খ! বিবি যদি যমকে চিটি লেখে কত্তারে না মারতো, তবে সোনার খোকা দেখে কত আহলাদ কত্তেন হাত তালি।

P 97. Ah! what a pity! If, madam sorrow planter's wife did not write a letter to yama and thus kill my husband

পৃষ্ঠা ৯৭. গাবি সৈরিন্ধ্রীর প্রীত।

,, ৯৭. সৈরিন্ধ্রীর প্রীতির অনুবাদ করা হয়নি।

,, ৯৭ তাঁরে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

P 98 Let me take care of her

পৃষ্ঠা ৯৮ পাতি বিটি।

P 98 stupid woman

পৃষ্ঠা ১০০ . স্কন্ধের ঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে।

P 101 The stroke on the head appears fatal.

পৃষ্ঠা ০ বিছানা খেংড়া দিইটি না, বিছানায় তো কিছু নেই ওর মা, মোদের

কঁ্যাতার ওপরে, তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে তাইতো পেড়ে দিয়েচি মা।

P 101. I have swept on the bed, there is nothing then on the coat of shreds, I have placed another which your aunt gave.

পৃষ্ঠা ১০২. সাঁকতির মাল শাঁকা।

P 102. flower garland.

পৃষ্ঠা ১০২. মুই কোলে তুলে নেই, মরি বাছা মার কোলে ভাল থাকবে।

P 102. Let me take her on my lap ; she will remain quite there.

পৃষ্ঠা ১০২. মুই হারাণের রূপ ভোলবো ক্যামন করে।

P 102. How can I forget him.

পৃষ্ঠা ১০২. বড় বাবু মোরে বাগের মুখথে ফিরে এনে দিয়েলো।

P 102. Our eldest Babu preserved her from the grasp of the tiger.

পৃষ্ঠা ১০২. তারপরে বাছারে নিয়ে টানাটানি।

P 102. Since then my child has been dying minutely.

পৃষ্ঠা ১০৩. নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো (নবমীর রাত বুঝি পোহাল)।

P 103. I think the ninth of the moon is closed.

পৃষ্ঠা ১০৩. মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় কি।

P 103. My image of gold is to go to the water, and what means shall I have.

পৃষ্ঠা ১০৩. ঔষধ উদরস্থ হয় নাই।

P 103. The medicine did not act.

পৃষ্ঠা ১০৩. পূর্ণমাত্রা সূচিকাভরণ সেবন।

P 103. The application of the suchikavaran.

পৃষ্ঠা ১০৩. আহা অন্নপূন্নো কি চেতন আছেন, (অন্নপূন্নো এখানে সাবিত্রী)
Is Annapurnah now awake.

পৃষ্ঠা ১০৪. মোর ক্ষেত্রমণিরে দেকতি আসবেন।
P. 104. Will come to my Khetromoni.

পৃষ্ঠা ১০৪. চৈতন বিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে তাহাও......
P 104. If one hundred serpents do bite... ...

পৃষ্ঠা ১০৪: সম্মুখে পরমা-সুন্দরী প্রতিপ্রাণা দশমাস গর্ভবতী সহধর্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া।
P ১০৪. অনুবাদ করা হয় নি।

পৃষ্ঠা ১০৫. সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে।
P 104-105 I have found the pulse indicate that death is near, either at mid-day or in the evening life will depart

পৃষ্ঠা ১০৫. দুঃশাসন ডাক্তর হলো্য কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত। বেটাকে আমি দুইবার দেখিছি, বেটা যেমোন দুর্মোখো ..
P 105. Had Dushashan, the doctor, been called he would have taken away the mony kept for the ceremony. I have seen that kind of doctors twice.

পৃষ্ঠা ১০৫. ছোট বাবু ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে করে্য ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না।
P 105. ..but he said nothing with certainty.

পৃষ্ঠা ১০৫. চালগুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।
P 105. Having washed the rice bring tne water here

পৃষ্ঠা ১০৫. মরি! মরি। মরি। জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল।

P 106. I die! I die! I die What pains does the mother bear, ..

পৃষ্ঠা ১০৭ বিবির সঙ্গে যেভাব, চিঠি লিখলেই যমরাজা ছেড়ে দিত।

P 107 This stupid has such a friendship with Yama

পৃষ্ঠা ১১৩ বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানব লীলা, প্রবল প্রবাহ সমাকুল গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর।

P 112 In this world of short existence human life is as the bank of a river which has most voilent course and the greatest depth

বাংলা একাডেমী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র—১৩৭১

একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস

পূর্ব-নির্ধারিত এবং পূর্ব-কল্পিত দার্শনিক অনুমান অথবা নির্দিষ্ট বিশ্বাস অনুযায়ী কথা-সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে খুবই হালের ব্যাপার। অবশ্য বিভাগ-পূর্বেও কোন কোন মুসলিম কথা-সাহিত্যিক বুদ্ধিদীপ্ত এবং নানা দার্শনিক প্রবণতাপূর্ণ আধুনিক ইয়োরোপীয় কথা সাহিত্য দ্বারা মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বাস্তব জগতে স্বাভাবিক আচরণশীল নরনারীকে অবলম্বন করে কিছু কিছু গল্প উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এঁরা ছিলেন বিশেষভাবে রুশীয় সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এঁদের রচনার মান তেমন উন্নত ছিল না, ফলে তৎকালীন অধিকাংশ গ্রন্থই প্রকাশ হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবতঃ কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুক্ষুধা। প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পুস্তকটি সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য এটি একটি ত্রুটিহীন শিল্পকর্ম এ কথা নিঃসংশয়ভাবে বলা যায় না। আকস্মিক সমাপ্তি ব্যতিরেকেও গ্রন্থটির অন্য একটি ত্রুটি, আমার মতে, মূল ভিত্তের সাথে সামঞ্জস্যহীন কাহিনী চারণ আমদানি। তবু আধুনিক উপন্যাস রচনার প্রথম মুসলিম প্রচেষ্টা এটি। কেবল তাই নয় গল্প উপন্যাস রচনায়ও কাজী নজরুল ইসলামই আধুনিক যুগের প্রথম মুসলিম শিল্পী যিনি দোষগুণে গুণান্বিত মাটির পৃথিবীর মানব-মানবীকে সাহিত্যের মালমসলারূপে ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব বিশের দশকে; কথা-সাহিত্য রচনায় তিনি হাত দেন আরও পরে। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে উপন্যাস রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নবেল-সাহিত্য-পুরস্কার প্রাপ্ত হন। নজরুল তখন বালক। সুতরাং আধুনিক কথা সাহিত্য-রচনায় মুসলিম লেখকগণ হিন্দু লেখকগণের মোকাবেলায় অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাৎবর্তী। দীর্ঘ এই পঞ্চাশ বৎসরকাল মধ্যে

হিন্দু লেখকগণ হিন্দুসমাজ সংস্কার এবং হিন্দুর জাতীয় জীবনে রেনেসাঁ আনয়নমূলক সাহিত্য রচনার কার্য শেষ করে মনোবীক্ষণমূলক তত্ত্ববলে উপন্যাস রচনায় হাত দেন এবং কিছুটা খ্যাতিও অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যের অংগনে মুসলিম কথাসাহিত্যিকের প্রবেশ এ-সময়ে। সুতরাং প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায়, গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিভাগ-পূর্ব-কালের মুসলিম রচনা সূচনা-কালীন প্রয়াস মাত্র। সূচনাকালের ত্রুটি-বিচ্যুতি তার মধ্যে থাকাই স্বাভাবিক।

দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্বে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু সংখ্যক যুবক সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হয়ে এদিক ওদিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু পশ্চাতে পরিপক্কতা, ঐতিহ্য এবং পাঠকশ্রেণীর অভাব থাকায় তৎ-কালীন শিল্পকর্মের অধিকাংশই সমাজ-জীবনের আলোকচিত্রের রূপ পরিগ্রহ করে; তাও আবার সমাজ-জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। বাস্তব-জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে সংগ্রামশীল ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের সামগ্রিক রূপ তার মধ্যে বিধৃত ছিল না। ছায়া হয়ত ছিল কিন্তু জীবনদীপ্ত কায়া ছিল না। লক্ষ্যহীন বর্ণনা হয়ত ছিল, তা না পেতেনও হয়ত বর্ণনায় স্থান পেয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষার জন্যে যে সিন্থেসিস নির্মাণ আবশ্যক তা ছিল না। নবাগত দলের মনে নীচতলার প্রপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রদর্শন স্বাভাবিক আবেগ হলেও মজলুম শ্রমিক ও কৃষকের জীবনভিত্তিক সার্থক গল্প উপন্যাস এরূপ দূরত্ব রক্ষা করে রচনা করা যায় না; এ জন্য প্রয়োজন লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার। সুতরাং এ-শ্রেণীর কোন কোন রচনা সাময়িক দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তার মধ্যে অসংগতির প্রতি দৃষ্টি ছিল। তবে লেখকদের শিল্পীসুলভ দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা ও মানব-চরিত্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। নিজস্ব নির্দিষ্ট কোন নীতি অথবা বিশেষ কোন দার্শনিক মত গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁরা উপস্থিত করেননি। হয়ত তেমন কোন নীতি ও মতামত কারো ছিলই না। অবশ্য বস্তিবাসীদের নিয়ে সার্থক সাহিত্য রচনায়ও বিশেষ দক্ষতা আবশ্যক, এবং তজ্জন্য নোংরা বস্তির পরিবেশে মানুষের অবস্থান ও বসবাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং বাস্তব জীবনবোধ প্রয়োজন; কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-দক্ষতা রজ্জুর উপর নৃত্যরত ক্রীড়াবিদের দক্ষতার সমকক্ষ নয়।

রজ্জুর উপর সুতরাং ক্রীড়াবিদকে একই সাথে ভারসাম্য এবং দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য মুখের স্বাভাবিক হাসিটি রক্ষা করতে হয়। পূর্ব-সংকল্পিত দার্শনিক অনুমান অথবা কোন স্থির বিশ্বাস প্রচার-মূলক সার্থক গল্প-উপন্যাস রচনার মধ্যে রজ্জুর খেলোয়াড়ের চেয়ে অধিক দক্ষতা প্রয়োজন। পাঠকের বিরক্তি ও বিরাগ উৎপাদন যাতে না হয় তজ্জন্য কাহিনীর স্বাভাবিক ও সাবলীল গতি অব্যাহত রাখতে ত হবেই, তদোপরি দর্শন ও মতামত প্রচার করলেও তা করতে হয় নায়ক নায়িকার আচরণের মাধ্যমে। লেখক নিজের বক্তব্য বলছেন, এ-ধারণা পাঠকের মনে উদ্রেক হওয়া মাত্র রচনা পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে। কাজেই এ জাতীয় রচনায় উন্নত শৈল্পিক মান অব্যাহত রাখা খুবই কঠিন কাজ। মাত্র বিশ-বাইশ বৎসরের রাজনৈতিক স্বাধীনতা মহৎ ও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সময় নয়। পাঠকের দিনের সমস্যাবলী জীবনে মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা বহু। সে সব-ব্যাপারে মুক্তি চায়, চায় স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা আবার স্বাধীনতা লোপ না করে এটাও তার বিবেচনার বিষয় এবং একটি সমস্যা। এই জটিল জীবন-জিজ্ঞাসার উপর সার্থক শিল্পকর্ম রচনা করার পূর্ব-শর্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী সাধনা, গভীর পাঠ এবং মানব-সমাজের যে অংশ রচনার উপজীব্য তার সাথে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। দীর্ঘ প্রস্তুতি ইয়োরোপের ঐতিহ্য। রেবেলা এবং হ্যালের 'লেডুকে'র Leduc মধ্যে কয়েক শত বৎসরের ব্যবধান বিদ্যমান। এই দীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে আমরা বালজাক, দস্তভয়স্কি, ইউগো, টলস্টয়, রোলাঁ প্রমুখ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদেরকে পর পর দেখতে পাই। এমন কি কিরকেগার্ড এবং কাফকার মধ্যে বেশ ব্যবধান। জাঁপল সার্তর এবং আলবার্ট ক্যামু প্রায় এক শতক পরে কিরকেগার্ডের স্তরে। এ নামগুলো শুধু নাম বলার জন্য উল্লেখ করছি না। এমন কি কালসচেতন করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। নামগুলো উচ্চারণ করে আমি বিগত কয়েক শতাব্দীতে ইয়োরোপে যে সংস্কৃতি ও বলিষ্ঠ সাহিত্য হয়েছে তৎপ্রতিই প্রধানতঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সাহিত্যিক এবং সমকালীন-কাল-সংহিতা আবার সব চাইতে সমস্যাশীল। শিল্পিক হওয়াতে দোষ নেই, কিন্তু শিল্পিক যখন গল্প উপন্যাস রচনা করতে বসেন, তখন কোনও তাঁর কালকে অতিক্রম করতে পারেন না, এবং আমাদের তা নির্দেশ করা সংগতও নয়। প্রুস্তের

ন্যায় অতীতকে পুনর্জীবন দানের চেষ্টা করা যায় এবং হয়ত তাতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব ; কেননা মানুষ যখন অতীতের প্রতি পশ্চাদ্দৃষ্টি প্রদান করে তখন সেখানে সে নিজেকে দেখতে পায় প্রধান নায়করূপে অনন্য এবং বিশিষ্ট। সুতরাং অতীতের প্রতি মমত্ববোধ এবং অতীতের তিলটিকে তালরূপে দেখার প্রবণতা মানুষের অন্তরে ক্রিয়া করে। কিন্তু যে সমাজ জীবনের অস্তিত্ব কোনকালে ছিল না, অথবা পৃথিবীর কোথাও বিরাজমান নয় তা নিয়ে গল্প উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়। রূপকথা উপকথায় বর্ণিত কাহিনীও আসলে বিদ্যমান বা যা বিদ্যমান ছিল এমন সমাজ-জীবনেরই সুকৌশলে বর্ণিত আলেখ্য। সুতরাং আধুনিক ইয়োরোপীয় কথা-সাহিত্য এমন কি তার চতুর্মাত্রিক রূপও যুগের সৃষ্টি। এ-সাহিত্য শিল্পবিপ্লবের অবদান। সূচনায় ছিল সামন্ততান্ত্রিক যুগান্তে মুক্ত স্বাধীন মানুষের বেমাক্কাধর্মিতা। শীর্ষে রয়েছে এ যুগের জটিল মানুষ—যে মানুষ দু'দিক থেকে আক্রান্ত। তার এক দিকে রয়েছে সীমাহীন প্রাচুর্য ; উদ্বৃত্ত টাকা-পয়সা ব্যয় করার জটিল সমস্যা। অন্যদিকে রয়েছে শ্রমিকের মানবেতর জীবন—নরক-সদৃশ বস্তি। গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইয়োরোপে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সামাজিক মূল্যবোধ এমন রূপান্তর লাভ করেছে যে, নিকট পশ্চাতের ভিক্টোরীয় যুগের সাথেও তার প্রায় কোন সাদৃশ্য নেই। সমকামিতা আইনসিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ; অথচ বাইবেল প্রাচীন খণ্ডের বর্ণনা মতে এ অপরাধে একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ঐশী নির্দেশে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল)। শূন্যলোক ক্রমে মানুষের উপলব্ধি এবং আয়ত্তের মধ্যে আসছে, ফলে সৌরজগৎ সম্বন্ধীয় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ক্রমে অপসারিত হচ্ছে ; বিশ্বাসিগণও তাদের মতামত আজ আর অপরিবর্তিত রাখতে পারছেন না।

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে ইয়োরোপীয় মন ও মানসে যে অস্থৈর্য ও আন্দোলন দেখা দেয় শিল্পক্ষেত্রে তা লিঙ্গবাদ, দাদাবাদ, প্রতীক-বাদ, অধিবাস্তববাদ, বাস্তববাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি নামে আত্মপ্রকাশ করে। ভাষা ও শৈলী রূপান্তরিত হয় ; নতুন নতুন কৌশল পরীক্ষিত নিরীক্ষিত হতে থাকে। একই মানুষের দু'টি সমান্তরাল স্বত্তা ; অর্থাৎ কিনা পরিদৃশ্যমান কার্যে নিযুক্ত ও শ্রুত বাক্যালাপে রত মানুষ এবং অদৃশ্য অন্তর্লোকের মানুষের কথাকে ভাষায় রূপ দেয়ার প্রচেষ্টাও

হয়, যা চেতনাস্রোতের নাম লাভ করে। সামাজিক জীবনের প্রতি উদাসীন অথবা সমাজচ্যুত অনন্য মানুষের মন সূক্ষাতিসূক্ষ্মভাবে সাহিত্যে বিশ্লেষিত হতে থাকে। জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রতিটি পদক্ষেপ নতুন নতুন নাম লাভ করে। বলাই বাহুল্য এই বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং জীবনকে নানাভাবে দেখার প্রয়াস আকস্মিক এবং ঐন্দ্রজালিক ঘটনা নয়। শূন্য থেকে এর জন্ম হয় নি। ইয়োরোপীয় সমাজে এ সমস্ত বিচিত্রধর্মী চরিত্র বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে; লেখক ও চিত্রশিল্পীর সম্মুখে জীবন্ত মডেল ছিল, অথবা শিল্পী নিজেই নিজের মডেল ছিলেন। সাডিজম শব্দটি মার্কুইস দে Marquis de Sade নামক ব্যক্তির নাম থেকে আগত।

কিন্তু ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। উৎস ও কারণ প্রদর্শনও বিশেষ প্রয়োজন নয়। বাস্তব অবস্থা এই যে আমাদের তেমন অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্য নেই। আমাদের বিগত কয়েক শত বছর একমাত্র অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য হচ্ছে স্বাধীনতার অভাব। না ছিল আমাদের স্বাধীন মানবরূপে যদৃচ্ছা গমনাগমনের স্বাধীনতা, না ছিল মুক্ত মনে মতামত বিনিময় ও প্রকাশের স্বাধীনতা। রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রসঙ্গ নাই তুললাম। অনুসন্ধান না করেই বিশ্বাস করার প্রবৃত্তি এবং প্রায় প্রাগৈতিহাসিক মূল্যবোধ দ্বারা আমাদের সমাজ এখনও শাসিত। অথচ উত্তরণের প্রক্রিয়া একমাত্র বিদ্রোহী ব্যক্তি দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। এমন কি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মও বিদ্রোহী ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রবর্তিত। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে বিদ্রোহ এবং নৈরাজ্যবাদ এক বস্তু নয়। নৈরাজ্যবাদী পূর্ণ স্বাধীনতা লাভার্থে সমাজকেও ধ্বংস করে নিজেও ধ্বংস হয়। পক্ষান্তরে বিদ্রোহী সমকালীন সামাজিক রোগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহী উন্নততর যুগ কামনা করে, কিন্তু চূড়ান্ত জগৎ কামনা করে না। সব কিছুর শেষে মৃত্যু; সুতরাং চূড়ান্ত বা শেষ হচ্ছে মৃত্যুতে। সমকালীন জীবন পদ্ধতির বিরুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ আমাদের দেশের ইতিহাসে নেই। আমরা এরূপ বিদ্রোহের সাথে পরিচিত নই। আজকের দিনেও আমরা প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি অব্যাহত রাখাকে বিদ্রোহ বলে গণ্য করি। শুধু তাই নয়, পশ্চাদ্‌গামিতাকে আমরা সমস্ত রোগ নিরাময়ের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলে প্রচার করি এবং

বাহবাও পাই। এই বিভ্রান্তিপূর্ণ পরিবেশে শিল্প ও সাহিত্যে আমাদের অবদানের দারিদ্র এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। অতি অল্পদিন হলো মাত্র এই অচলায়তনের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক বিদ্রোহের কিছুটা প্রমাণ আমাদের সাহিত্যে পাওয়া যাচ্ছে। অতি অল্প সংখ্যক এরূপ বিদ্রোহী লেখকের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লাল সালু' প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কুশলী শিল্পকর্মীরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সেই গ্রন্থের প্রধান চরিত্রটি বিদ্রোহী। কিন্তু সে-বিদ্রোহ ছিল নিজেকে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে যে কোন উপায়ে মুক্ত এবং অধিষ্ঠিত করার বিদ্রোহ। যেহেতু অন্যদের অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা অন্যদের করায়ত্ত বা পরাধীন না করে সফল করা সম্ভব নয়, সুতরাং 'লাল সালুর' নায়ক নিজেকে এমন উপায় অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত করলো যা অন্যদের জন্য হলো শৃঙ্খল অর্থাৎ কিনা অন্যদের উপর অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের পাশ সৃষ্টি করে সে নিজেকে স্বাধীন করলো। কিন্তু পুস্তকটির শৈল্পিক সংকেত রক্ষিত হলো, একই সময়ে সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি পাঠকের বিতৃষ্ণা জাগ্রত এবং নায়কের প্রতিও ফল্গুধারার মতো একটি সহানুভূতি রক্ষা করার মুন্সীয়ানা দ্বারা। কিন্তু 'লাল সালু' বিচার বিশ্লেষণ করা, আমার উদ্দেশ্য নয়। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র তৃতীয় উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' আমার এ-নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

নামটির অভিনবত্ব লক্ষণীয়। কিন্তু তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। পুস্তকটি এ-পর্যন্ত প্রকাশিত পূর্ব-বঙ্গীয় উপন্যাস সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমার এ উক্তি অন্য লেখকদের মর্যাদা এবং দক্ষতার উপর মন্তব্য নয়। ব্যতিক্রম শব্দটি প্রয়োগ করে আমি শুধু এই বোঝাতে চাচ্ছি যে ওয়ালিউল্লাহ্‌র পুস্তকটির বিষয়বস্তু এবং মূল সুর দুইই নতুন। প্লেগ রোগ দেখা দেয়ায় আলবার্ট কামুর ওরাও নগরী বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নদীতে চর পড়ার দরুন সৈয়দ ওয়ালি-উল্লাহ্‌র মহকুমা শহর কুমারডাঙাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্টীমারই ছিল শহরটির সাথে বাইরের জগতের একমাত্র যোগসূত্র। নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় স্টীমার চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উকিল

কফিল উদ্দীন। তিনি স্টীমার বন্ধের ব্যাপারটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না, শহরবাসীদেরকে এই ব'লে সাহস দেন যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং আবার স্টীমার চলবেই। শেষ পর্যন্ত স্টীমার যখন আর চলে না তখন তিনি শহর ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু নৌকোয় পা' দেয়ার সময় সহসা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হয়ে মূর্ছা যান এবং ঘাটেই প্রাণত্যাগ করেন। আলবার্ট ক্যামু'র প্লেগাক্রান্ত ওরাও এবং স্টীমার যোগাযোগ-ছিন্ন কুমোরডাঙ্গার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য, ওরাওএর অধিবাসীবৃন্দ বাইরের জগতের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রথমটায় খুব নিরাশ হয়ে পড়লেও, ক্রমে সাহসের সাথে এই সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করে। অনেকেই পালিয়ে বাইরের প্রিয়জনের কাছে চলে যেতে চায় বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ যায় না, এমন কি যে সাংবাদিকটি স্বল্পকালের জন্য ওরাওএ এসে আটকা পড়েছিল সেও গোপনে শহর পরিত্যাগের ব্যবস্থা অনেকটা সম্পন্ন করেও শেষ পর্যন্ত বাসনা পরিত্যাগ করে এবং রোগ প্রতিষেধক স্কোয়াডে যোগ দেয়। ডাক্তারের চরিত্রটি মহান ও অপূর্ব। যক্ষ্মাক্রান্ত স্ত্রী বাইরের এক স্বাস্থ্যনিবাসে এবং সেখানেই শেষ পর্যন্ত প্রাণত্যাগ করে। ওরাও কোয়ারাণ্টাইনের মধ্যে থাকায় ডাক্তার স্ত্রীর মৃত্যুর সময়ও তার শয্যাপার্শে উপস্থিত হতে পারেন না, কিন্তু তবু ওরাওএর বিপদগ্রস্ত মানুষের সেবায় তিনি দৈনিক আঠার ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন। শহরের মানুষও ক্রমে ক্রমে প্লেগটাকেও জীবনের একটি দিকরূপে কতকটা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে। গির্জায় যাওয়ার এবং যাজকের বক্তৃতা শোনার অভ্যাস কিছুটা বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করা যায় না।

কিন্তু সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর কুমোরডাঙ্গার অধিবাসিগণ স্টীমার বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে গভীর নৈরাশ্যে নিমগ্ন হয়। প্রথমে এক দরিদ্র মোক্তারের দুহিতা—যিনি স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী—নদীর দিক থেকে একটি কান্নার শব্দ শুনতে পায়। তার কাছ থেকে এ কথা শোনার পর ক্রমে শহরের প্রায় সকলেই এই বিচিত্র কান্নার ধ্বনি কখনও সন্ধ্যায় কখনও রাত্রির গভীরে কখনও বা দ্বিপ্রাহরিক নির্জনতায় শুনতে পায়। নগরবাসিগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েঃ দোওয়া দরুদ এমন কি জমাতে নামাজও পড়ে এ-বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। এক ব্যক্তি একটি সুন্দর গরুর বাচ্চা নিয়ে পাগলের

মতো ছোটে এবং নদীর ঘাটে গিয়ে বাছুরটিকে জবাই করে ফেলে রেখে চলে আসে। কিন্তু নদীর কান্না নিবারণ হয় না, সে কাঁদতেই থাকে। কুমোরডাঙ্গার ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নৈরাশ্য-নিমগ্ন অধিবাসিদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া স্টীমার ঘাটের অবসরপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার। সে বিদেশাগত হয়েও এই নির্বাসিত শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে মনস্থ করে এবং শহরবাসিদের সাথে বেশ আবেগের সাথে মিশতে চায়; কিন্তু কাহিনীর এ অংশটি কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়।

নদীর এই কান্নাকাটিকে সূত্র করেই কাহিনীটি বোনা হয়েছে। খেদমতুল্লা নামক এক ব্যক্তির অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার বিন্দুটি থেকে কাহিনীটি দানা বাঁধে। খেদমতুল্লাহ্ দিনমজুরের জীবন হ'তে আরম্ভ করে ন্যায় অন্যায় সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা আপনাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। নিজের সীমিত ক্ষেত্রে সে প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং অনন্যতা লাভ করে বটে, কিন্তু পরিণামে জীবন হারায়। তার পুত্র মোহাম্মদ মোস্তফা কাহিনীর প্রধান চরিত্র। চলন্ত স্টীমারের উপর তার জীবন-কাহিনী ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে। কুমোরডাঙ্গা শহরের জনৈক উকিলের মোহরার তোবারক ভূঞা নামক এক ব্যক্তি স্টীমারের যাত্রী। মোহাম্মদ মোস্তফার সাথে তার পরিচয় ছিল। স্টীমারের অপর একজন যাত্রী মোহাম্মদ মোস্তফার বাড়ীর লোক, আত্মীয় এবং ছোট বেলার সাথী। তোবারক ভূঞা অপরাপর যাত্রীদেরকে নদীর কান্না এবং কুমোরডাঙ্গা শহরবাসিদের কাহিনী শোনায়; মোহাম্মদ মোস্তফার আত্মীয়টি সে কাহিনী শুনে আশা করে হয়ত লোকটি মোহাম্মদ মোস্তফার ব্যাপারটাও বলবে এবং নিজের মানসপটে মোস্তফার জীবন-কাহিনীটি জাগ্রত করে। এই কাহিনীটি স্বগত উক্তির ন্যায় বিবৃত হয়েছে। সুতরাং উভয় কার্য যুগপৎ সংঘটিত হচ্ছে। জেমস জয়েসের রচনায় যুগপৎ ঘটিত একই লোকের মুখের কথা ও হাত-পায়ের কাজের সাথে তার অন্তরের অশ্রুত স্বতন্ত্র ভাবনা-চিন্তা পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এক ব্যক্তির মুখের কথা এবং অন্য ব্যক্তির অন্তরের চিন্তা যুগপৎ বিবৃত হয়েছে। তোবারক ভূঞার মুখের কথা কাহিনীরূপে পরিবেশিত: কিন্তু তার অন্তরের ভাবনা-চিন্তা যুগপৎ স্থান পায় নি।

মোহাম্মদ মোস্তফার জন্ম সাধারণ ঘরে। তার বাল্যকালীন জীবন

সাদামাটা এবং অন্য দশটা গ্রাম্য বালকের ন্যায় সহজ। তবে সে কিছুটা ভীরু এবং স্বল্পবাক; একমাত্র বৈশিষ্ট্য সে লেখাপড়া ক'রে নিজেকে উন্নত করতে চায়। সে দোওয়া-দরূদ পড়ে, সম্ভবতঃ নামাজ-রোজাও করে। শিক্ষা সমাপ্তির পর সে কুমোরডাঙ্গার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়। জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কন্যার সাথে তার বিয়েও স্থির হয়। কিন্তু ধার্য দিনের কয়েকদিন পূর্বে সে সংবাদ পায় যে, বিধবা এবং তাদের বাড়ীতে আশ্রিতা তার ফুফুর মেয়ে খাদিজা পুকুরে ডুবে মরেছে; বাড়ীর লোকের ধারণা: সে মোহাম্মদ মোস্তফার জন্যই আত্মহত্যা করেছে, কেননা মোহাম্মদ মোস্তফার বিয়ের সংবাদ সম্বলিত চিঠি শ্রবণ করার পরে পরেই সে পুকুরে গমন করে এবং আর ফিরে আসে না। মোহাম্মদ মোস্তফা যখন ছাত্র তখন বাড়ীর মুরুব্বীগণ তার এবং খাদিজার মধ্যে বিয়ে-শাদী হওয়ার সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করতো, কিন্তু স্পষ্ট কিছু হয় নি। মোহাম্মদ মোস্তফা নিজে ও এ-ব্যাপারে কিছু ব্যস্ত হয় নি। খাদিজার প্রতি ভালোবাসারও কোন প্রমাণ সে দেয় নি। ছাত্রাবস্থায় শহর থেকে বাড়ী যাওয়ার সময় সে খাদিজার জন্য টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে যেতো; কিন্তু সেটা পিতৃহীনা নিরাশ্রয় ফুফাতো বোনের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ-মমতার নিদর্শন ছাড়া অন্য কিছু ছিল বলে মনে হয় না। পরিণত বয়সে মোহাম্মদ মোস্তফা খাদিজাকে বিয়ে করার কোন চিন্তাই করে না। খাদিজা মনে মনে বিয়ের আশা পোষণ করতেও পারে; কিন্তু সেটা মোহাম্মদ মোস্তফার মনে সাড়া জাগায় নি বলেই মনে হয়। খাদিজার মৃত্যু আত্মহত্যা ছিল কিনা, তা-ও প্রমাণিত নয়; এমনিতেও পুকুরে ডুবে তার মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু তার জলডুবির সংবাদ মোহাম্মদ মোস্তফাকে বিচলিত করে। আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুটাকে হতাশ প্রেমিকার আত্মহত্যা বলে অনুমান করার পর মোহাম্মদ মোস্তফাও ভাবতে থাকে হয়ত খাদিজা তার জন্যই জলে ডুবে মরেছে।

মোহাম্মদ মোস্তফার মস্তিষ্ক থেকে ঘটনাটার স্মৃতি বিদূরিত হয় না। তার প্রস্তাবিত বিয়ে দু'দুবার মলতুবি থাকে। প্রথমবার সে কুমোরডাঙ্গায় তার বাংলাতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে; কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভীতি তাকে নিরস্ত করে। ছুটিতে দেশের বাড়ীতে এসে সে দ্বিতীয়বার চেষ্টা

করে এবং এ-চেষ্টায় সে সাফল্য লাভ করে। মোহাম্মদ মোস্তফা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। এখানেই গল্পের শেষ। গল্পটিতে আরো একটি অনুল্লেখযোগ্য মৃত্যু আছে। গল্প বর্ণনাকারীর চাচার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী [illegible] ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করে।

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট ও আত্মহত্যা এবং মৃত্যু, সুতরাং [illegible] বিষয়, আততায়ীর হাতে খেদমতুল্লাহর মৃত্যুর মধ্যে বিশেষ [illegible]। [illegible] ছোট-খাটো উল্লেখযোগ্য দিক: একদিন সকালে [illegible] সন্দেহভাজন খুনীর বাড়ির সমুখে মোহাম্মদ মোস্তফার [illegible] এবং কিছুক্ষণ অবস্থান এবং [illegible] বৃদ্ধ খুনীর কিছুদিন পরে শুক্রবারে [illegible] যে, খেদমতুল্লাহর খুনের সাথে তার [illegible] সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ-টুকু বাদ দিলে খেদমতুল্লাহর খুন [illegible] খুনের মতো: প্রতিযোগিতাশীল বিবদমান [illegible] একজনের প্রাণ হনন। সুতরাং এটাকে [illegible] অপরাধের সমতুল্য জ্ঞান করা যেতে পারে।

শৈশবে পিতৃহীন পরাশ্রিতা খাদিজার [illegible] না। সে আত্মহত্যা করেছে, এ অনুমান যদি [illegible] অস্বাভাবিক নয়। দরিদ্র মেয়েটির পক্ষে [illegible] এবং [illegible] প্রেমে পড়া বিচিত্র নয়। সে হয়ত মনে মনে [illegible] স্বামী-রূপে কল্পনা করে সুখের ভবিষ্যৎ সংসার গড়ে তুলেছিল। পরে মোহাম্মদ মোস্তফার আসন্ন বিয়ের সংবাদ তার স্বপ্নসৌধ [illegible] দেয়। তার অবস্থায় অতঃপর জীবনধারণ অর্থহীন গণ্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। প্রেমে উপেক্ষিতা বা উপেক্ষিতের আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত আছে। এ জাতীয় ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। এ-ক্ষেত্রে একমাত্র উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, মোহাম্মদ মোস্তফা কোনদিন খাদিজার কাছে প্রেম নিবেদন করে নি। সুতরাং মোহাম্মদ মোস্তফার বিশ্বাসঘাতকতা খাদিজার আত্মহত্যার কারণ; এ-কথা বলা যায় না। খাদিজা প্রেমে পড়লেও তা' এক পক্ষের ব্যাপার। খাদিজার আত্মহত্যার প্রায় সমতুল্য একটি আত্মহত্যা ফরাসী ঔপন্যাসিক আলবার্ট ক্যামু'র 'দি ফল' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থের 'ছিপলা-ছাপলা'

কালো পোশাক-পরিহিতা যুবতী মেয়েটি' রাত্রির অন্ধকারে সীন নদীতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ক্যামুর আলোচ্য উপন্যাসের মূল চরিত্র ক্লামেন্সের আত্ম-স্বীকৃতিতে (বইটির সবটাই আত্ম-স্বীকৃতি) মেয়েটির সাথে ক্লামেন্সের প্রেমের সম্পর্ক ছিল এমন কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। ক্লামেন্সের বহু রক্ষিতার মধ্যে সেই মেয়েটি হয়ত অন্যতম ছিল—হয়ত নয়। প্যারির এই জন-যোয়ান ব্যবহারজীবীর হৃদয়ে যা বিশেষভাবে আঘাত করে, সেটি হচ্ছে 'সীন নদীতে পড়ন্ত মনুষ্য দেহের অত্যন্ত ভীতিজনক উচ্চধ্বনি'; এ ঘটনার পূর্বে উক্ত ব্যবহারজীবীর জীবনে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। একদা একাকী নৈশভ্রমণকালে সে একটি আকস্মিক উচ্চ-হাস্যধ্বনি শুনতে পায়। লম্পট ব্যবহারজীবী নিজে সম্পূর্ণরূপে অপ্রভাবিত এবং অসংযুক্ত থেকে পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করার স্পৃহা পোষণ করছিল এবং এ উপায়ে সে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিল। উচ্চ হাস্যধ্বনিটি তার অবচেতন মস্তিষ্কে বিদ্রূপরূপে ক্রিয়া করেছিল এবং সেটা নৈশপ্রেতের মতো তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। মেয়েটি সীন নদীতে ঝম্প প্রদান করার ফলে যে ধ্বনি উত্থিত হয় তার মধ্যে ক্লামেন্স পূর্বের সেই নৈশ-হাস্যধ্বনির সামঞ্জস্য দেখতে পায় হয়ত। হয়ত সেই হাস্যধ্বনির কোন বাস্তব অস্তিত্বই ছিল না; সেটা ছিল তার অপূর্ণতারই প্রতিধ্বনি। তবু লম্পট ব্যবহারজীবীকে এ দু'টি ঘটনা সদাসর্বদা তাড়া করতে থাকে। সে নিজেকে নিজেই বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়ে দেখতে পায়, অন্যদেরকে অধীন না করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। এ-ও উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় যে, পৃথিবীতে "চরম সত্য" বলে কিছু নেই; সুতরাং স্বাধীনতা ও মুক্তির অর্থ আসলে আপোষ ও সমঝোতা। অল্পকথায়, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে যতটুকু ভোগ করা যায় ঠিক ততটুকু মাত্র। এই উপলব্ধির পরে প্যারীর এই লম্পট ব্যবহারজীবী সম্ভবতঃ অনুশোচনা বোধ করতে থাকে। এ অনুশোচনা-বোধের গভীরতা শেষপর্যন্ত তার মানসিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ করে; যার ফল তার স্বীকারোক্তি—যা আলবার্ট ক্যামু রচনা করেছেন। কিন্তু সে আত্মহত্যা করে না; করবে কিনা, তারও কোন স্পষ্ট ইংগীত পাওয়া যায় না। সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয় বটে, কিন্তু সে দস্তভয়স্কির 'দি পসেসড্' গ্রন্থের 'নৈরাজ্যবাদী'দের (Nihilist) মতো নয়। সচেতন এবং যুক্তিবাদী নৈরাজ্যবাদীর

কাছে জগৎ অর্থহীন। সুতরাং হয় সে সমগ্র মনুষ্যজগতের উপর নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করবে অথবা মনুষ্যজাতিকে নিশ্চিহ্ন করবে। এর নমুনা চরিত্ররূপে সম্ভবতঃ মার্কুই সেড এবং হিটলারকে উপস্থিত করা যায়। মনুষ্যজাতিকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত করার বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় হিটলার সদলবলে আত্মহত্যা করে। জীবনবোধটা হলো : আমিই যদি না থাকি, তা'হলে তুমিও থাকতে পাবে না। অথবা সেই পুরানো কথা : আমার পরে বিশ্ব জাহান্নামে যাক। নৈরাজ্যবাদ এবং আত্মহত্যা দর্শন আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাই বর্ণনা করলাম। কিন্তু এ-দর্শন যুক্তিনির্ভর নয়। জগৎ অর্থহীন এ বোধ জীবিত মানুষের বোধ; সুতরাং জগৎ, মানবজীবন এবং অর্থহীনতাবোধ মূলতঃ একই বোধ—একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না। মৃত মানবের কোন বোধ নেই। তিনটি উপাদানের যেকোন একটি উপাদানের অভাবে সম্পূর্ণ বোধটিই অবাস্তব হয়ে পড়ে।

মোহাম্মদ মোস্তফা বিপ্লবীও নয় বিদ্রোহীও নয়—নৈরাজ্যবাদী ত নয়ই। সে সাধারণ লোক এবং আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠে যতদূর মনে হয়, যাকে বলা হয় ভালো লোক সে তাই। তার অভিলাষ, স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন, বিবাহ, সন্তান উৎপাদন এবং অবশেষে দুনিয়ার আর দশজনের ন্যায় সাদামাটা মৃত্যুবরণ। সে খাদিজার প্রতি প্রেমাসক্ত নয়। তাহলে কী তাকে আত্মহত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করল? সম্ভবতঃ কাফকা'র আসামী-বিচারকের পটভূমিতেই শুধু তার এ আত্মহত্যা বিশ্লেষণ করা যায়। মোহাম্মদ মোস্তফা নিজেই অভিযোগকারী নিজেই আসামী নিজেই বিচারক। কিন্তু তার অপরাধ? আপাতঃদৃষ্টিতে কিছুই মনে হয় না; কিন্তু সে কি খাদিজার মৃত্যুর কারণ নয়? খাদিজা হয়ত আত্মহত্যা করে নি; হয়ত সে পুকুরের জলে দৈবদুর্বিপাকে ডুবে মরেছিল। মোহাম্মদ মোস্তফা এর কোন্‌টি সত্য, তা নির্ণয় করার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু কোন স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। এবং নিশ্চিত হতে পারে না বলে খাদিজার মৃত্যু ছায়ার মতো তাকে নিত্য-নিয়ত অনুসরণ করতে থাকে। কুমোরডাঙ্গা শহরের অধিবাসিগণকেও নদীর কান্না তেমনি নিত্য-নিয়ত অনুসরণ করছে। মোহাম্মদ মোস্তফা কি অনুশোচনার পীড়নে পীড়িত হচ্ছিল? সে-ত কোন গর্হিত

অপরাধ করে নি যে জন্য সে অনুশোচনা বোধ করবে ? একবার ছাত্রাবস্থায় তার পিতৃহন্তা বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণ তার বিরুদ্ধে সৎমার সংগে ব্যভি-চার এবং তদ্দ্বারা পিতা খেদমতুল্লার হুবহু আকৃতির একটি পুত্রসন্তান উৎ-পাদনের অভিযোগ এনেছিল। তখন সে এ অভিযোগ সরবে অস্বীকার করে নি ; কিন্তু দোওয়া-দরুদ পাঠ করেছিল এবং অবশেষে সারা মেঝেয় বমন করে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বমনটাকে ঘৃণার প্রতীক জ্ঞান করলে মোহাম্মদ মোস্তফা বিমাতার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল এরূপ সন্দেহ করা যায় না। সম্পূর্ণ উপন্যাসটিতে একবার এক স্থানে উল্লেখ ব্যতীত এ ঘটনার উল্লেখ অন্য কোথাও নেই ঃ মোহাম্মদ মোস্তফা এ-অপরাধে নিজেকে অভিযুক্ত জ্ঞান করেছিল এরূপ কোন ইংগিত পুস্তকের কোথাও পাওয়া যায় না। তা'হলে সে কি অপরাধ করেছিল ? ফুপাত বোনকে ছোটখাটো টুকিটাকি জিনিস উপহার প্রদান কোন অপরাধ হতে পারে না, এবং এরূপ উপহার প্রদানের অর্থ অন্যেরা যাই করুক, সে কোনদিন তার মধ্যে খাদিজাকে বিয়ে করার প্রতি-শ্রুতি বিদ্যমান ছিল বলে গণ্য করে নি। দু'টি অপরিণত বয়স্ক বালক-বালিকার মধ্যে ভবিষ্যতে বিয়ে হতে পারে, বাড়ীর লোকদের এরূপ আলাপ সালাপ দু'পক্ষের কাউকেই বাধ্যবাধকতায় বন্ধন করে না। পাড়াগাঁয়ে এরূপ কথাবার্তা হয়ে থাকে ; পরে অন্যত্র বিয়েও হয়ে যায়। কোন আনুষ্ঠানিক কথাবার্তায় খাদিজা এবং মোহাম্মদ মোস্তফার অভিভাবকবর্গ নিযুক্ত হয় নি ঃ কোন ঘোষণাও উচ্চারিত হয় নি। সুতরাং মোহাম্মদ মোস্তফা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এরূপ অভিযোগও তার বিরুদ্ধে ওঠে না। তা'হলে কি এমন গর্হিত অপরাধ সে করেছিল, যে জন্য সে বিচারকরূপে নিজেকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে ? অজানিতভাবে অন্যের মৃত্যুর কারণ হওয়ার জন্যে কি ? নিজের অজান্তে অন্যের ক্ষতি বা মৃত্যুর কারণ হওয়া এমন গর্হিত অপরাধরূপে গণ্য হতে পারে না — যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অথচ উপন্যাসটি পাঠের পর একমাত্র এ-সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, মোহাম্মদ মোস্তফা নিজেকে সরলপ্রাণা এক নারীর মৃত্যুর কারণ মনে করেছিল এবং এ অপরা-ধের অভিযোগ সে ফরিয়াদীরূপে নিজের বিরুদ্ধে এনেছিল। সে কিছুকাল উভয়পক্ষের হয়ে সওয়াল-জওয়াব করেছিল এবং অবশেষে বিচারকরূপে নিজের মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছিল। ঠিক এক কাফকার ট্রায়াল যে সুরে লিখিত

আলোচ্য গ্রন্থটি সে স্তরের নয়। প্রথমতঃ, ট্রায়ালের অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক জীবন যাপন করে যায়। দ্বিতীয়তঃ, ট্রায়ালের অস্পষ্টতা সত্ত্বেও এটা বোঝা যায় যে, সেখানে অভিযোগ জীবনের অর্থহীনতার (Absurdity) বিরুদ্ধে। সেখানে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা আরো সহজ ক'রে বললে, মৃত্যু মানেই মৃত্যুদণ্ড। তৃতীয়তঃ, ট্রায়ালের মূল চরিত্রটি অনেক উপরের স্তরের মানুষ। সে যে দার্শনিক এবং গ্রন্থটিও যে রূপকধর্মী রচিত, এটা গ্রন্থটি পাঠ মাত্রেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু 'কাঁদো নদী কাঁদো'-কে রূপক গ্রন্থরূপে গণ্য করা যায় না এবং মুহাম্মদ মোস্তফা কেও একটি সাধারণ মানুষের অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান হয় না। এক পক্ষে সে কিছুটা আত্মভোলা, কিন্তু সে দার্শনিক নয়। সুতরাং গ্রন্থটি পাঠান্তে একমাত্র এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে এ্যাবসারডিটি দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে আত্মহত্যা করে নি; বরং এটাই মনে হয় যে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, সে-বিকৃতির কারণ যাই হোক।

গ্রন্থটিতে পাঁচ পাঁচটি মৃত্যু আছে। এতগুলো মৃত্যু ঘটানোর প্রয়োজন ছিল না। মৃত্যুগুলোর মধ্যে খাদিজা এবং মোহাম্মদ মোস্তফার মৃত্যুই জিজ্ঞাসা জাগ্রত করার মতো। কাহিনীকারের চাচার জন্য কথা দ্বিতীয় স্ত্রীর আমদানী এবং তার মৃত্যু, দুইই বাহুল্য মনে হয়। পূর্বেই বলেছি, খেদমতুল্লাহর মৃত্যু পূর্ব-বঙ্গের সমাজ-জীবনে মাঝে মাঝে ঘটিত ঘটনার একটি। উকিল কফিল-উদ্দীনের মৃত্যু পূর্ব-পরিকল্পিত। বিশেষ একটি দার্শনিক বোধের সাথে সংগতি-পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আখিরে এই ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। কিন্তু তজ্জন্য যে প্রস্তুতি আবশ্যক ছিল, তা করা হয় নি, ঘটনাটা চমকপ্রদ হয়েছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক হয় নি।

তবু পুস্তকটি পূর্ব-বঙ্গের উপন্যাস সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রম এবং বুদ্ধিবাদ ভারাক্রান্ত উপন্যাস রচনার ব্যাপারে সম্ভবতঃ প্রথম পদক্ষেপ। গ্রন্থকারের ভাষা নির্দিষ্ট ক্ষণের ব্যবধানে পড়ন্ত মেঘের বৃষ্টি-বিন্দুর মত অনুচ্চ ধ্বনি ও ব্যঞ্জনায় গতিশীল। স্থানে স্থানে শব্দ ব্যবহার এবং নতুন শব্দ নির্মাণে প্রশ্নসাপেক্ষ, অভিনবত্ব প্রদর্শন সত্ত্বেও ভাষার মাধুর্য ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ। মুদ্রণ প্রমাদ কিছু আছে। প্রচ্ছদপট বিশেষ চিত্তাকর্ষক নয়।

[বাংলা একাডেমী পত্রিকা—কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩]

গ্রন্থপঞ্জী

১। Albert Camus — The Rebel
২। ঐ — The Myth of Sisyphus
৩। ঐ — The Fall
৪। ঐ — The Plague
৫। D. F. Kafka — The Trail
৬। Feodor Dostoevsky — The Possessed
৭। James Joyce — Ulysses
৮। Marcel Proust — A La Recherche du Temps Perdu.

হুইটম্যানের কবিতা

মার্কিন কবি ওয়ালট হুইটম্যান সম্বন্ধে তাঁর দেশের আর একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি ইমারসন বলেন : "Most extraordinary piece of wit and wisdom America has yet contributed"। ইমারসনের এ-উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। শুধু wit and wisdom নয়, কবি হিসাবেও তাঁর স্থান পৃথিবীর অন্য যেকোন খ্যাতনামা কবির নীচে বলে মনে হয় না। তাঁর সমসাময়িক কবি মডেলিয় যে সময়ে মানব-চরিত্রের 'satanism'-এর দিকটি উদঘাটিত করে আনন্দিত এবং সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের আঁস্তাকুড় থেকে কাব্যের মাল-মসলা সংগ্রহে ব্যস্ত, হুইটম্যান তখন রচনা করছিলেন সমৃদ্ধ যৌবনের বান। শুধু দাস প্রথা নয়, মানুষে মানুষে কৃত্রিম প্রভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লড়ছিলেন। তাঁর কাব্য একদিকে যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গীত, অন্যদিকে তেমনি সাম্য ও সখ্যতার উদাত্ত আহ্বান। তাঁর নিজের কথায় : "most of the great poets are impersonal, I am personal ··· In my poems, all revolves round, concentrates in, radiates from myself. I have but one central figure, the general human personality typified in myself But my book compels, absolutely necssitates, every reader to transpose himself or herself into the central position and become the living tonation, actor, experiences himself or herself or every page, every aspiration every line."

নিজেকে সাধারণ মানবিক ব্যক্তিত্বের প্রতিভূরূপে দাবী করা কম কথা নয়। এতদ্বারা একদিকে যেমন সামাজিক জীবনের মধ্যে নিজেকে লীন করা বুঝায়, অপরদিকে তেমনি সমাজ জীবনের উন্নয়ন প্রয়াসী সমস্ত দাবী-দাওয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ ক'রে তোলার সংকল্পও প্রকাশ

পায়। কোন মানুষ যখন নিজেকে সমগ্র বা সমষ্টির অংশ বিবেচনা না ক'রে সমগ্রের আদর্শরূপ বলে কল্পনা করে এবং তাঁর সে দাবী মানব সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তখন তাঁর স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়; সে তখন যা বলে তা সমগ্রেরই উচ্চকিত বাণী হয়ে দাঁড়ায়। এ-জন্যই পৌণে একশতাব্দীকাল পূর্বে পরলোক গমন করেও হুইটম্যান এখন পর্যন্ত জীবিত কবি। ইতিমধ্যে বহু খ্যাতি লুপ্ত হয়েছে, বহু প্রতিভা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়েছে, কিন্তু হুইটম্যান লুপ্ত হন নি।

হুইটম্যান কাব্যের একটি নতুন দিক উন্মোচন করেন। দীর্ঘকাল ধরে ইঙ্গিত, রূপক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে বলার যে পরোক্ষ কাব্যিক রীতি প্রচলিত ছিল, হুইটম্যানই সম্ভবতঃ প্রথম শক্তিশালী কবি যিনি তা বর্জন করে সাধারণের বোধগম্য ভাষায়, সাধারণ জগতে চর্মচক্ষে দৃষ্ট প্রাকৃতির সম্পদ এবং মানবদেহ ও তার জৈবিক স্বাভাবিকতাকে মালমসলারূপে ব্যবহার করে এবং সাধারণকে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনা করেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর কবিতা সাধারণ হয়ে যায় নি। তাঁর রচনারীতি প্রত্যক্ষ হয়েও অত্যন্ত জোরালো। তাঁর শব্দচয়ন ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

বিখ্যাত মার্কিন লেখক হেনরি থরিও তাঁকে 'বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রী' আখ্যা দিয়েছেন। থরিওর এ মন্তব্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বলা যায়, হুইটম্যান অস্থিমজ্জা এবং রক্ত-মাংসময় মানুষের কবি। এ কবিতার শোণিত অতীন্দ্রিয় রসে সংকর নয়। এর আবেদন প্রত্যক্ষ এবং স্বয়ংক্রিয়। হুইটম্যানকে শিল্প-বিপ্লবোত্তর নতুন যুগের প্রথম কবি বললেও সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হয় না। এবং শুধু প্রথম কবিই নন, সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠতম কবিও। এদেশের আর এক মহৎ কবি হুইটম্যানকে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করান। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। প্রত্যক্ষ রীতিতে এবং সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তিনিও বহু কবিতা রচনা করেন। 'সাম্যবাদী' এ-রচনা-রীতির একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। হুইটম্যানের কতগুলি বিখ্যাত কবিতার ভাবানুবাদও করেন কাজী নজরুল ইসলাম। সীমিত ক্ষেত্রে হলেও বাঙলার মাত্র আর একজন কবি হুইটম্যানের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি হচ্ছেন ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁর "আমি তারে ভালোবাসি অস্থি-মাংস সহ" বিখ্যাত পদটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

হুইটম্যানের জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনা একটিমাত্র পুস্তকের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ বলা যায়। সারা জীবন তিনি "Leaves of grass" নামক গ্রন্থটিকে সংশোধিত পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত করেছেন। এই গ্রন্থের বহু কবিতার মধ্যে কয়েকটি কবিতা সৈয়দ আলী আহসান অনুবাদ করেছেন। অবশ্য কাব্যের ক্ষেত্রে 'অনুবাদ' শব্দটি ব্যবহার করা সঙ্গত নয়; কেননা ভালো কবিতার হুবহু অনুবাদ হয় না; কেউ করতে চেষ্ট করলে তার কাব্যিক সৌন্দর্য লুপ্ত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম 'অনুরণন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনুরণন অথবা অনুসরণ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়; কেনন' কবিতা ভাষান্তরিত হওয়া মাত্রই মৌলিক রচনা হয়ে যায়। নজরুল ইসলামের "অগ্রপথিক হে সেনাদল" হুইটম্যানের ভাবানুবাদ হয়েও আলাদা কবিতার মর্যাদা লাভ করেছে। এবং এ-কারণেই কবিতা ভাষান্তর কেবলমাত্র শক্তিশালী কবি দ্বারাই সম্ভব। ওমর খৈয়ামের রুবাই ভাষান্তরিত করেও ফিটজিরাল্‌ড আলাদা কবি।

সৈয়দ আলী আহসান পূর্ব-বাঙলার অন্যতম শক্তিশালী সমকালীন কবি। হুইটম্যান অনুবাদেও তিনি কাব্যিক কৌশল ও দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। মূলের সঙ্গে যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করার খাতিরে তিনি অনুবাদে গদ্য রীতির আশ্রয় নিলেও ভাষান্তরিত হয়ে কবিতাগুলোর কাব্যিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ আছে। তার দু' একটি উদাহরণ:

হুইটম্যানে আছে:

I habitan of the Alleghanis, treating of
him as he is in
himself in his own rights
Pressing the pulse of the life that has
seldom exhibited itslf
(the great pride of man in himself),
Chanter of Personality, outlining what is yet to be,
I project the history of the future."

আলী আহসান বাঙলা করেছেন:

"আমি মাটির অধিবাসী—মানুষ
আমার কাছে মানুষ তার নিজের অধিকারে—

জীবনের সবল ধমনীকে অনুভব করেছি
যা সহজে প্রকাশিত নয়
(অর্থাৎ নিজেকে নিয়ে তার যে সত্যিকারের গর্ব),
ব্যক্তিত্বের গুণকীর্তন করেছি, যা হবে
রেখায় তার আভাস এঁকেছি,
আমি ভবিষ্যতের ইতিহাসকে নির্ণয় করেছি।"

হুইটম্যান বলছেন,

"There was never any more inception than there is now
Nor any more youth or age than there is now,
And will never be any more perfection than there is now.
Urge and urge and urge,
Always the procreant urge of the world
Out of the dimness opposite equals advance, always sub-
stance and increase. always sex,
Always a Knit of identity, always distinction always a
breed of life,
To elaborate is no avail, learned and unlearned fell it is
so.

সৈয়দ আলী আহসানের অনুবাদ ঃ

এখনকার মতো উন্মেষ অতীতে কখনও ছিল না।
এখনকার মতো যৌবন এবং প্রাচীনতাও ছিল না
এখনকার মতো পরিপূর্ণতা আগামীতে কখনও হবে না।
এখন যা আছে তার চাইতে অধিক স্বর্গ বা নরক ভবিষ্যতে
কখনও হবে না।
সর্বদাই পৃথিবীতে নতুন সৃষ্টি-ক্ষমতার উত্তেজনা—
উত্তেজনা, দাহ এবং উৎসাহ
অন্ধকার অস্পষ্টতা থেকে সমতুল্য বিপরীত শক্তি
অগ্রসর হয়। তাৎপার্য এবং

বুদ্ধিতে সর্বদাই যৌন-চেতনা
সর্বদাই দুই সত্তার একীকরণ। সর্বদাই বিশিষ্ট
স্বাক্ষর। সর্বদাই একটি জন্মের মৌল উপাদান।
বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই—শিক্ষিত,
অশিক্ষিত সকলেই এ-সত্যকে জানে।

অথবা—হুইটম্যানের :

Has any one supposed it lucky to be born ?
I hasten to inform him or her it is just as lucky to die and I know it.
I pass death with the dying and birth with the new-wash'd babe, and am not contained between my hat and boots,
And peruse manifold objects no two alike and every one good,
The earth good and the stars good, and their adjuncts all good,
I am not an earth nor an adjunct of an earth,
I am the mate and companion of peoples, all just as immortal and fathomless as myself
(They do not know how immortal, but I know),

আলী আহসানের :

"কেউ কি কখনও ভেবেছ যে,
জন্মগ্রহণ করা শুভভাগ্যের লক্ষণ ?
আমি তাকে জানাতে চাই—
মৃত্যুতেও জন্মের মতোই সৌভাগ্যের সূচনা।
আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করি মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গে
এবং জন্মকে পরিস্নাত নবজাতকের সঙ্গে—
আমি আমার দেহ ও সজ্জার মধ্যেই আবদ্ধ নই,
অজস্র বিচিত্র কর্মের—অনুসরণ আমার

সেখানে প্রতিটি কর্মই অনন্য এবং একক
এবং প্রতিটিই অনবদ্য
ধরিত্রী সুন্দর, সুন্দর নক্ষত্র সম্ভার এবং
সুন্দর তার অনুসঙ্গ।
আমি ধরিত্রী নই অথবা তার অনুসঙ্গই নই
আমি পৃথিবীর মানুষের সহচর
আমার মতই তারা অতল এবং অমর
(তারা জানে না যে তারা অমর
কিন্তু আমি জানি)

মনে হয় কি যে আমরা অনুবাদ পাঠ করছি? হয়ত দু' এক জায়গায় শব্দসংক্ষেপ করার সুযোগ ছিল; অথবা, বিকল্প শব্দ প্রয়োগ করা যেতো। কিন্তু বিবেচ্য তা' নয়, বিবেচ্য কাব্যের মাধুর্য এবং রূপ অক্ষুন্ন আছে কি-না।

পুস্তকটির প্রারম্ভে একটি বিস্তারিত ভূমিকা আছে। এই ভূমিকাটিতে হুইটম্যানের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

গ্রন্থের শেষে মূল ইংরেজী কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে। এতে পাঠককে মূলের জন্য হুইটম্যান হাতড়াতে হয় না। এটিও একটি অতিরিক্ত সুবিধা।*

। সমকাল—বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭২।

---

* সৈয়দ আলী আহসান অনূদিত হুইটম্যানের কবিতার সমালোচনা।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

১৯১৯ সালের ভারত সরকারের রিপোর্টে ঐ বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণদান প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলো লিপিবদ্ধ আছে :

এই ব্যাপক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যসাধন জাতীয় লক্ষ্যরূপে বহু পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল এবং সেই ঐক্য সাধিত হয়েছিল। এই ব্যাপক উত্তেজনার সময়ে এই ঐক্য সাধারণ লোকের মধ্যেও সংক্রমিত হয়; এমন কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানও তাদের পারস্পরিক কলহ ও মত-পার্থক্য বিস্মৃত হয়। এক আশ্চর্য ভ্রাতৃত্বভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হতে থাকে। হিন্দুরা সর্বসমক্ষে মুসলমানের হাতের পানি পান করতে থাকে। মুসলমানেরাও তাই করে। মিছিলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধ্বনি ওঠে। হিন্দুও একসঙ্গে মিছিলকারীদের হাতে শোভা পেতে থাকে। কোন একটি মসজিদের মিম্বর থেকে হিন্দু নেতৃবৃন্দকে বক্তৃতা পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়।

বলাই বাহুল্য, এরূপ অভাবনীয় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অন্যতম কারণ ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রথম মহাযুদ্ধকালীন নীতি। সরকার একদিকে বিখ্যাত মণ্টেগো ঘোষণা দ্বারা পাক-ভারতবাসিকে স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস প্রদান করে, অপরদিকে দমননীতিও অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। মুসলমানদের অসন্তোষের আরো কারণ ছিল। ভারতীয় মুসলিম তখনও তারা মনে করতো সারা ইসলাম জগতের ইমাম, খলিফা সব কিছু। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে। ব্রিটিশ সরকার এই অপরাধে তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা মক্কার গবর্নর হোসেনের (শরীফ হোসেন নামে এদেশে খ্যাত) সঙ্গে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়। শরীফ হোসেন ইংরেজের

প্ররোচনায় তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং স্বাধীন হয়ে যায়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত হয়। প্যান-ইসলামিজমের মোহগ্রস্ত পাক-ভারতীয় মুসলিম সমাজ তুরস্কের এই দুর্ভাগ্য—বিশেষ করে খেলাফত লোপ পাওয়ার সম্ভাবনায় বিক্ষুব্ধ হয়। পাক-ভারতীয় হিন্দু সমাজ এই প্রশ্নে মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে। বস্তুতঃপক্ষে ১৯১৯ সাল এবং তৎপরবর্তী কিছুকালের হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি ছিল তুরস্ক ও খেলাফত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশ সরকার দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছে বলে যে গালভরা ঘোষণা করেছিল তার উত্তরে মৌলানা মোহাম্মদ আলী তাঁর বিখ্যাত "কমরেড" পত্রিকায় "মিশর ত্যাগ করো" শিরোনামে এক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর ভাই শওকত আলী 'হামদর্দ' নামে উর্দু পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এই অপরাধে অর্থাৎ তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংস এবং খেলাফত লোপ করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী দু'জনই বন্দী হন। মৌলানা আজাদকে পূর্বেই বন্দী করা হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় মুসলিম সমাজের মনে তখন ইংরেজ বিরোধ পুঞ্জিভূত হয়েছিল।

পাক-ভারতবাসির সঙ্গে প্রবঞ্চনা করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। মণ্টেগো ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটেনের রক্ষণশীল মহলে এই সামান্য সুযোগ-সুবিধা পাক-ভারতবাসিকে দেওয়ার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ওঠে। তার উত্তরে সরকারপক্ষ থেকে লর্ড কার্জন বলেন ঃ "যদি ঘোষণার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং কার্যপ্রণালী থাকতো তাহলেও আপত্তির কারণ বুঝতে পারতাম।" লর্ড কার্জনের এই উক্তি থেকেই প্রবঞ্চনার মনোভাব বুঝা যায় এবং ১৯১৯ সালের পাক-ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান তা উপলব্ধি করে। আন্দোলনের তোড় বৃদ্ধি পেতে থাকে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বিলাতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তারা কলম্বো যাওয়ার পর তাদের 'ছাড়পত্র' বাতিল করা হয়। এতে ক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পায়।

ইংরেজ সরকার তখন মিঃ রাউলাটের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন দমনমূলক ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য। এই

কমিটি দু'টি আইন প্রণয়ন করার সুপারিশ করে। একটি ভারত রক্ষা-আইন, যার মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল তা পুনবহাল করার জন্য। এই আইনবলে বিশেষ আদালত কর্তৃক বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিচার করা যেতো। বিচারের বিরুদ্ধে কোন আপীল ছিল না। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরও এই আইনবলে আটক করা যেতো অথবা তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা যেতো। তাছাড়া প্রাদেশিক সরকার সন্দেহভাজন যে-কোন লোককে কোনরূপ কারণ দর্শান ব্যতিরেকে যে-কোন স্থানে আটক রাখার ক্ষমতা এই আইন দ্বারা প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় আইনটি দেশের সাধারণ দণ্ডবিধি আইনটিকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করবার জন্য রচনা করা হয়। এতে অপরাধে "রাজসাক্ষী"-কে অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার বিধি থাকে। তাছাড়া যে-সমস্ত দোষের জন্য ফৌজদারী মামলা রুজু করা যেতো না সে সমস্ত দোষের জন্যও পুলিশকে তদন্তের ক্ষমতা দেওয়া হয় এই আইনে। তাছাড়া দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তাঁর নিকট থেকে দু'বছর সদ্ভাবে থাকার জামীন মুচলিকা আদায়ের বিধিও এতে থাকে। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রথম আইনটি সর্বোচ্চ আইন পরিষদ Supreme Legislative Council) কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয়।

এদিকে রাউলাট কমিটির সুপারিশ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার অভিযানে অবতীর্ণ হন। তিনি সত্যাগ্রহ করার অভিলাষও ব্যক্ত করেন। উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধী তখনও এদেশে নতুন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ-আফ্রিকায়। রাউলাট কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ করার অভিলাষ ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হঠাৎ কেমন করে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তার উত্তর ভারত-সরকারের ১৯১৯ সালের রিপোর্টেই পাওয়া যায়। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, মিঃ গান্ধী পাশবিক বলে বিশ্বাস করেন না। দক্ষিণ-আফ্রিকার অত্যাচারিত ভারতীয়দের সংগ্রামে তিনি সত্যাগ্রহকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হলো যে-কোন অত্যাচারিত ব্যক্তি বা শ্রেণীর পক্ষে দাঁড়ানো। মিঃ গান্ধী মনে করলেন রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের অস্ত্র ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য। ১৯১৯ সালের

২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখেই তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রস্তাবিত রাউলাট আইন বিধিবদ্ধ হলে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করবেন। এই ঘোষণাকে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। ১৮ই মার্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতিটি প্রকাশ করেন। "১৯১৯ সালের ১নং ভারতীয় দণ্ডবিধি সংশোধনী আইন, এবং ২নং জরুরী দণ্ডবিধি সমতা আইন" আমার মতে ন্যায়-সঙ্গত নয়। এগুলো স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের নীতির মূলে আঘাত করেছে এবং রাষ্ট্র ও ভারতের নিরাপত্তা যেসমস্ত মৌলিক ব্যক্তিগত অধিকারের উপর নির্ভরশীল উক্ত আইনদ্বয় তা বিনষ্টকারী। সুতরাং আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি যে, এ-সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ হলে এবং যতদিন পর্যন্ত না এগুলো প্রত্যাহৃত হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা এ-সমস্ত আইন অমান্য করবো। এ-ছাড়া অতঃপর যে কমিটি নিযুক্ত হবে তারা এ-শ্রেণীর অন্যান্য যেসমস্ত আইন অমান্য করার সঙ্গতি মনে করবে তাও অমান্য করা হবে। আমরা আরো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি যে, আমাদের সংগ্রামে আমরা সত্যকে অনুসরণ করবো এবং জীবন, ব্যক্তি ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ হিংসাত্মক কার্য করবো না।"

আইন পাশ হওয়া মাত্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। ৩০শে মার্চ তারিখটিকে হরতাল দিনরূপে ঘোষণা করা হয়। উপবাস উপসনা ও শুদ্ধির দিনরূপেও দিনটিকে পালন করার কথা বলা হয়। পরে তারিখ পরিবর্তন করে ৬ এপ্রিলকে হরতাল দিবস করা হয়। কিন্তু সময় মতো সংবাদ না পৌঁছাতে দিল্লীতে ৩০শে মার্চ তারিখেই হরতাল পালিত হয় এবং মিছিল বের হয়। মিছিলের উপর গুলীবর্ষণ করা হয় এবং পাঁচ ব্যক্তি নিহত হয়; ফলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এই সময়ে ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাব প্রদেশটিকে আন্দোলনের বাইরে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়; কেননা পাঞ্জাব থেকেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে লোক আসতো। পাঞ্জাবী বাহিনীই ব্রিটিশের পক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধে নানা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়েছিল এবং বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছিল। যুদ্ধশেষে সামরিক বাহিনীর বহুলোক মাতৃভূমি পাঞ্জাবে ফিরে এসেছিল। সুতরাং এদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হচ্ছে ইংরেজ শক্তির সর্বনাশ হবে এই বিবেচনায় পাঞ্জাবের তৎকালীন গভর্নর স্যার মাইকেল ও-ডায়ার পাঞ্জাবকে রাজনৈতিক

আন্দোলনের সংক্রামক ব্যাধি থেকে সর্বশক্তি প্রয়োগে মুক্ত রাখবে স কল্প করলেন। ১৯১৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশন অমৃতসরে অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয়েছিল। ডক্টর সইফুদ্দীন কিচলু এবং ডক্টর সত্যপাল সাংগঠনিক কাজ করছিলেন। অমৃতসরের জেলা ম্যাজিস্টেট তাদের নিজ বাড়ীতে ডেকে এনে গ্রেফতার করে এবং অজানা স্থানে প্রেরণ করে। সংবাদটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দিক থেকে জনতা তাদের মুক্তির দাবী নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠির দিকে আগমন করতে থাকে। সেনাবাহিনী জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে এবং কয়েক ব্যক্তি হতাহত হয়। জনতা নিহত ও আহতদের নিয়ে মিছিল করে অগ্রসর হয়। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বাড়ীতে অগ্নিপ্রদান করে এবং ব্যাঙ্কের ইয়োরোপীয় ম্যানেজারকে হত্যা করে। জনতার আক্রমণে মোট পাঁচজন ইয়োরোপীয় নিহত হয়। প্রতিশোধস্পৃহ সরকার অমৃতসর শহরটির শাসনভার ১০ই এপ্রিল তারিখে সামরিক বাহিনীর হস্তে অর্পণ করে।

আন্দোলন গুজরানওয়ালা ও কাসুরেও ছড়িয়ে পড়ে। কাসুরে জনতা একটি রেলস্টেশনে আগুন দেয়, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে ফেলে, কতিপয় ইয়োরোপীয় যাত্রীবাহী একটি ট্রেন আক্রমণ করে দু'জন সৈন্যকে পিটিয়ে হত্যা করে। গুজরানওয়ালাতেও এরূপ অশান্তি চলতে থাকে। কলকাতা এবং লাহোরেও প্রবল বিক্ষোভ চলতে থাকে। পাঞ্জাবের অশান্তির সংবাদ পেয়ে গান্ধী দিল্লী রওয়ানা হন। পথে রেলগাড়ীতে তাঁর পাঞ্জাব প্রদেশ ও দিল্লী প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারী করা হয়। গান্ধী এই আদেশ মান্য করতে অস্বীকার করলে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়। কলকাতায় পুলিশের গুলীতে কয়েক ব্যক্তি নিহত হয়।

এদিকে অমৃতসরের অবস্থা ক্রমাগত অবনতির দিকে যেতে থাকে। ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক আইন সরকারীভাবে জারী করা হয় নি; কিন্তু সরকারী মতে, কার্যতঃ ১০ই এপ্রিল থেকেই সামরিক আইন সেখানে জারী ছিল। সরকারীভাবে অমৃতসর ও লাহোরে সামরিক আইন জারী করা হয় ১৫ই এপ্রিল তারিখে। ১৩ই এপ্রিল ছিল বৎসরের প্রথম দিবস। ঐ দিবসে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক জনসভার কথা ঘোষণা করা হয়। এটি ছিল প্রাচীর ঘেরা খোলার মাঠ। এবং একটি মাত্র সরু প্রবেশ দ্বার, যা ছিল যানবাহন প্রবেশের অনুপযুক্ত।

বালক-বালিকা, শিশু ও স্ত্রীলোকসহ পার্কটিতে প্রায় বিশ সহস্র লোক সমবেত হন। এই সময়ে জেনারেল ডায়ার ১০০ শত দেশীয় এবং ৫০ জন ইয়োরোপীয় সৈন্যের এক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বাহিনী নিয়ে পার্কে প্রবেশ করে। হংসরাজ নামক একব্যক্তি তখন বক্তৃতা করছিলেন। জেনারেল ডায়ার জনতার উপর গুলীবর্ষণের আদেশ দেয়। পরবর্তীকালে হান্টার কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে জেনারেল ডায়ার বলে, সে জনতাকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার জন্য মাত্র দু'তিন মিনিট সময় দিয়েছিল। বলাই বাহুল্য, একটিমাত্র সরু পথ দিয়ে দু'তিন মিনিটের মধ্যে বিশ হাজার লোকের নির্গমন সম্ভব ছিল না। ডায়ার ১৬০০ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে। অর্থাৎ গুলীগোলা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নিরস্ত্র জনতার উপর অগ্নিবর্ষণ চলে। সরকারী হিসাব মতে, এই গুলীবর্ষণের ফলে ৪০০ জন নিহত এবং প্রায় দু'হাজার লোক আহত হয়। দেশীয় সৈন্যেরা এই গুলীবর্ষণ করে; তাদের পশ্চাতে ছিল ইয়োরোপীয় সেনাদল। আহত লোকদেরকে সারা রাত ঐস্থানে রাখা হয়। চিকিৎসা দূরের কথা পিপাসার্ত আহতদের পানিও দেওয়া হয় নি। ডায়ার পরবর্তীকালে বলে, "যাতে পরে সে উপহাসাস্পদ না হয়, সেজন্য সে জনতাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তার কাছে আরো গুলীগোলা থাকলে সে আরো বহুক্ষণ ধরে গুলী চালাতো। গুলীগোলা ফুরিয়ে যাওয়াতে সে মাত্র ১৬০০ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করতে সক্ষম হয়।" বস্তুতপক্ষে, "সে একটি সমরাস্ত্রসজ্জিত গাড়ীও নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু প্রবেশপথ সরু হওয়ায় সেটি ভিতরে নিতে পারে নি।" জেনারেল ডায়ার এই আফসোস মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল কিনা জানা যায় না।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস। বলাই বাহুল্য, এই পৈশাচিক নিধনযজ্ঞে হিন্দু-মুসলমান ও শিখ প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর লোক আহুতি দিয়েছিলেন।

পাক-ভারতবাসির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে এই দিনটি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হওয়ার নয়।

[পূর্বদেশ—২০. ৪. ৬৯]

সমাজ-চেতনা বনাম মূল্যবোধ

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এদেশে রাজা, বাদশা, সামন্ত, নৃপতির যুগ চলছে। ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত হলেও সামন্ত যুগের অবসান হয় নি। অর্থাৎ সমষ্টিগত চেতনার দিক থেকে এদেশ এবং ইউরোপ [illegible] একই সমতলে বিরাজমান ছিল। বরং সম্ভবতঃ [illegible]। অর্থবিত্ত, দরবারী জৌলুশ প্রভৃতি এমন কি সাধারণ শিক্ষার দিক থেকেও এদেশ বরং তৎকালীন ইউরোপ থেকে কিছুটা অগ্রসর ছিল। দোষ অনেক ছিল, কিন্তু এদেশের লোকের কাছে জলদস্যুতা, বোম্বেটেগিরি প্রভৃতি ভদ্র পেশারূপে পরিগণিত ছিল না। অসততা এবং গোঁড়ামি উভয় [illegible] ছিল। কিন্তু ঐ সনাতনপন্থিতার মধ্যেও ইউরোপ একটি বিষয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সমষ্টিগতভাবে না হলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেন এবং স্বাধীন চিন্তার জন্য দণ্ডও দিতেন—এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পশ্চাদ্‌পদ হতেন না। এদেশে একমাত্র ধর্মীয় মতভেদের ক্ষেত্র ছাড়া মত প্রকাশের জন্য কেউ দণ্ডভোগ করে নি।

রেনি দেকার্তের কথাই ধরা যাক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তিনি বলেছিলেন: আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি। অন্যভাবে, আমি আছি বলেই আমি চিন্তা করি। সহজ দৃষ্টিতে মনে হবে, দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত মত [illegible] মত দু'টি পরস্পরের পরিপূরক। আমি দার্শনিক নই, দর্শনের চুলচেরা বিচারে প্রবেশ করা আমার কাজ নয়, বরং সেটা আমার সাধ্যাতীত কাজও বটে। চেতনা এবং মূল্যবোধ প্রসঙ্গে লেখার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে কিভাবে আরম্ভ করবো সে কথা ভাবতে গিয়ে সহসা রেনি দেকার্তের ঐ বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়লো। বিপরীত মতটা মনে পড়াও খুবই স্বাভাবিক। তখন সহসা এটাও মনে হলো, উভয় মতই বুঝিবা সত্য এবং একটি অপরটির

পরিপূরক। সত্য বটে, আমি যতক্ষণ জীবিত এবং সশরীরে বিদ্যমান আছি ততক্ষণই আমি চিন্তা করতে পারি। মৃত্যুর পরে আমিও নেই, চিন্তাও নেই। কিন্তু জীবিতকালে সশরীরে বিদ্যমান থাকা সকল প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য ; ওটা মানুষের কোন বিশেষ গুণ নয়। সশরীরে বিদ্যমানতা তখনই অর্থ-বহ হয় যখন সেই বিদ্যমানতা সম্বন্ধে—তার আরম্ভ, বিকাশ, চরিত্র, ধর্ম-প্রবণতা, সামাজিক এবং বৈদ্যক্তিক দায়িত্ব, জগতে তার ভূমিকা, এবং আদর্শ ও লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করা হয়। প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষ সে চিন্তা করে। সুতরাং মানবেতর পশু, জড়পদার্থ প্রভৃতির বিদ্যমানতা এবং মানুষের বিদ্যমানতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য উপলব্ধি করেই হয়ত দেকার্ত বলেছিলেন : আমি চিন্তা করি বলেই আমি আছি।

উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, জড়পদার্থ নৈসর্গিক জগৎ, তার ধর্ম এবং চতুষ্পদ-দ্বিপদ পশু-পক্ষীর বিষয়েও একমাত্র মানুষই চিন্তা করে, ওরা নিজেরা করে না ; কেননা চিন্তা করার ক্ষমতা ওদের নেই। দেকার্ত এ জন্যই হয়ত চিন্তাকে আপন অস্তিত্বের উপরে স্থান দিয়েছিলেন।

আজ আমরা স্বাধীন জাতিরূপে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করছি। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে নয় ; সশস্ত্র যুদ্ধ করেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আদর্শ এবং লক্ষ্য না থাকলে কেউ স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয় না ; কেননা স্বাধীনতার যোদ্ধা ভাড়াটে সৈনিক নয়। অতএব নিঃসন্দেহে বলতে পারি, স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করার প্রাক্কালে এবং যুদ্ধ চলাকালে আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল এবং সেগুলোতে দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল।

আদর্শ ও লক্ষ্যে দৃঢ়আস্থা থাকাও মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত। তিন বৎসর জাতির জীবনে কিছু নয়—সূচনা মাত্র। বিকাশ ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দীর্ঘ সময় আবশ্যক। একথা সবাই বোঝেন, বোঝাবার আবশ্যকতা নেই। সুতরাং যে আদর্শনিষ্ঠা এবং লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব অর্থাৎ প্রাণকে তুচ্ছ করে স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিলাম ; যুদ্ধ জয়ের পরও সে-সব গুণ আমাদের মধ্যে থাকার কথা—অন্ততঃপক্ষে থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বোম্বেটে আমরা নই, পূর্বের কিছু ঐতিহ্য আমাদের আছে। তা'ছাড়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ

যতই খারাপ হোক, সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, ইত্যাদি পাঠ করেছি, আমাদের পুত্র-কন্যারা এখনও পাঠ করছে। ভুল মতামত বরদাশত করা যায় যদি যুক্তি দ্বারা তা খণ্ডনের স্বাধীনতা থাকে জেফারসনের এ উক্তি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ করে। ব্রিটিশ শাসনামলে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার কলাকৌশল এবং নীতি সম্বন্ধেও অনেক কিছু শিখেছি এবং দেখেছি—এমন কি আমরা তদ্বিষয়ে কিছু কিছু ট্রেনিংও পেয়েছি। সুতরাং নবজাত রাষ্ট্রের জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ কি হওয়া উচিৎ এবং কি নয়, তা আমরা বুঝি না বা জানি না এমন ত হতে পারে না। তবু তিন বৎসর যেতে না যেতেই মূল্যবোধের সঙ্কট, চেতনার সঙ্কট বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোন কিছু ব্যাধিগ্রস্ত হলে বা পচে গেলে তার সঙ্কট সৃষ্টি হয়, যার জন্মই হলো সেদিন, তার আবার সঙ্কট কি? সে-ত শুধু এগিয়ে যাবে! এবং এ-কথাও ঠিক প্রকৃতই আমরা সঙ্কটের সম্মুখীন, সঙ্কটের মধ্যে বসবাস করছি। খাদ্য সঙ্কট-ত আছেই, কিন্তু তার চাইতেও অধিক সঙ্কটাপন্ন মূল্যবোধ।

তাহলে ধরে নিতে হয়, কোথাও আমাদের ভুল ছিল—চেতনার মধ্যে কোথাও ফাঁক ছিল—স্বাধীনতার সংগ্রাম চলাকালে সে ফাঁক কারো চোখে পড়ে নি—আজ সে ফাঁকই পুনরায় দেখা দিয়েছে এবং স্বাধীনতার সুযোগে অধিক প্রসারতা লাভ করেছে। উপরে পলেস্তারা লাগিয়ে সে ফাঁক বোজানো যাবে না, কোন ফাঁকই চুনকামে বোঝে না। চেতনার রাজ্যে যে ফাঁক, তা বোঝবার একমাত্র পথ প্রথমে ফাঁকটা কোথায় এবং কি, তা উপলব্ধির চেষ্টা করা এবং উপলব্ধির পরে তা উপযুক্ত মাল-মসলার সহায্যে পূরন করা। এই কার্যক্রমের মধ্যেই মূল্যবোধের বিবর্তন ঘটে—যাকে সহজ ভাষায় সংস্কৃতির রূপান্তর নাম দেওয়া যায়।

মূল্যবোধ কি এবং কেন, আসুন আমরা প্রথমে এ প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করি। তা'হলেই আমাদের চেতনায় কোথায় দৈন্য, তা আবিষ্কার করতে পারবো। রাজনীতি, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম এমন কি স্বয়ং মানুষও মানুষের জন্য। সুতরাং পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র মূল্যবোধ বিদ্যমান। সেটি হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ। আবহমানকাল থেকে এই

মানবিক মূল্যবোধ সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত, প্রসারিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম চলছে। চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই এ সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। সমস্ত বিশ্বজনীন ধর্ম, লোকায়ত দর্শন ইত্যাদির উদ্ভব এবং বিস্তৃতির হেতু এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা এই একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই পৌঁছি যে, আসলে মানবিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেয়া এবং প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল সেগুলোর উদ্দেশ্য। স্বাজাত্য এবং স্বাতন্ত্র্য যা লক্ষ্য করি, সেটা হচ্ছে নৈসর্গিক পরিবেশজাত বৈশিষ্ট্য মাত্র, বিভক্ত স্বাতন্ত্র্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষ অর্থেই মানুষরূপে মানুষের অবস্থিতি এবং বিদ্যমানতার সার্থকতা। মানবতার জন্যই মূল্যবোধের আবশ্যকতা। যে স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাজাত্যবোধ মানবিক মূল্যবোধকে খণ্ড-বিখণ্ড এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে সেটা আসলে প্রকৃত মূল্যবোধ নয়, মূল্যবোধের নামে স্বল্পমেয়াদী সঙ্কীর্ণ শ্রেণী স্বার্থ সিদ্ধির ষড়যন্ত্র মাত্র। এ ধরনের ষড়যন্ত্র সাময়িক শ্রেণী স্বার্থসিদ্ধ করলেও পরিণামে তার ফলাফল কখনও শুভ হয় না। বিশ্বজনীন মানবিক চেতনাকে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অসূয়া প্রভৃতি আদিম প্রবৃত্তি জাগ্রত করে খণ্ডিত বিভক্ত করা হয়। এটা নেগেটিভ অর্থাৎ নৈতিবাচক কার্যের ফলাফলও হয় নৈতিবাচক। বিয়োগ চিহ্নের সাথে বিয়োগ চিহ্ন যোগ করলে ফল বিয়োগ চিহ্নই হয়, কোন অবস্থাতেই যোগ চিহ্ন হয় না; সুতরাং লোকসানের পরিমাণ এবং বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পায়।

এ আলোচনাকে স্মরণ রেখে এখন আসুন আমরা অন্য একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই, ব্রিটিশ শাসন প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু আমরা কি সত্য সত্যই মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলাম? অন্যরূপে উপস্থিত করলে প্রশ্নটা দাঁড়ায়, বাঙালী মুসলমান সমাজ উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের পরে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিল কি? ভ্রূকুটি করে কটু হলেও সত্যের সম্মুখীন হওয়া ভাল। মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু হতে শেষ অবধি মানবিক মূল্যবোধ—অর্থাৎ সর্বশ্রেণী এবং মতের মানুষের কল্যাণবোধ বিদ্যমান ছিল। মানবতা বর্জিত স্বাধীনতা তিনি চান নি, তাঁর চিন্তার মধ্যে অসততা ছিল না। তিনি উপায় এবং লক্ষ্যকে আলাদাভাবে

তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতৃত্ব জনমতের এই বিভ্রান্তির সুযোগ গ্রহণ করেছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বাংলাদেশ হতে বিতাড়িত করার দুঃসাহস তারা ওখানেই পেয়েছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী একবার লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের আবশ্যকতাও বুঝেছিলেন। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমনের জন্য তিনি মহাত্মা গান্ধীর সাথে সত্যাগ্রহেও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সব কিছুতেই বড় বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমরা কি আমাদের ভুল বুঝেছিলাম? আমরা কি আমাদের 'অপরাধ' স্বীকার করেছিলাম? মহাত্মা গান্ধী একবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি হিমালয় প্রমাণ ভুল করেছেন। আমরা কি আমাদের চিন্তার দৈন্য, বিভ্রান্তি এবং পূর্বের কার্যক্রমের ভুল স্বীকার করে পরিচ্ছন্ন সেন্ট হতে নতুনভাবে কাজ শুরু করেছিলাম? সত্যের খাতিরে জবাব দিতেই হয় তা' করি নি। বরং বিভ্রান্তিকে মূলধন করেই কাজ শুরু করেছিলাম। সম্পূর্ণ ভুল তথ্য এবং নঞর্থক ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানী স্বাধীনতাকে আমাদের জন্যও স্বাধীনতা জ্ঞান করে আমরা কার্যে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, আমরা যে পথ ধরেছিলাম তা সঠিক পথ ছিল না। একই নেতৃত্ব এবং কর্মীদের দ্বারা পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দু'দু'বার একটি দেশ স্বাধীন হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। এতদ্বারাই প্রমাণিত হয় আমাদের আগের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল না, ছিল ইংরেজের বদলে অন্যদের পরাধীনতা স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়ার 'সংগ্রাম'। বলা যেতে পারে, পাকিস্তান না বানালে বাংলাদেশ বানানো যেতো না। যুক্তিটি এত খেলো এবং অর্বাচীনতার পরিচায়ক যে তার জবাব না দিলেও চলে। শুধু এটুকু বলা চলে যে, পাকিস্তান না বানালে পাকিস্তানও হতো না, এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিরিশ লক্ষ মানুষও হারাতে হতো না।

এখনও আমরা সেদিনের ভ্রান্তি স্বীকার করে নিচ্ছি না। অনেকে বরং আমাদের ইতিহাসের সেই অন্ধকার অধ্যায়কে গৌরবময় ঐতিহ্যরূপে 'প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন। চেতনা এবং মূল্যবোধের সংকটের উদ্ভব এখান থেকেই। আমরা পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতি ও সামঞ্জস্যহীন নীতি অনুসরণ করে চলছি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ পূর্বের সেই বিকৃত এবং নঞর্থক

মানসিকতাকেই জনমনে পুনর্জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় রত। অথচ বাস্তব অবস্থা তার বিপরীত। যে বিকৃত মানসিকতার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেই বিকৃত মানসিকতা পুনর্বাসনের চেষ্টা করলে মূল্যবোধের সংকট দেখা দেবে বই কি। যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী বর্বরেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাদেশের মানুষ হত্যা করেছে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নারীর উপর নির্যাতন করেছে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের গৃহে অগ্নি প্রদান করেছে এবং মালামাল লুণ্ঠন করেছে। প্রত্যুত্তরে বাংলার মুক্তিযোদ্ধাগণও পাকিস্তানী বর্বরদেরকে যেখানে যে অবস্থায় পেয়েছে হত্যা করেছে, মুসলমান বিবেচনায় রেহাই দেয় নি। যুদ্ধ দু'টো সত্য প্রমাণ করেছে : প্রথমতঃ, এক ধর্মাবলম্বী হলেই এক জাতি হওয়া যায় না, বস্তুতঃপক্ষে জাতি গঠনের কোন উপকরণ ধর্ম নয়. হলে পৃথিবীর যাবতীয় মুসলমান এক জাতি-রাষ্ট্রে বাস করতো। দ্বিতীয়তঃ, যেসব বস্তুকে আমাদের কাছে দীর্ঘকাল ধরে মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকাল বলে প্রচার করা হয়েছে, কার্যক্ষেত্রে সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন দূরের কথা, প্রচারকগণই সকলের আগে সেগুলোর প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। এই স্ববিরুদ্ধতাও উদ্ভব ব্রিটিশ আমলের রাজনীতি হতে ; কেননা মিঃ জিন্নাহ পরিচালিত তৎকালীন রাজনীতিতে মানবিক নীতি অনুসরণ করা হয় নি। শুধু তাই নয়, ইসলাম ধর্মে গর্হিত পাপরূপে পরিগণিত কার্যাদি করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মাবিরুদ্ধ কিংবা মানবিক নীতি বিরুদ্ধ কিনা তা বিচার করা হয় নি, অস্ত্ররূপে ব্যবহারযোগ্য কিনা শুধু তাই বিচার করা হয়েছে। মওলানা আবুল আজাদের ন্যায় জ্ঞানতাপস বিশ্ববরণ্যে মনীষী, যার রচিত পবিত্র কুরানের ভাষ্য সমগ্র মুসলিম জগতে সমাদৃত এবং অতুলনীয়, তাঁকে মূর্খেরাও গান্ধার কংগ্রেসের শোবয় ইত্যাদি কদর্য গালি দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। কলকাতার ঈদের জামাতে তিনি ইমামতী করতেন। দলবদ্ধ মূর্খেরা তাঁকে সে কাজ করতে দেয় নি। আধুনিক জগতে রাজনৈতিক প্রশ্নে মতের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। হজরত আলীর (রাঃ) সময়ে খেলাফতের প্রশ্নে মুসলমান সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে ; কিন্তু রসূলুল্লাহর সাহাবী হজরত মাবিয়ার প্রতি কোন সুন্নী মুসলমান কটুবাক্য উচ্চারণ করতে পারে না। যারা করে তারা সুন্নী মুসলমানের দৃষ্টিতে

পাপী। স্মরণীয় যে, মিঃ জিন্নাহ ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজনৈতিক প্রশ্নে মতানৈক্য স্বীকার করে নেয়ার নাম আধুনিক গণতন্ত্র। জিন্নাহর রাজনীতিতে মওলানা আজাদের আস্থা ছিল না। তিনি ভিন্ন মত পোষণ করতেন। একমাত্র এ কারণে মওলানা আজাদকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হতে হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, আমাদের চেতনার দৈন্য কত গভীর ছিল। পঁচিশ বৎসর যেতে না যেতেই মওলানা আজাদ অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছেন। ইংরেজ চলে যাওয়ার পরমুহূর্তে জিন্নাহ নিজেই স্বীকার করেন, পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান নেই—আছে শুধু পাকিস্তানী নাগরিক। অদ্যাবধি মাইনরিটি সমস্যার সমাধান হয় নি। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিহারীগণ মিঃ জিন্নাহর মাইনরিটি সমস্যারই এপিল। উপমহাদেশের ইতিহাস চূড়ান্তভাবে লিখিত হয়ে গেছে—এখনও তা বলার সময় আসে নি। কিন্তু যা বলছিলামঃ নীতি এবং ধর্ম-বিশ্বাসহীন রাজনীতিকগণ কর্তৃক দাঙ্গা, নরহত্যা, নারী নির্যাতন, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কার্য উৎসাহিত হয়েছে। গুণ্ডাদেরকে হিরো রূপে দেখা হয়েছে। দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে আল্লামা শিরোপা দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রায় হাজার বৎসরের বাঙালী মুসলমান সমাজের ইতিহাসে একমাত্র বিস্ময়কর প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলামকে কাফের বলতেও কুণ্ঠা বোধ করে নি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। দেশ বিভাগকালে পাঞ্জাবে যে পাশবিক বর্বরতা, নরহত্যা, নারী নির্যাতন, অগ্নিপ্রদান, লুণ্ঠন ইত্যাদির নজিরবিহীন তাণ্ডবলীলা চলেছিল তার শরীক এবং প্রত্যক্ষদর্শী ছিল পাঞ্জাববাসিগণ। আমরা তার নিন্দা দূরের কথা বরং বর্বরতাকে বীরত্ব জ্ঞান করেছি। সুতরাং [illegible] পঁচিশ বৎসর পরে সৈনিক নামধারী পাঞ্জাবী নরপশুগণ [illegible] তা তাদের জন্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। [illegible] পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ [illegible] মানবিক চেতনা গঠিত—মূল্যবোধ [illegible] থেকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ধান করেছিল। তাবে একটু অগ্রসর হয়ে [illegible], মিঃ জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ এবং বাংলাদেশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসে কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই মানবতা এবং ইসলাম ধর্ম বিরোধী গর্হিত অপরাধকে পুণ্যকর্মরূপে চালানো হয়েছে।

ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এককথায় বলা যায় ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ এবং তার পরবর্তী পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস অজ্ঞতা এবং মূল্যবোধের অবনতির ইতিহাস। বলা বাহুল্য, এজন্য অন্য সম্প্রদায়ও দায়ি ছিল, কিন্তু অপরের অপরাধকে নিজের অপরাধের পক্ষে যুক্তিরূপে উপস্থিত করা যায় না- ধর্মাধিকরণে তা গ্রাহ্য নয়; বরং এটাও অজ্ঞানতার পরিচায়ক।

ইংরেজ আমলেও অন্যায়-অন্যায় ছিল, প্রচুর অপরাধও ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধবোধটিও ছিল। শাসক শ্রেণী এবং দেশবাসির মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা মানবতা বিরোধী নৈতিক স্খলনকে অপরাধ গণ্য করতেন- অপরাধকে ঘৃণা করতেন এবং আপন জীবনকে আদর্শরূপে জন সম্মুখে রেখে অপরাধ প্রতিরোধ এবং দমনের চেষ্টা করতেন। সামাজিক রাজনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই গর্হিত অপরাধমূলক কার্যাবলীকে আপন উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্ররূপে তাঁরা ব্যবহার করতেন না। জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগই সর্বপ্রথম এই মানবিক নীতি বর্জন করে মানবেতর সমাজের নীতি গ্রহণ করে। আমরা তখন বিরুদ্ধাচরণ করা দূরের কথা বরং দুর্নীতিকেই সুনীতি বলে জ্ঞান করেছি এবং বাহবা দিয়েছি। সুতরাং সংকট আসলে চেতনার অন্তরের, মূল্যবোধের সংকট সাম্প্রদায়িকতার ফলমাত্র।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ স্বাধীনতার ইস্যুতে আমরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে যুদ্ধে নামি নি। আমরা আক্রমণ করি নি। আমরা ছয়দফার সংগ্রাম থামাতে চেয়েছিলাম। আমরা আপোষ মীমাংসায় সম্মত ছিলাম। মূর্খরা তাতে সম্মত না হয়ে আমাদিগকে অতর্কিত আক্রমণ করে। আমরা আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হলাম: আত্মরক্ষা করতে হলে প্রতি-আক্রমণ করতেই হয়- আমরাও তাই করেছি। আত্মরক্ষার প্রেরণা স্বাভাবিক জৈব প্রেরণা- সকল জীবের মধ্যে এ জৈবস্বভাব বিদ্যমান। সুতরাং আত্মরক্ষার প্রেরণাকে আদর্শের প্রেরণা বলা ভুল। এতদ্বারা আমি একথা বোঝাতে চাচ্ছি না যে, আমাদের মধ্যে আদর্শের প্রেরণা ছিল না; অবশ্যই ছিল, কিন্তু প্রথমে সেটা ছিল গৌণ- ছিল চেতনার নিম্নস্তরে। যুদ্ধ চলাকালে সেটি দীপ্তি লাভ করতে থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য একটি নগ্ন দিকও মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের আপামর জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়।

তারা অত্যন্ত সহসা বিস্ময় বিমূঢ়তার মধ্যে দেখতে পায়, দীর্ঘকাল ধরে কুচক্রী পাকিস্তানী শাসকগণ বাংলাদেশবাসির কাছে যে বস্তুকে আদর্শ বলে তুলে ধরেছে, পালনীয় বলে নির্দেশ দিয়েছে, তারা তার কোনটাতেই বিশ্বাসী নয়। তারা ধার্মিকের মুখোশ পরে বাংলাদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। বাংলাদেশকে ঊনবিংশ শতাব্দীসুলভ কলোনীতে পরিণত করে বাঙ্গালী জাতিকে চিরকাল দাস করে রাখার মতলবে তারা পাকিস্তানী জাতীয়তা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ধর্মীয় জাতীয়তা প্রভৃতির ধ্বনি তুলেছে। সেই হীনস্বার্থ-হানির সম্ভাবনা দেখা দেয়া মাত্র তারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালে তারা পাঞ্জাবে যে পাশবিক তাণ্ডব চালিয়েছিল ১৯৭১ সালে বাংলা-দেশে তারই পুনরাবৃত্তি করে। অকারণে ব্যাপক নরহত্যা, নারী নির্যাতন, জনপদে অগ্নি প্রদান, লুণ্ঠন ইত্যাদি শুধু মানবতা বিরোধী কার্য নয়, যে ধর্মে বিশ্বাসী বলে তারা দাবী করে সেই ধর্মেও গর্হিত পাপরূপে বর্ণিত। এসব কার্যাবলী তারা মহাউল্লাসে করতে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা তার সমুচিত জবাব দেয়। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণও মুক্তি যোদ্ধা-দের সঙ্গে যোগ দেয়। সহসা তাদের চোখ খুলে যায়।

কিন্তু সহসা চোখ খুলে গেলেও আত্মরক্ষার স্বাভাবিক জৈব তাগিদ থেকে যে সংগ্রামের উৎপত্তি চেতনার বৈপ্লবিক রূপান্তর শুধু তাতে হয় না। দীর্ঘকালব্যাপী মিথ্যা প্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত চেতনাকে যুক্তি এবং মানবতার পথে আনয়নের জন্য সচেতন পরিচর্যা আবশ্যক ছিল। আদর্শ-সচেতন নেতৃত্ব তার ভার গ্রহণ করতে পারতো। সত্যের খাতিরে বলতে হয়, নেতৃত্বের মধ্যে সে চেতনার অভাব ছিল। বাংলাদেশের ন্যায় জনবহুল দেশে রাজ-নৈতিক স্বাধীনতার শুরুতেই সমান্তরালে যে দূরদর্শী সামাজিক দায়িত্ব পালন অপরিহার্য ছিল তা পালন করা হয় নি। পঁয়ত্রিশ বৎসরে—বিশেষ করে যুদ্ধ চলাকালে চিরন্তন মূল্যবোধ নিহত হয়েছিল। তার পুনর্বাসনের জন্য প্রয়ো-জন ছিল আদর্শনিষ্ঠ নেতৃত্বের। নেতৃত্ব তদ্বিষয়ে না ছিলেন সচেতন, না রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত। তাঁরাও মুখোশ গ্রহণ করলেন। সমাজতন্ত্রের বুলি উচ্চারিত হলো, কিন্তু ব্যক্তিগত অর্থবিত্ত বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা রয়েই গেলো। বরং বলা যায় শিথিলতা, গাফিলতি এবং নিষ্ঠার অভাবের দরুন বহুগুণ বৃদ্ধি পেলো। রাজনীতি সেই পুরনো

ধারায় চললো। কথা ও কাজের মধ্যে বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করা হলো না। রাজনীতিক রাজনীতিকই রয়ে গেলেন রাষ্ট্রনীতিক হতে পারলেন না। আপন দোষ এবং ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্য অনুপস্থিত তৃতীয় পক্ষকে উপস্থিত এবং দায়ি করার যে কৌশল পাকিস্তানী আমলে অনুসৃত হতো বাংলাদেশেও স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীল মহল সে কৌশল নতুনভাবে প্রয়োগ করলো। নেতৃত্ব তার বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করলো না। 'ভাগ করো' এবং 'শাসন করো' নীতির কোন আবশ্যকতা এ দেশে ছিল না। কিন্তু তারও পুনরাবির্ভাব ঘটলো। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ হয়ে উঠলো ফ্রী ফর অল। এমনকি যে অপরিনামদর্শিতা এবং ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার শাস্তিস্বরূপ আমরা একই নেতৃত্বের আহ্বান এবং পরিচালনায় মাত্র পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দেশকে দু'দু'বার স্বাধীন করার কৌতুকপ্রদ এবং নজীরহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম তিন বৎসর যেতে না যেতেই সে সব ধ্যান-ধারণা পুনর্বাসিত করার হীন চেষ্টাও অবাধে চলছে। যতদিন যাচ্ছে ততই যেন অন্ধতা, বধিরতা এবং বাকশক্তিহীনতা পুনরায় আমাদিগকে পেয়ে বসছে।

সুতরাং নিহত চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধগুলো পুনর্বাসিত হলো না। সুযোগ এসেছিল, কিন্তু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার আমরা করি নি।

সংকটটা মূল্যবোধের নয়, চেতনার অভাবটাই আসল সংকট।

[পূর্বদেশ—১৬. ১২. ৭৪]

অপরাজেয় কবি ফররুখ আহমদ

ফররুখ আহমদকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। কেমন করেই বা ভুলি। কবিতা অনেকেই লিখেন, সাহিত্য সাধকেরও অভাব নেই। মানুষের সুকুমার বৃত্তিকে জাগরিত করার উদ্দেশ্যে যাঁরা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন, তাঁরা সবাই স্মরণীয়। স্মরণীয় বলেই আমরা তাঁদের কাউকে ভুলি না—শত সহস্র বৎসর পরেও জীবনের কোন না কোন সংকট অথবা আনন্দের মুহূর্তে স্মরণ করি। তবু স্মরণীয়দের মধ্যে বৈশিষ্ট্য খুঁজে ফিরি। সে বৈশিষ্ট্য কি, কেমন তার রূপ ও গন্ধ, তা সব সময় স্পষ্ট করে বলা যায় না। কেননা অপরাপর বৈশিষ্ট্যের সাথে শিল্প-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তুলনীয় নয়। স্পর্শ দ্বারা শিল্প-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায় না। শিল্প-সাহিত্য ইতিহাস এবং পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হলেও মানুষের গভীর উপলব্ধি থেকেই তার সৃষ্টি। সুতরাং তার রূপ-রস-গন্ধ সবকিছুই উপলব্ধির বস্তু। ফররুখ আহমদের কাব্যের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা এখানে সম্ভব হবে না—এই মুহূর্তে আরো সম্ভব নয়; কেননা আমি শোকার্ত। এই মুহূর্তে [illegible] শুধু এ কথাই মনে পড়ছে যে, তিনি ছিলেন প্রকৃতই নির্যাতিত মানবতার কবি—দয়া-দাক্ষিণ্য সভ্যতা এবং ধর্মের মুখোশধারী নরপিশাচদের দ্বারা সততঃ-প্রপীড়িত অত্যাচারিত দুঃখী মানুষের কবি। সেই সাথে ফররুখ আহমদ ছিলেন সুস্থ-সবল জীবন ধর্মেরও কবি। অথচ বিত্ত স্বচ্ছলতার জীবন তাঁর ছিল না। তাঁর কবি জীবনের পরিবেশও ছিল প্রতিকূল দুর্ভিক্ষ জরা-মৃত্যু, দাঙ্গা, মহামারী, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদির মধ্যে বাস করেই তাঁকে লিখতে হয়েছে। কিন্তু তিনি নৈরাশ্যের কবি ছিলেন না। মৃত্যু যদি পরাজয় হয় তবে সে পরাজয় তাঁকে মানতে হয়েছে : কিন্তু বেঁচে থাকা অবস্থায় তিনি মৃত্যুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তিনি ছিলেন উন্নত-শির অপরাজেয়, তেমনি শৈল্পিক জীবনেও ফররুখ আহমদ

ছিলেন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। লোভী মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে মৃতের শব তাঁকে পীড়িত ও ব্যথিত করেছে; কিন্তু তাতে তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হন নি। তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন ঃ

তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে
পদাঘাত হানি,
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-
প্রান্তে টানি,
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ
নিখিলের
অভিশাপ বও।
ধ্বংস হও।
তুমি ধ্বংস হও॥

"যে জড় সভ্যতা এবং মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজকে" কবি ফররুখ আহমদ "পদাঘাত হানি" "জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে" টেনে নেয়ার সংকল্প বাংলা তেরোশ পঞ্চাশে প্রকাশ করেছিলেন তারা এখনও পৃথিবীর সর্বত্র ছোবল মারছে—বিড়ম্বিত বিপর্যস্ত করছে অগণিত সাধারণ মানুষের জীবন, কিন্তু তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে বলেই মনে হয়। সেদিন তিনি "আকাশে চাঁদ" দেখেছিলেন। দেখেছিলেন "দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালির বাঁধ।" তাই তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন "ছিড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ, নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ" এবং "যদিও সূর্য বন্দী আঁধারের ঘরে কাতে" তবু তিনি "পূর্ব দিগন্তে" আলোর গান শুনতে পেয়েছিলেন। অন্ধকার অমানিশার মধ্যেও আলোর গান শুনতে পাওয়ার নামই যদি জীবনবন্দনা হয় তা' হলে ফররুখ আহমদ অবশ্যই ছিলেন শিল্পী। ফররুখ আহমদের কাব্য বৈশিষ্ট্য বলতে আমি এই বুঝি।

ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয় তখন তিনি কলেজের ছাত্র; তাঁর কবিতা কলকাতার খ্যাতনামা পত্রপত্রিকার সবে প্রকাশিত

হচ্ছে। এ সময়ে একবার তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন যাদবপুরে তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে থাকতেন। আজও মনে পড়ে, কবি বেনজীর আহমদ এবং প্রখ্যাতনামা লেখক বসুধা চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর মাসিক মোহাম্মদীর অফিসে এবং কলকাতার বিভিন্ন আড্ডায়, কফি হাউসে এবং রাস্তাঘাটে তাঁর সঙ্গে অসংখ্যবার দেখা হয়েছে। কখনও তাঁর মধ্যে বিমর্ষভাব দেখি নি, দেখি নি উন্নাসিকতা। বয়সের দিক থেকে তিনি ছিলেন আমার চাইতে প্রায় ছ'বৎসরের ছোট। কিন্তু তাঁর সঙ্গে স্থাপিত হয় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কলকাতার জীবন সহসা সংক্ষিপ্ত হলো। ঢাকায় আসার পর তাঁর সঙ্গে নাজিমুদ্দিন রোডের এবং পরে নতুন রেডিও অফিসে প্রায়ই দেখ-সাক্ষাৎ হতো। মালীবাগের এক মশকাকীর্ণ অন্ধকার গলির কেরোসিনের হ্যারিকেন আলোকিত চালা-ঘরের ছোট্ট একটি কামরায় প্রায়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা হতো। সেখানেই তিনি সপরিবারে বাস করতেন। কি রেডিও অফিস সংলগ্ন রেস্তোরাঁ কি তাঁর বাসা-বাড়ী কোথাও থেকে বিনা চা-নাস্তায় কারো পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হতো না। তিনি জর্দা-পান ভালো বাসতেন। সেই পানের ভাগও পানখোর মাত্রেই পেতো। তিনি আমার বাড়ীতেও মাঝে মাঝে আসতেন। আমার সম্মুখে রয়েছে আমার বড় মেয়ের বিয়েতে উপহার দেয়া তাঁর সাত সাগরের মাঝি। তাঁর স্বাক্ষরের মধ্যেও যেন দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুহীন অপরাজেয় প্রাণের দীপ্তি। বহু বিষয়ে আমরা একমত ছিলাম না। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বোধ করি কোন সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকের মতভেদ ছিল না। তিনি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি চাইতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতিরেকে আত্মার মুক্তিও সম্ভব নয়, সম্ভব নয় পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করা। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন বা বিপ্লবের পথ সম্পর্কে তিনি যে ধারণা পোষণ করতেন তদ্বিষয়ে আমি বা অন্যের ঐক্যমত পোষণ না করলেও তাঁর বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন সুযোগ তিনি কখনও দেন নি। তিনি নিজে যা বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিগত জীবনেও তা' পালন করতেন। তাঁর কবি খ্যাতি নিয়ে ধনৈশ্বর্যের মালিক হওয়া আইয়ুবী আমলে অত্যন্ত সহজ ছিল। তাঁর চাইতে অল্প খ্যাতিমান অনেক লোক সে আমলের সুযোগের সদ্ব্যবহার

করে যাঁর যাঁর ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন; কিন্তু তিনি সে পথ ঘৃণাভরে বর্জন করেন। রাও ফরমান আলী, আলতাফ গওহর প্রমুখ ব্যক্তি তাঁর মালীবাগের অন্ধকার খুপরিতে নানা প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এসব ঘটনার দু'একটি জানি। কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে সে-সব উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন কি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের অতি সাধারণ প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

তখন আমি বাংলা একাডেমীতে চাকুরি করি। তার আগে কয়েক মাস রাইটার্স গিল্ডের চাকুরিও করেছিলাম। ১৯৬০-৬৫ সালের কথা বোধ করি। তখন তিনি নৌফেল ও হাতেম এবং হাতেমতাই রচনায় ব্যাপৃত। তা'ছাড়াও তিনি শিশুসাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। ঐ সময়েও তাঁর অর্থাভাব ছিল। বাংলা একাডেমীতে গেলে তিনি কখনও আমার সঙ্গে দেখা না করে আসতেন না। অর্থাভাবের মধ্যেও তিনি কখনও রচনায় বিরতি দেন নি। তাঁর মনের দার্ঢ্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। মত ও পথের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আপন আদর্শের প্রতি তাঁর যে অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল সেটা তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা জাগিয়েছে। সর্বপ্রকার মোনাফেকী এবং কৃত্রিমতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। নিজের জীবন দিয়ে তিনি তাঁর প্রমাণও দিয়ে গেছেন। ফররুখ আহমদ আজ আমাদের মধ্যে নেইঃ যেতে না দিতে চাইলেও যেতে দিতেই হয়। কিন্তু ফররুখ আহমদ তার কাব্য এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন।

[পূর্বদেশ—২২ ১০. ৭৪]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

একটি অনালোচিত দিক

পণ্য-উৎপাদকের সঙ্গে পণ্য-ব্যবহারকারীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যেদিন ছিন্ন হলো, মানুষ সেদিন হতেই ব্যক্তিমানুষে পরিণত হতে লাগলো। শিল্প-বিপ্লব এ জন্যে দায়ী; কিন্তু তা সত্ত্বেও এটাকে মানব সভ্যতার অবনতি বলা যায় না। পণ্য যদি শুধু মুনাফার জন্যে তৈরী না হয়ে সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বণ্টন করা হতো, তাহলে আজ আমরা শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এমনকি এক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও যে সংঘর্ষ ও অন্তর্বিরোধ দেখছি তা দেখতে পেতাম না। এই হানাহানি ও সংঘর্ষের ফলে বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত যন্ত্রণাগ্রস্ত মানুষ, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পী-সাহিত্যিক, তাঁদের মধ্যে অনেকে আজ হতাশাগ্রস্ত আউটসাইডার—মানব সমাজের মধ্যে বাস করেও আচরণ ও চিন্তার দিক থেকে তার বাইরে অবস্থান করছেন। এর প্রভাব ইদানীং মানবসমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ ক্রমাগত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। মানবিকতার স্থান অধিকার করছে ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা,—ব্যক্তিগত প্রাধান্য বিস্তারের অভিলাষ। কিন্তু মানবেতিহাসের আদি যুগ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষের সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার পশ্চাতে রয়েছে সমষ্টিগত অনুসন্ধিৎসা। ভাষা নির্মাণ মানবসভ্যতা বিকাশের সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক এবং সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ। কেমন করে ভাষা পেলো মানুষের মুখ, তা এখন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে রহস্যাবৃত হলেও পণ্ডিতেরা অনুমান করেন—ভাব ও উদ্দেশ্য বিনিময় ও ব্যক্ত করার এই সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহন শ্রেণী ও স্তরহীন মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। জীবিকা নির্বাহকে সহজতর করার অত্যাবশ্যক প্রয়ো-

জনে মানুষ কর্ম সম্পাদনের জন্যে যেদিন আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াও অন্য যন্ত্র নির্মাণ ও তার ব্যবহার শিখলো, সেদিন সেই যন্ত্রের নাম প্রদানের আবশ্যকতাও অনুভূত হলো। প্রথম প্রস্তর-কুঠারটির আদলে শত শত কুঠার নির্মিত হতে লাগলো কৌমের প্রত্যেকের ব্যবহারের জন্যে। কার্যকরতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে তার নকশা ও শেকেল মাঝে মাঝে পরিবর্তন লাভ করলেও কুঠারের যা ধর্ম—অর্থাৎ তার কুঠারত্ব যথাযথ থাকলো। সুতরাং সম্মিলিত-ভাবে এবং সমতার ভিত্তিতে জীবিকার্জন ও নির্বাহশীল কৌম তার সম্মিলিত কর্মের জন্যে অত্যাবশ্যক এ যন্ত্রটির নাম দিল কুঠার। কুঠার বলা-মাত্র কৌমের সমস্ত লোক ঐ বিশেষ শব্দটিকেই বুঝতে লাগলো। আবার বিশেষ কোন কৃষিজাত খাদ্যবস্তুকে চিহ্নিত করার জন্যে হয়তো কৌম সহসা নাম দিল ধান—ধান নাম থেকে আলাদা হয়ে সর্বজনগ্রাহ্য একটি বিশেষ শব্দে পরিণত হলো। এমনি করে যৌথ এবং সম্মিলিত উদ্যোগে সৃষ্টি হলো ভাষা। ক্রমে ক্রমে তার মধ্যে বস্তুর নাম ব্যতিরেকেও ভাবাত্মক সর্ব-জনগ্রাহ্য শব্দাবলী সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ব্যবহারের ফলশ্রুতিরূপে তৈরী হলো।

আরো বহু নজীর উল্লেখ করা যায়। ক্ষুদ্র নিবন্ধে তা সম্ভব নয়। ভাষা সৃষ্টির এ নজীরই চিন্তাশীলের জন্যে যথেষ্ট। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, মানুষ সবকালে সমাজবদ্ধ জীব। একের সাথে অপরের পরিচয় যত ঘন ও নিবিড় হয়, ততই সে নিশ্চয়তা বোধ করে। বিনিময় প্রথায় পারস্পরিক অভাব পূরণের সময়েও পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ নির্ভরশীলতা বিদ্যমান ছিল। কারিগর ফরমাশ মতো যন্ত্র নির্মাণ করতো। ফরমাশদাতা কারিগরের জন্যে নিয়ে আসতো আহার্য। অর্থাৎ ব্যবহারকারীকে জানার পূর্বে কেউ কোন বস্তু নির্মাণ করতো না।

শিল্পবিপ্লব এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সূত্রটি ছিন্ন করে দেয়। শিল্পপতি অনিশ্চিত এবং অপরিচিত ব্যবহারকারীর নিমিত্ত পণ্য প্রস্তুত করে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য, কেমন করে বেশী মুনাফা অর্জন করা যায়। নির্মিত পণ্য ব্যবহারকারীর কল্যাণে আসবে না কি তার অনিষ্ট সাধন করবে সে-সদ্বিবেচনার দায়ভার থেকে শিল্পপতি মুক্তি নিয়েছে।

অপরদিকে কারখানার যন্ত্রপাতি যত বেশী উন্নত এবং ব্যাপক উৎপাদনের উপযোগী হতে লাগলো, তত বেশী হতে লাগলো শ্রমবিভাজন। ফলে কারিগর কি দ্রব্য নির্মাণ করছে তা জানা থেকেও সে বঞ্চিত হলো। সে নির্মিত বস্তু থেকে আলগা হয়ে পড়লো। নির্মাণের আনন্দ তার রইলো না। সে হয়ে পড়লো ছিটকে-পড়া একটি একক মাত্র। কিন্তু এই ব্যাপক উৎপাদনও যদি মুনাফার্জনের জন্যে তৈরী না হয়ে মানবজাতির হিতকর ব্যবহারের জন্যে—তার মানবিক জৈব প্রয়োজন পূরণের জন্যে উৎপাদিত হ'তো, তাহলে মানুষ একক হয়ে পড়তো না, তার সমষ্টিরূপ অব্যাহত থাকতো। কিন্তু মানবজাতির ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যে শিল্প-বিপ্লব তার সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং আত্মার উন্নয়ন করতে পারতো, সেটাই হলো তাকে আউটসাইডার করার যন্ত্র। নিরাশ একক বুদ্ধিজীবী হতাশার সঙ্গীত গাইতে লাগলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস-কাব্য হয়ে উঠলো বহুকাল পূর্বে বর্জিত নিয়তিবাদের বাহন—যে শক্তিকে সে জয় করে এসেছে তার কাছেই আত্মসমর্পণ।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্মরণে আমার উপরি-উক্ত কথাগুলো কিছুটা অপ্রাসংগিক শোনাতে পারে। তাই ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যাকে আমার কৈফিয়তও বলা যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়টা এবং তার পরবর্তী তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর এদেশে ইংরেজ রাজত্বের স্বর্ণযুগ। রাজা রামমোহন রায়ের মাধ্যমে ধর্ম-ব্যাপারে উদারতার বাণী এ-দেশে প্রচারিত। ডিরোজিওর মাধ্যমে অনুসন্ধিৎসা এবং স্বাধীনতার স্পৃহা বুদ্ধিজীবী মহলে জাগ্রত। মাইকেল মধুসূদনের মাধ্যমে কাব্য অতিমানবিক ক্রিয়া থেকে জাগতিক স্তরে আনীত। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের বাণীও এ-দেশের গোচরীভূত। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে কমলাকান্তের দপ্তর এবং অপরদিকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত আনন্দমঠ রচনা করেছেন। অপরদিকে শিল্পায়িত ইয়োরোপ তারও প্রায় শত বৎসর পূর্ব হতে সারা পৃথিবীর সম্পদ লুণ্ঠন করেও অবাধ পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধে জর্জরিত অশান্ত -তার গণমন বিক্ষুব্ধ উত্তেজিত। বুদ্ধিজীবী শিল্পী বিচ্ছিন্নতার চাপে লক্ষ্যহীন একক। রিম্ব এবং বদলিয়ে আউটসাইডারের বক্তব্য বলছেন।

দণ্ডভয়হীন নৈরাজ্যবাদী আউটসাইডারের কার্যকলাপ বর্ণনা করছেন। পরবর্তী পর্যায়ে কাফকা 'ট্রায়েল' এবং 'মেটামরফসিস' রচনা করে ব্যুরোক্রাসির মোকাবিলায় মানুষের অসহায়তার চিত্র অংকন করছেন। রাশিয়ায় টলস্টয় এবং এ-দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবতত্ত্ব বাণী গল্পে-উপন্যাসে-গানে এবং কাব্যে প্রচার করছেন। কাজী নজরুল ইসলামও সাম্য-মৈত্রীর চারণ কবিরূপে আবির্ভূত। কিন্তু এ-দেশের দুর্ভাগ্য, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম জয়ী হলেন না, জয়ী হলো বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ; যেমন ইয়োরোপে ফরাসী বিপ্লবের বাণী জয়ী হলো না, জয়ী হলো পুঁজিবাদ এবং তার সহায়তাকারী অথবা তৎসৃষ্ট নগ্ন উগ্র জাতীয়তাবাদ। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—দু'টি মহাযুদ্ধে মানুষের নয় পুঁজিবাদের অসারতা (Hollowness) প্রমাণিত হলো। শিল্পী-সাহিত্যিকের নিঃসংগতা আরো বৃদ্ধি পায়। মানবসমাজকে সে দেখতে পায় আণবিকভাবে বিভক্ত কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ স্বাধীন কিন্তু 'অভিশপ্ত স্বাধীন' এককরূপে। এই এককের ভালো মন্দ মূল্যবোধশূন্য মানুষ- স্বতোৎসারিত প্রবণতা, অন্যকথায়, [illegible] সহায় জীব। এককের একমাত্র লক্ষ্য সমষ্টির উপর একচ্ছত্রাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা—নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত মানুষের এই হচ্ছে একমাত্র মূল্যবোধ। সফল হলে ভালো, নইলে জীবন অর্থহীন। হয় পৃথিবীকে পরাধীন করা, নয় আত্মবিনাশ—এই হচ্ছে পুঁজিবাদ দ্বারা আনবিকভাবে বিভক্ত মানব এককের জীবন-দর্শন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই বৈচিত্র্যপূর্ণ যুগের মানুষ। বহুভাষাবিদ, পণ্ডিত এবং বুদ্ধিজীবী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পক্ষে মানব-সভ্যতার এই যুগসন্ধিক্ষণে নিঃসংগ একটি এককে পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। দেশ-বিদেশের উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার দ্বন্দ্ব এবং হানাহানি-খুনোখুনির নগ্ন বীভৎসকাণ্ড অবলোকন করে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বসৃষ্ট বৃত্তের মধ্যে নির্জনবাস করতে পারতেন; বুদ্ধিমানের অহমিকাবোধ জাত ঊর্ধ্বজগতে বিচরণ করে নিজেকে সমস্ত কিছু থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারতেন। [illegible] মানসিক শান্তিও হয়ত পেতেন। কিন্তু তিনি সে জীবন বেছে নেন নি। তিনি ছিলেন সমাজবদ্ধ মানুষ। ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি ব্যক্তি ছিলেন না। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভাষার জন্ম। তিনি বহু ভাষাবিদ এবং ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন। হয়ত এ-কারণেই সকলের সাথে এক

হয়ে যাওয়ায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের অহমিকা ও আভিজাত্যবোধ ছিল না। সাধারণ মানুষের নানা আচরণের মধ্যে বহু ভুল-ভ্রান্তি ও কুসংস্কার থাকে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাবে, অভাব ও দারিদ্র্যের পীড়নে মানুষের সাধারণ রুচিতে শুচিতা নান্দনিকতা এবং উৎকর্ষ হয়ত থাকে না। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই সাধারণ মানুষকে কখনও ঘৃণার চোখে দেখেন নি। পণ্ডিতগণের সভায় যেমন তাঁর স্থান নির্ধারিত ছিল, তেমনি সাধারণের সমাবেশে তাঁর ছিল অবারিত দ্বার। তিনি সেখানে তাঁদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতেন, তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতেন। তিনি পণ্ডিতজনের জন্যে যেমন গ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমনি গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেছেন দেশের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ পাঠকের জন্যে। ছাত্র-শিক্ষক, সাধারণ লোক—সকলের হৃদয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন; শুধু লেখার মাধ্যমে নয়, তাঁর আচরণের মধুরতা এবং অকুণ্ঠ ও মুক্ত মেলামেশার মাধ্যমেও। তিনি সমাজের সর্বস্তরে ছিলেন, কিন্তু প্রাচীরঘেরা বিশেষ কোন স্তরে ছিলেন না। ক্ষমতার ভ্রূকুটি, স্বার্থের প্রলোভন, খ্যাতির তমঘা প্রভৃতি কোন কিছু তাঁকে সমষ্টি থেকে পৃথক করতে পারে নি—পারে নি সমষ্টিগত মানুষের সাধারণ স্বার্থের বিরুদ্ধতায় অগ্রণী করতে। বরং গণ-স্বার্থ বিরুদ্ধ সমস্ত নীতির তিনি কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। কুৎসিৎ সমালোচনা এবং সরকারী ভীতির মুখেও তিনি বাংলা ভাষার উপর আক্রান্তকারী গণ-দুশমনদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যে অবিচলিত নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সাথে আজীবন রুখে দাঁড়িয়েছেন তা আমাদের মাতৃভাষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পণ্ডিত ব্যক্তির খ্যাতি পণ্ডিতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কবির খ্যাতি কাব্যপাঠকদের মধ্যে। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। বাংলা সাহিত্যের সাধক পণ্ডিতজনের মধ্যে একমাত্র ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-ই তাঁর স্বনামে বাংলার সকল শ্রেণী এবং সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিচিতই শুধু ছিলেন না তাঁদের আপনজনও ছিলেন। সমাজের সর্বস্তরে এরূপ অনুপ্রবেশ এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার প্রায় নজীরহীন দৃষ্টান্ত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। স্বধর্মে নিষ্ঠাবান হয়েও তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িক। ধর্মকে তিনি কোনদিন রাজনীতির হাতিয়ার করেন নি এবং তেমন প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থনও জানান নি। এ পর্যায়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাজী নজরুল ইসলাম।

ডক্টর শহীদুল্লাহ আমাদের ভালোয়-মন্দয় মিশ্রিত জন-জীবনের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। মিশে গিয়েই তিনি তাঁর আপন ধ্যান-ধারণা তাদের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠায়, তার বিভিন্ন শাখার সেবায় এবং ঐতিহাসিক গবেষণা ও তথ্য উদ্ধারে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান অবিস্মরণীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের মানুষের একজনরূপে আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে তিনি যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন সেটিও তাঁর জীবনের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। তিনি কখনও আউটসাইডার ছিলেন না, তিনি আজীবন ছিলেন সমাজের অভ্যন্তরের মানুষ। তিনি বুঝেছিলেন, উন্নাসিক আউটসাইডার কখনও মানবসমাজের হিত সাধন করতে পারে না। দোষ-গুণে মিশ্রিত অধঃপতিত মানবসমাজের অন্তরে তাদের একজনরূপে প্রবেশ করেই শুধু সামাজিক চরিত্র পরিবর্তন সম্ভব। ঘৃণা নয়, সহানুভূতি এবং কৃপা নয়, ঘনিষ্ঠতা মানব-চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের শ্রেষ্ঠতম সহায়ক। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সেই গুণ ছিল। আজকের দিনে তাঁর এই মহৎ গুণ স্মরণ করে মরহুম শিক্ষকের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

[ইত্তেফাক—১৯. ৭. ৭০]

কবিয়াল রমেশ শীল

যুগে যুগে সামাজিক এবং বৈয়ক্তিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হলেও মানবজীবনের এমন কতকগুলো মৌলিক দিক আছে যার কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় না। প্রায় জন্ম-মৃত্যুর মতোই তার স্থায়ী। উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করা যায়ঃ যেমন আনন্দের উপকরণ এবং আনন্দবোধ। যুগ পরিবর্তনের সাথে আনন্দের উপকরণ হয়তো কিছু কিছু বদলায়ঃ যেমন ঘোড়ার জুড়ি গাড়ীর পরিবর্তে হালফ্যাশানের দামী মোটর অথবা বেলোয়ারী ঝাড়ের পরিবর্তে নানা রঙের ইলেকট্রিক বাল্ব্, কিন্তু আনন্দ বোধের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য আবিষ্কার করা কঠিন। সব উপকরণও আবার বদলায় না। যেমন নর ও নারী পরস্পরের স্থায়ী আনন্দোপকরণ। শিল্প-সাহিত্যেও তেমন বস্তু আছে। দু-আড়াই হাজার বছর পূর্বে রচিত ক্লাসিক সাহিত্য ও শিল্প সমকালীন সমাজকে যে আনন্দ দিয়েছে, আধুনিক সমাজকেও প্রায় অনুরূপ আনন্দই দেয়—দেয় যে তার প্রমাণ এ-যুগেও বহু বুদ্ধিজীবী এবং সৃজনী প্রতিভা সমাজকে ক্লাসিক সহজতায় ফিরিয়ে নিতে চান। শুধু তাই নয়, ক্লাসিক শিল্প ও সাহিত্যকে নতুন বোতলে সাজিয়ে পরিবেশনও করছেন। বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, পর্ব ইত্যাদি উপলক্ষে মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগেও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ বা বেদনা প্রকাশ করতো আজও তাই করে। পার্থক্য শুধু এই যে, এ-কালে বিজ্ঞানের নানা উপাদান উৎসবে ব্যবহার করা হয়, সেকালে তা ছিল না। কিন্তু সে কারণে আনন্দবোধে কোনরূপ কমতি ছিল না। প্রেম, প্রীতি-ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, ইত্যাদিও সেকেলে সামাজিকবোধ—গার্হস্থ্য জীবনারম্ভের ঐতিহাসিক দলিল। শিল্প-বিপ্লবোত্তর রোমান্সহীন জীবনেও মানুষ এ-সব ধ্যান-ধারণা বাদ দিতে পারে নি। এ-সকল বোধের উপাদানও প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

আকাশের চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ঘন কালোমেঘ, দেয়ার ডাক, বিদ্যুৎ, অশনিপাত, অগ্নি, বায়ু, সাগরের উর্মী, বেগবতী নদী, বড় বড় বৃক্ষ, বাগানের ফুল ইত্যাদি বহু জিনিস আবহমানকাল থেকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এ-সব বস্তুকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল মানুষের আদিম ধর্মবিশ্বাস। ভাবাবেগে সততঃ তাড়িত আদিম জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যাযাবরের মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনাগমন করতো। স্থায়ী বাসস্থান তারা পছন্দ করতো না। মনের কল্পনা এবং পথের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নানা বিচিত্র কাহিনী, গাথা, গীত প্রভৃতি রচনা করে জনপদ গঠনোন্মুখ আদিম মানুষকে শোনাত ঐ যাযাবর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ। এমনি করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিতালি প্রতিষ্ঠিত হলো। নানা কাহিনী, বিশ্বাস, আচরণ, রীতি-নীতি ও প্রণালী এবং ঘটনা অবলম্বনে বৈশাখের বৃষ্টির পরে মাটির নরম বুক বিদীর্ণ করে বীজের অঙ্কুর উদ্‌গীর্ণ হওয়ার মতো সহজ প্রয়াসে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠলো লোক-সাহিত্য, লোক-ধর্ম, লোক-সংস্কৃতি এবং লোক-শিল্প। পণ্ডিতের পরিশ্রমের ফল এ-শিল্প নয়, বৈয়াকরণের শুদ্ধি এতে নেই,—কেননা বৈয়াকরণ ভাষা ও চিন্তার রাজ্যে তখনও অনুপস্থিত—দার্শনিকের বিচার-বিশ্লেষণ এতে বিরল, বুদ্ধিজীবীর উন্নাসিকতাও এর ধর্ম নয়—এমনকি সাধকের জীবনব্যাপী সাধনার ফলও এ নয়। যে-সব ঘটনা মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিরাটত্বের মহিমা প্রকটিত করে, চোখে চমক লাগায়, অথবা যে-সব উপকরণ ও উপলক্ষ জীবদেহে আশাআকাঙ্ক্ষা, ভাবাবেগ এবং পাওয়া-না-পাওয়ার আনন্দ ও বেদনার উন্মেষ ঘটায়, লোক-সাহিত্য সচরাচর সেগুলো অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, লোক-সাহিত্যে মানুষের সমস্ত আদিম ও মৌলিক স্বভাব স্থান পেয়ে থাকে। নীতিবাগিশ কিংবা নিয়ামকের শাসনভিত্তিক সংযম এতে সাধারণতঃ অনুপস্থিত। সাহিত্যের এ দরবারে কোন কুণ্ঠা বা লাজ-শরম নেই। মনোসমীক্ষণের সযত্ন ও পূর্বপরিকল্পিত আয়াসও এর বৈশিষ্ট্য নয় বরং কুণ্ঠাহীনভাবে সহজ সরস করে বলে যাওয়াই এর বৈশিষ্ট্য। স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করে এ-কালের বৈজ্ঞানিক, মানুষের অচেতন এবং অবচেতন মনের নানা বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ ও স্বভাবের যে নগ্ন পরিচয় উদ্‌ঘাটন করছেন তা দেখলে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয়, আমরা কি? লোক-সাহিত্যকেও এক

হিসেবে অচেতন ও অবচেতন মনের উন্মুক্তি বলা যায়; কেননা তার মধ্যে মানুষের সকল প্রকার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অভিলাষের সাক্ষাৎ মিলে। সমাজ-বিরোধী, নীতি-বিরোধী কিংবা ধর্ম-বিরোধী বলে সেখানে কিছুই পরিত্যক্ত নয়।

লোক-সাহিত্যের প্রকৃতিই এই। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যেও আমরা এ প্রকৃতি লক্ষ্য করি। প্রাচীন ভারতীয় উপকথা ও কাহিনীরও প্রকৃতি এই। অবশ্য সমকালীন সামাজিক সমস্যা, প্রাকৃতিক ঘটনা, একই অবস্থার পৌনঃপুনিক আবির্ভাব ইত্যাদি অবলম্বন করেও লোক-সাহিত্য গড়ে ওঠার নজীর আছে। নানা প্রবাদ, ধাঁধা, খনার বচন ইত্যাদি তার প্রমাণ। মোটকথা, লোক-সাহিত্য, লোক-সংস্কৃতি এবং লোক-শিল্পের মধ্যে যদি আমরা অনুক্ষণ অনুপম সৌন্দর্য্য, কুশলতা ও মার্জিত রুচির সন্ধান করতে সচেষ্ট হই তবে হয়ত নিরাশ হবো।

এ দিক থেকে বিচার করলে কবিয়াল রমেশ শীল— খাটি লোক-কবি নন। লোক-কবির প্রতিভা, মন ও মনন-শক্তি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান—তাঁর রচিত কবিতায় লোক-সাহিত্যের লক্ষণও আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে যে, রমেশ শীলের মধ্যে প্রাচীন-পন্থী কবিয়ালদের সহজ সরলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা পুরোপুরি নেই। যুগ-জীবনের প্রভাব পড়েছে তাঁর উপর শিল্প বিপ্লব এবং [illegible] মধ্যবিত্তের ভালোমন্দ দু'টোই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। অবশ্য ভালোর চেয়ে মন্দ দিকটাই তাঁর সংবেদনশীলতাকে জাগিয়েছে বেশী। এটাই স্বাভাবিক, কেননা তৃপ্তি এবং পূর্ণ শান্তি প্রেরণামূলক সাহিত্য ও শিল্পের উপকরণ হতে পারে না। যে অবস্থা বা ব্যক্তি মনকে বিক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত করে সমাজ-সচেতন স্পর্শকাতর সাহিত্য তাকে উপলক্ষ করেই গড়ে ওঠে। অবশ্য মানব জীবনের কতগুলো স্বভাবজাত দিক আছে, সভ্য অসভ্য জাতির মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান, যেগুলো অবলম্বন করেই সাহিত্য ও শিল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু সে হচ্ছে প্রজনন সম্পর্কিত দিক। সুতরাং এ দিক অবলম্বন করে নির্মিত কাব্য ও শিল্পে সমকালীনত্ব নেই, থাকতেও পারে না; কেননা এটি হচ্ছে জীব-জগতের আদি ও অকৃত্রিম দিক। শামা ও পারওয়ানা'র উপর কবিতা লেখার মতো গতানুগতিক এবং একঘেয়ে—তবু তার মর্যাদা ক্লাসিক,

কেননা ভোজনের মতো প্রজননের বিষয়টিও সার্বজনীন ও স্থায়ী সত্য। কবিয়াল রমেশ শীলের কাব্যে এই সার্বজনীন এবং স্থায়ী দিকটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, অর্থাৎ লোক-সাহিত্যের এই চিরাচরিত দিকটি তাঁর রচিত পালা বা খণ্ড কাব্য-কর্মে অনুপস্থিত বলেই মনে হয়। সমস্যা-জর্জরিত সমকালীন সমাজ-জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান একদিন না একদিন হবেই ঃ বহু সমস্যা এখনই বিস্মৃত অতীত। সুতরাং রমেশ শীলকে সমাজ-সচেতন সমকালীন পল্লী-কবি হিসেবেই বিচার করতে হয়। এবং যেহেতু জসীমউদ্দীনও পল্লী-কবি সুতরাং আধুনিক সমালোচনা ও বিচার-পদ্ধতিও আরোপ করতে হবে। নানা বাহুল্য তেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাঁতাকলে পড়লে স্বাভাবিক কারণেই রমেশ শীলের অধিকাংশ কবিতা অপরিশোধিত ও অমার্জিত গণ্য হতে বাধ্য। তাঁর কাব্যে চিত্রকল্প, ঝঙ্কার, অনুপ্রাস, ছন্দ-সঙ্গীতা—এককথায় অলঙ্কার শাস্ত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন কাব্য-রূপ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস শূন্য বলেই পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় সমকালীন সাধারণ সমাজ-জীবনে আলোড়িত বিষয়গুলো সাধারণের কথায় গানের ছন্দে বলতে চেষ্টা করেছেন রমেশ শীল। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

১। গুণীগণ পদযুগে করি নিবেদন
চট্টগ্রাম শহরের কিছু করিব বর্ণন।
দেশে বন্যা আসিল একি হল
সর্বনাশের মূল।
সেই অবধি চট্টগ্রামী লোকের
নাই আর কূল।
আর দেখি নদীর পাড়ে হল কারবার,
অনেক দেখতে পাই
দেশের লোকের জমিজমা ছিল
এখন কারো নাই …

২। শহীদ খুনে রাঙা তুমি জালালাবাদ
দুশমন হঠাতে তব বক্ষ মাঝে
রুখিয়া দাঁড়ালো বীরের দল।

হটিয়া গেল বিপক্ষ সেনানী
টুটিল তাদের ধৈর্যের বাঁধ
সূর্য উঠিল তূর্য নিনাদি
তেজস্ক মণ্ডল ভাতিল তায়
অরুণ বেগে তরুণের দল
কদম কদম এগিয়ে যায় ··· ···

৩। আগরে ত্বরা করে আয়রে কৃষ মজুর দল।
ভায়ে ভায়ে সম্মেলনে বেড়ে যাবে বুকের বল।
সারাদিন খেটে খেটে
তবু অন্ন নাহি জোটে
মজুতদারেরা নিচ্ছে লুটে, হচ্ছে মোদের ভিটা তল।
পশু পয়মাল কিরা কাটা
ঐ দুঃখ মোদের বুঝবে কেটা
কোর্টে নিলাম বাড়ী ভিটা বর্গা জমীন চাষের ফল
রোগের জ্বালায় দেহ গেল
বীজ ধান্য সব ফুরাইল
মড়কেতে গরু গেল টুটে গেল বুদ্ধিবল। ··· ···

৪। জ্বলে পুড়ে গেল দেশ অত্যাচারের একশেষ
দেশবাসী হিন্দু মুসলমান ঘুমাইও না আর।
দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ি পঁয়ত্রিশ লক্ষ গেল মরি
আবাল বৃদ্ধ কত মইল হাজারে হাজার ···।
তার উপর কাপড়ের জ্বালা যতসব কুলবালা
ঘরের বাহির দিনের বেলা হ'তে নারে আর।
··· ··· ···

কন্ট্রাকটার ডিলারের নারী শাড়ী পরে মাজা লাড়ি
গরীব বেচারার বৌ বেচারী ছিঁড়া তেনা সার॥

৫। শুন বন্ধুগণ, হিন্দু ভাই হও সচেতন
কুলনাশা-মেবার করে হিন্দু-ধ্বংসের আয়োজন।

যুক্ত নির্বাচন হ'লে মনোমত মানুষ পাই,
দেশের হিন্দু মুসলমান ভোট দিতাম সকলে যাই,
কা'র হুকুমে কার আদেশ পাই, মাগে পৃথক নির্বাচন।...

৬। আরে ও মুলতান্তার বাপ, দুঃখের কথা কৈতাম আমার
বান্ধব আছে নি?
ভাইরে পেট ভরি ভাত খাইত ন পারি গায়ের বল হৈল হানি
হারাদিন মজুরী গরি দুয়া টে'য়া আনি,
হাড্‌ত গেলে সওদা কইরতাম চোখের পড়ে পানি।...

৭। উঠেছে শান্তির নিশান ছুটে আয়-মজদুর কিষাণ,
বাজে মিলনের বিষাণ চিন্তা কিবে আর।
ঐ ছুটেছে দলে দলে শান্তির পতাকাতলে,
দুর্নীতিবাজ শোষকদলে করিতে সংহার ...।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যাত্রার পালার মাধ্যমে মুকুন্দ দাশ সমাজ-সংস্কার করার প্রচেষ্টা করেছিলেন: অর্থনীতি ও রাজনীতিও মুকুন্দ দাশের বিষয়বস্তু ছিল; তাঁর ভূমিকার সাথে রমেশ শীলের ভূমিকা বিশেষভাবে তুলনীয়। উদ্ধৃতিগুলো থেকে প্রমাণিত হয় রমেশ শীল আধুনিক নগর-জীবনের প্রভাব মুক্ত নন। সমকালীন গ্রাম ও নগর-জীবনের প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি দিক—তন্মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাই বেশী—তাঁর কবিমনে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে। এক এক সময় মনে হয় তিনি যেন বিশেষ কোন রাজনৈতিক মত প্রচারে অবতীর্ণ। সুতরাং যে অর্থে জসীম উদ্দীন পল্লী-কবি, রমেশ শীল সে অর্থে খাটি পল্লী-কবিও নন।

তাহলে রমেশ শীল কোন্ শ্রেণীর কবি? এ প্রসঙ্গে অন্য একটি প্রশ্নও ওঠে। মৌখিকভাবে পদ রচনা করতে সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই কি লোক-কবি? লিখিত রচনা কি লোক-কবিতার মর্যাদা পেতে পারে না? এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েও বলা যায় যে, আধুনিক নগরজীবন, সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাবলীর প্রভাব সত্ত্বেও রমেশ শীলের মধ্যে খাঁটি লোক কবির বৈশিষ্ট্য যে আদৌ নেই তা নয়। সংস্কার, আস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্ঘটনা অবলম্বনে গান, পালা ইত্যাদি রচনা করা

লোককবিদের একটি স্বভাব। রমেশ শীলের এ-শ্রেণীর রচনাও আছে। যেমন :

ক। মন অহংকারে দিন কাটালি মানুষ হবি কেমন করে
তোর সাধন ভজন নষ্ট হইল হিংসা নিন্দা অহংকারে !!
জেলে ধোপা মুচি জাতি, এই সকল ব্যবসার খ্যাতি
মূলে সকল মানুষ জাতি, আর জাতি নাই এ সংসারে
জাতি গৌরব বাবুয়ানা এই গৌরব তোর ভুল ধারণা।
কুলের খবর নাই তোর জানা, কুলীন হবি কোন বিচারে !!
জমিদারী পাকাবাড়ী এই নিয়ে তোর অহংকারী।
নকল ধন দুনিয়াদারী, আসল ধন মাইজ ভাণ্ডারে ''

খ। তার ঘরে থাকা বিষম দায়, প্রেমের বাতাস লাগলো গায়
এ-জীবন মরণ সমান কথা কুল ধর্ম সব হারায় !!
যারে প্রেম নেশায় ধরে গৃহ-বাড়ী পুত্র নারী সকলি পাসরে।
সে ফুলের রেণু শয্যা করে শুইলে অঙ্গ না জুড়ায়।
যে-জন প্রেমে মজেছে প্রেমের মরা মরে আগে অমর হয়েছে
(রমেশ বলে) শুন বন্ধুগণ আমার বাবা মাইজভাণ্ডারী
প্রেমের মহাজন
ভক্তিভাবে করলে সাধন, অধর চাঁদকে ধরা যায়।

গ। লিখিতে গজবের কথা প্রাণে ব্যথা কলম নাহি চলে,
কি খেলা দেখাইল প্রভু সীমান্ত চট্টলে।
চৌদ্দ কার্তিক সোমবারে চারটার পরে ছুটিল তুফান,
আতংকিত নরনারী হিন্দু মুসলমান
যখন পাঁচটা বাজে দেশের মধ্যে উঠে হাহাকার
মুসলিম কয় রক্ষা করো পরোয়ারদেগার
হিন্দু বলে ভগবান রাখো মান তুমি দয়াময়
তুমি বিনে কে রাখিবে বিপদ সময়।

ঘ। শুন ভাই পতেঙ্গার খবর পরম ঈশ্বর কি গজব ঢালিল,
প্রথম চোটে গরু ছাগল ভেড়া গেল।

যারা সমুদ্রের পারে বসত করে হয়ে জলোচ্ছ্বাস
বেশীর ভাগ নরনারীর জীবন হল নাশ।
দক্ষিণে কুতুবদিয়া যায় ডুবিয়া লোকের মুখে শুনি
বড় ঘোপের বাজারের উপর ষোল হাত পানি।

লালন শাহ্‌র মতো মারফতী ধরনের গানও রমেশ শীল রচনা করেছেন। তার দু-একটি খণ্ডিত নমুনা :

বন্ধুলোক বিদেশে থাকে
দেখা না হয় পত্র লেখে
তুমি কাছে থেকে সাড়া দাও না কেনে।
পাইয়া বিচ্ছেদের দেহ
বাঁচিয়া রয়না কেহ,
এ-কথা বুঝাব কেনে জনে।
রমেশ কয়—বিরহী যারা
আমার দুঃখ বুঝিবে তারা
আর বুঝবে বাণফুটা হরিণে।

পরাণ কাঁদে তোমারি লাগিয়া বন্ধু,
নিজের জ্বালায় নিজে মরি
কার কিবা অনিষ্ট করি,
পাড়া বৈরী হল কি লাগিয়া
মন্দ বলে জ্ঞাতিগণে
সে কথা কার কানে শোনে,
প্রিয়া বিনে ফাটে মম হিয়া
বন্ধুর বুক ভেসে যায় নয়ন জলে
দুরন্ত নিন্দুকের দলে
মন্দ বলে আমারে দেখিয়া

১৫—

কারো পাকা ধানে দেই না মই
তবু আমার কথা লই
মুখপোড়ার মরে কি লাগিয়া। ...

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রমেশ শীলকে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন। তবে একটি সত্য প্রমাণিত হয় যে, তিনি সচেতন শিল্পী; স্বতঃস্ফূর্ত-তায় বিশ্বাসী নিছক ভাববাদী কবি নন। সর্বশেষে উদ্ধৃত তার রচনা দু'টিতে প্রকৃত কবিত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। রমেশ শীল রচিত অজস্র পালা, গান ইত্যাদির মধ্যে ভবিষ্যতে কয়টি কিংবা কি পরিমাণ লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন হ'লেও তিনি যে একজন প্রতিভাবান শিল্পী তাতে সন্দেহ নেই।

[বাংলা একাডেমী পত্রিকা —কার্তিক-পৌষ—১৩৭০]

ম্যাক্সিম গোর্কী

ত্রিশের দশকে বুদ্ধদেব বসুরা যখন লরেন্স। ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ—লরেন্সীয় যৌন সহজতাবাদ দর্শনের অনুসরণে কিছু নগ্ন—বাস্তব লিখে আমাদের মাতৃভাষায় নতুনত্বের চমক লাগাচ্ছিলেন এবং তার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপীয় উচ্চ বুর্জোয়া সমাজের স্বচ্ছন্দ্যের আদর্শবাদ এবং ভাবশিষ্য এ-দেশীয় সংস্কৃত বিবেকানন্দের বৈদান্তিক ভাব বিলাস সমন্বয় ও ঘাস শেষের কবিতায় লিপিবদ্ধ করে তৎকালীন পাঠকদের হতচকিত করছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কীকে এখনও অবশ্য পাঠ্য মনে করেছি, যদিও সত্য সাহিত্য-পাঠে আমাদের হাতে-খড়ি একাল। বলা বাহুল্য বিচার-বুদ্ধি তাড়িত পাঠকাল সেটা ছিল না, এর কারণই গোর্কীর প্রতি আসক্তির কারণ। সমাজতান্ত্রিক দর্শন এ দেশে তখন সবে সাড়া জাগিয়েছে। তার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত নির্মাণের জন্য সংগৃহীত মার্ক্সীয় ক্লাসিকগুলো আগেই এ দেশের মাটিতে গোপনে চালান হয়েছিল। তৎকালীন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী যুব-সম্প্রদায় প্রদীপের তেল নিঃশেষ করে রাত্রির গভীরে সেগুলো পাঠ করতেন —এবং এ-দেশের সামাজিক অবস্থার সাথে স-সব মহৎ ক্লাসিকের বক্তব্যের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে প্রতিকারের স্পৃহায় কাজ করে যেতেন। কিন্তু ক্লাসিকের ক্ষুরধার যুক্তি পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য এবং দুর্বোধ্য ডায়লেকটিক দর্শনের মধ্যে রোমান্টিক ভিত ছিল না। অথচ কর্মে অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য রোমান্টিসিজমের চেয়ে বড় সহায়ক অন্য কিছু নেই, কেননা, ঘষা-মাজা বাস্তবতা মানুষকে আস্থাহীন সংশয়বাদী করে তোলে। কিন্তু কর্মের জন্য আস্থা আবশ্যক।

এই অত্যাবশ্যক রোমান্টিক বস্তুটি এ-দেশে যে-সমস্ত মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করে তার মধ্যে গোর্কী সাহিত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রুশ সাহিত্য তার আগেও এ-দেশে পাঠ করা হতো। ক্রপটকিন, বুনীন প্রমুখের নৈরাজ্য-

বাদী সাহিত্যে যে অনুপ্রেরণা এ-দেশে যুগিয়েছিল পরাধীন দেশের জন্য তার প্রয়োজন হয়ত ছিল। কিন্তু তার মধ্যে সৃষ্টির মহৎ প্রেরণা ছিল না; কেননা দস্তভয়স্কির দি পজেসড্ সমেত যাবতীয় নৈরাজ্যবাদী সাহিত্য নেতিবাচক। পজেসডকেও আমি নেতিবাচক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এ-জন্যে করছি যে, ওটার মধ্যে ধ্বংসস্পৃহার অর্থহীনতা প্রমাণ করা হলেও নির্মাণের ইঙ্গিত নেই। বস্তুতপক্ষে যাবতীয় নৈরাজ্যবাদী সাহিত্যই নেতিবাচক, শ্রেণী যাই হোক।

সাধারণের জীবন কখনও সহজ ও সুখকর নয়; গোর্কী সাধারণ লোকের জীবন থেকেই তাঁর সাহিত্যের মালমসলা সংগ্রহ করেছিলেন। তৎকালীন রাশিয়ার সাধারণ লোকের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে গোর্কীর নিজ জীবনের একটি বৃহৎ অংশ কেটেছে, কর্মের সন্ধানে তিনি দীর্ঘদিন যাযাবর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। তবু তাঁর রচনায় কোথাও নৈরাশ্য ব্যক্ত হয় নি। তাঁর মা-দুর্দশা ও দৈন্যের কাহিনী কিন্তু তবু সংকল্পের দৃঢ়তায় অটল অনড়। ভবিষ্যৎকে নির্মাণের জন্য পুত্র নির্যাতন বরণ করে নিচ্ছে—মা পরম উৎসাহে তার সহযোগিতা করছে। এই দৃঢ় সংকল্প এ-দেশের যুব শক্তিকে সেদিন প্রেরণা যুগিয়েছিল; এ প্রেরণা নেতিয়ে পড়া হাহুতাশ অথবা ভালো মানুষের মনস্তাপবোধে নয়—এ প্রেরণা কর্মসিদ্ধির।

প্রথমে উল্লেখ করেছি তবু দ্বিরুক্তির দায় স্বীকার করে নিয়েও পুনরায় বলছি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তখনও শেষের কবিতা, বাঁশরী এবং যোগাযোগ জাতীয় ভিক্টোরীয় উদারনৈতিক যুগ চলছে—শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন, দেবদাস গৃহদাহ শ্রীকান্ত প্রভৃতিতে চাকর-বাকরের ঐকান্তিক আনুগত্য এবং অপরদিকে শেষ প্রশ্ন ইবসেনীয় বাসী মাল উপস্থিত করে স্বপ্ন সঞ্চয়ী সামন্ততান্ত্রিক মনে বিভ্রান্তির ঝলক সৃষ্টি করছেন। বোদেলীয় লরেন্সীয়রা যৌন-প্রগতি নিয়ে ব্যস্ত। প্রতীকবাদী এবং অধিবাস্তববাদীরাও ব্যৈক্তিক মনের নৈরাজ্যে মুক্তির পথ খোঁজার পণ্ডশ্রম করে বেড়াচ্ছেন—দস্তভয়স্কির মধ্য ইয়োরোপীয় শিষ্য প্রুস্ত এবং আয়র্লণ্ডীয় শিষ্য জয়েস প্রমুখ শিল্পের পিরামিড তৈরী করতে গিয়ে যা সৃষ্টি করলেন তার মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রমাণ যেমন পাওয়া গেলো তেমনি প্রমাণ পাওয়া গেলো বুর্জোয়া মূল্য-বোধের চরম দেউলিয়াত্ব এবং বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির প্রমাণ। শিল্প সৃষ্টি করেই তাঁরা প্রমাণ করলেন শিল্প

ব্যক্তিমানসের সংগতি সামঞ্জস্যহীন সমাজ বিরোধী ভাব ও কার্যকলাপ নয়। অপরদিকে কিরকেগার্ড এবং তাঁর শিষ্য গ্যাপল সার্ত্রে এবং সার্ত্রের শিষ্য ক্যামু প্রমুখ মহাভারত ও গ্রীক ট্র্যাজেডির নিয়তিবাদ সাহিত্যে পুনরায় আমদানী করে মানুষকে দাসে পরিণত করলেন। ভারতীয় সাহিত্যের স্বাধীন মানুষ যে আসলে নিয়তির দাস মাত্র তা বোধ করি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না। ইউরোপীয় বুর্জোয়া শিল্পবোধের এ বিভ্রান্তি এ-দেশেও যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বলেছি। এ-প্রভাব কাটিয়ে যাঁরা ব্যতিক্রমের মধ্যে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা নগণ্য হলেও শক্তিতে তাঁরা ছিলেন প্রায় দুর্জয়। এই নগণ্যদের উপর গোর্কী সাহিত্যের প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল। কামার, কুমারের কবি হওয়া এবং সাম্যের গান গাওয়ার পিছনে গোর্কী সাহিত্যের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যে সবল আশাবাদ দেখতে পাওয়া যায় গোর্কী সাহিত্যেও সেই আশাবাদের স্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান। নজরুল কাব্যে প্রত্যক্ষ আবেদনের জন্য শুধু হুইটম্যান উল্লেখ্য নয়, গোর্কীর কাছেও সমভাবে তিনি ঋণী। আজকের প্রেমেন মিত্র, তারাশংকর নয়, সেদিনের প্রেমেন মিত্র, তারাশংকরও গোর্কীর কাছে ঋণী। দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলে বলতে হয় 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' এবং 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' ইত্যাদির আলাউদ্দীন আল আজাদ নয়, "জেগে আছির" আলাউদ্দীন আল আজাদও গোর্কী প্রভাবিত ছিলেন।

গোর্কী-সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে হলে বিশ্ব-সাহিত্যের মূল দু'টি ধারা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করে নিতে হয়। দু'টি ধারাই প্রগতি নামে খ্যাত। তার একটি ব্যক্তির প্রগতি—ব্যক্তির মন, দেহ ও কর্মের মুক্তি সন্ধান করেছে এ-ধারা। এ-দেশে তার সার্থক প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ। ও দেশের বহুর মধ্যে সবশেষ লরেন্স ও জয়েসকে উল্লেখ করেই নিরস্ত হচ্ছি। এ-ধারা শিল্পবিপ্লবোত্তর বুর্জোয়া ধারা—রোমান্টিক ধারাও বটে; আবার ক্লাসিক-সাহিত্যের বল্গাহীন বাস্তবতাও এ ধারায় বিদ্যমান। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও এ ধারা মানুষের মুক্তির ধারা নয়—ঘুরে ফিরে এ-ধারা পংকের ঘূর্ণাবর্তে নিয়ে যায়, যেখানে পথ হারিয়ে শৃঙ্খলাহীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে হয়।

অপর ধারাটি সমাজবদ্ধ জীবরূপে মানুষের কলেকটিভ মুক্তির আহ্বান

জানিয়ে আসছে। বলা বাহুল্য সমাজবদ্ধতাই মনুষ্যত্বের প্রমাণ, ব্যক্তিরূপে কল্পনা করলে মানুষ আর দশটি পশুর একটি—তার সমস্ত জৈব ক্রিয়াকর্ম যে শাশ্বত একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সাহিত্য ক্ষেত্রে ম্যাক্সিম গোর্কী এই দ্বিতীয় পথের পথিক। কিন্তু দ্বিতীয় পথের পথিক হলেও গোর্কী-সাহিত্যে রোমান্টিক ধর্মীতা, বাস্তবতা এবং মুক্তিবোধ সবই আছে।

অধুনা এ দেশের কিছুসংখ্যক যুবক শিল্পকর্মী বৈয়ক্তিক মনের ভাব-বিলাসকে শিল্পরূপে আখ্যায়িত করতে চান। শিল্প যে কি বস্তু তাঁরা তা ব্যাখ্যা করে বলেন না বা ব্যাখ্যা করতে পারেন না।

এ কারণেই বালজাক মনের দিক থেকে বুর্জোয়া সমাজের সমর্থক হয়েও বিষয়গত দিক থেকে তিনি বিপ্লবীর ভূমিকা অভিনয় করেছেন; কেননা তার রচনায় বুর্জোয়া সমাজের দেউলিয়াত্ব যেমন ফুটে উঠেছে আর কোন ফরাসী লেখকের লেখায় তেমনটি ফুটে উঠেছে কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে দস্তয়ভস্কি মনের দিক থেকেও বুর্জোয়া, বিষয়গত দিক থেকেও বুর্জোয়া। তাঁর কারামাজোভ, ইডিয়ট বড় উপন্যাস বটে, কিন্তু কোন্ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে না, সমাজ বা জনজীবনের অবশ্যই নয়ঃ দস্তয়ভস্কির উপন্যাস-চরিত্র স্বার্থান্বেষী অসামাজিক লোকের মনের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে সন্দেহ নেই এবং যারা সমাজে থেকেও বহু অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত সামাজিক নীতি ভঙ্গ করে সহস্র সহস্র লোকের কল্যাণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সে শ্রেণীর পাঠককে আনন্দও দেয়। কিন্তু তারা কল্যাণের প্রতিনিধিত্ব করে না। কাজেই আজকের দিনেও যারা সমাজ-চেতনাকে শিল্পের পরিপন্থী মনে করেন তাঁরা আর যাই হন, সত্যিকার অর্থে প্রগতির সমর্থক নন

অভিযোগ উঠতে পারে আমি ইউটিলিটারিয়ান সাহিত্য তথা উপযোগবাদের ওকালতি করছি। এ অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্ছি; কেননা ম্যাক্সিম গোর্কীকে একমাত্র এ উপায়েই সম্মান করা যায়। গোর্কী সাহিত্যের প্রথম থেকে শেষ বর্ণ পর্যন্ত প্রায় সবটাই ইউটিলিটারিয়ান-সাহিত্য। তাঁর 'মাদার' অবশ্যই প্রচারধর্মী এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রচিত। এ ম্যান ইজ বর্ন ও টুয়েন্টিসিক্স ম্যান এণ্ড এ গার্ল নামক তাঁর বিখ্যাত রচনাও বাস্তববাদী হয়েও আসলে প্রচারধর্মী গল্প। এসব

গল্পও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে। বলা অবান্তর হলেও এ দেশের তথাকথিত প্রগতিবাদী শিল্প-সচেতন লেখকদের বলতে হয় যে, কোন শক্তিশালী সমাজ-সচেতন লেখক বিনা উদ্দেশ্যে রচনায় হাত দেন না। শিল্পের জন্যই শিল্প সব যুগেই অসত্য। গগোল পরকালেই শুধু বিশ্বাস করতেন না বহু বিষয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্নও ছিলেন। তাঁকে সর্বহারাদের লেখক বলা যায় না। তবু ডেড সোলস, ইনসপেক্টর জেনারেল, দি ক্লোক প্রভৃতি রচনা তাঁকে জনকল্যাণকামী লেখকরূপে চিহ্নিত করেছে। তিনি যুগপৎ সমগ্র রুশ সামন্ততন্ত্রকে বিদ্রূপের কশাঘাতে নাস্তনাবুদ এবং সর্বহারা ভূমিদাসের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছেন: আমলা-উৎপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে প্রতিবাদ স্পৃহা জাগিয়েছেন- দরিদ্র কেরানীকুলের, অসহায় অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে তাদের মধ্যে প্রতিকার স্পৃহা জাগিয়েছেন। এ দিক দিয়ে তিনি নিজের অজান্তে শ্রেণী সচেতন লেখক। টলস্টয় এবং রোমাঁ রোলা হয়ত অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পী এবং মহৎ মানবতাবাদী কিন্তু সে-মানবতাবাদ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য অনুপ্রাণিত করে না। মানুষের প্রয়োজন মাত্র তার কবরের জায়গা টুকুর—আবেদন আছে স্বীকার করে নিলেও তা যে সবলা আশাবাদের সহায়ক নয়, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এ আবেদন রবীন্দ্র সঙ্গীতের আবেদন—সচ্ছল অবস্থার ভালো মানুষকে মৃত্যু-সচেতন করে হয়ত আরো ভালো হওয়ার অনুপ্রেরণাও যোগায়, কিন্তু নিপীড়িতের মনে সাড়া জাগায় না। এবং কে কবে শুনেছে ভালো মানুষের উপদেশ-নির্দেশে স্বার্থ সচেতন সামন্ত এবং বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তাদের ব্যাঘ্রচর্ম ত্যাগ করে শশকচর্ম পরিধান করেছে? ইতিহাস এমন প্রমাণ দেয় না। রোমে বহু ভালো মানুষ ছিল, কিন্তু ক্রীতদাসের ন্যূনতম দাবীও তারা স্বীকার করে নি, স্পার্টাকাস পরিচালিত বিদ্রোহ দমনে চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে—গ্লাডিয়েটরদের আমৃত্যু-মল্ল-যুদ্ধ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পৈশাচিক আনন্দে অবলোকন করেছে। শ্রেণী-সচেতন সামন্ত এবং বুর্জোয়ার মধ্যে কি তাহলে মহত্ব নেই? আছে, কিন্তু সে মহত্ব তাজমহলের উচ্চ মিনারে বসে নীচের ভিক্ষুককে দু'চার পয়সা খয়রাত করার মহত্ব। বলা বাহুল্য খয়রাত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করে না—যেমন ওয়ায়েজের উপদেশ-নির্দেশ এবং ধর্মের অনুশাসন

মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করে না। নীতিবোধই শুধু মানুষকে নীতিবান করতে পারে। বেবিলনের উদ্যান, স্ফিংক্সের প্রস্তর-মূর্তি, মিসরের পিরামিড, তাজমহল প্রভৃতি শিল্পকর্ম সন্দেহ নেই; কিন্তু এসব নির্মাণের পশ্চাতে যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের নির্যাতন ও অকাল মৃত্যু বিদ্যমান, এ যুগের শিল্পীও কি তা ভুলে যাবে এবং ইতিহাস উল্লেখিত নির্মাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে কিন্তু যারা প্রকৃত নির্মাতা তাদের স্মরণও করবে না?

গোর্কীর শিল্প সেই আসল নির্মাতার শিল্প—এ শিল্পে সামন্ত ও বুর্জোয়ার মনোবিকার নেই—মনোবীক্ষণের ক্রূর ও পংকিল আবর্তও অনুপস্থিত। মনোবীক্ষণকে ক্রূর পংকিল আবর্ত বলায় অনেকে ক্ষুব্ধ হতে পারেন, কেননা তরুণ বন্ধুদের কেউ কেউ সে পথে পা দিয়ে সম্ভবতঃ এ ধারণা পোষণ করছেন যে, তাঁরা যা করছেন তা বুঝি নতুন। নতুন নয়, ব্লিস কাফকারাও এ কাজ করে গেছেন—উপরে আরো অনেকের নাম উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ সাহিত্য যে সাধারণ মানুষের সাহিত্য নয় তা বোধ করি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। ঐশ্বর্যবান অলস নবাবদের মনই শুধু বীক্ষণ করা চলে। এ কারণেই দেখতে পাই মনোবীক্ষণমূলক গল্প-উপন্যাসের নায়ক প্রায়শঃই জমিদার, তালুকদার কিংবা বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক শিল্পপতির সন্তান—যে এক রাত্রির জুয়াখেলায় লক্ষ মুদ্রা হারাতে পারে। যেদিন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ মনবীক্ষণ করার উপযুক্ত হবে সেদিন হয়ত এ শ্রেণীর শিল্পের সার্থকতা প্রমাণিত হবে কিন্তু—আজ নয়। পৃথিবীর মানুষের তিন-চতুর্থাংশ আজও নিপীড়িত, বঞ্চিত: তারা জীবন রক্ষার জন্য সততঃ কর্মের সন্ধান করছে তবু সামান্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। ওদের মনোবীক্ষণ করতে হয় না; কেননা ওদের [illegible] অবরুদ্ধ জীবন নয়, ওদের জীবন পূর্ণ প্রকাশিত জীবন। গোর্কী এই পূর্ণ প্রকাশিত জীবন থেকেই তাঁর শিল্পের মাল-মসলা সংগ্রহ করেছেন।

তবে কি গোর্কীর রচনায় সূক্ষ্ম শৈল্পিক কারুকার্য অনুপস্থিত? এরূপ প্রশ্ন জাগতে পারে। আমি বলবো তা নয়। তাঁর আত্মজীবনীর নানী একটি অনবদ্য চরিত্র। এ ম্যান ইজ বোর্ন, টুয়েন্টি সিক্স ম্যান এণ্ড এ গার্ল প্রভৃতি গল্পে যে অপূর্ব সংযম প্রদর্শন করা হয়েছে তা শুধু প্রথম শ্রেণীর কারিগরের পক্ষেই সম্ভব। আমরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি গোর্কী

সাধারণের লেখক হয়েও উঁচু দরের শিল্পী। গোর্কী-দর্শন এখনও ত্যাগ করার সময় আসে নি। কেননা এখনও ''অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ'' পৃথিবীর সর্বত্র উদ্যত। তাঁর জীবন-দর্শন গ্রহণ করলেই শুধু তাঁর পুণ্য স্মৃতির প্রতি সত্যিকার সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

[দৈনিক বাংলা—২৭শে চৈত্র, ১৩৭৮]

আন্দ্রে মরোয়া

অসামান্য মৌলিক প্রতিভার অধিকারী না হয়েও যে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ সম্ভব, সম্প্রতি পরলোকগত ফরাসী লেখক আন্দ্রে মরোয়া তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বেচ্ছায় গৃহীত বৃত্তির প্রতি আজীবন নিষ্ঠাই তাঁর এ সাফল্যের কারণ। ধনী ইহুদী শিল্পপতির পুত্র এমিল হারজগ (মরোয়ার পিতৃপ্রদত্ত নাম) সিয়েনে ইন ফাইয়েরেস্থিত এলবিউফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক জীবন সেখানেই কাটে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি রেঁায়েতে যান এবং সেখানকার কলেজ থেকে কলা ও বিজ্ঞানে ডিগ্রী লাভ করেন। পরে দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভের জন্য মরোয়া কেইন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

আন্দ্রে মরোয়া নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, "আমি লিখতে চাইতাম; কিন্তু লিখতে পারবো কিনা তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলাম না। বাবা ছিলেন শিল্পপতি। শিক্ষা সমাপনান্তে আমি তাঁর কারখানায় প্রবেশ করি এই ছিল পিতার ইচ্ছা। আমি তখন দর্শনের ছাত্র। এলঁ ছিলেন আমার অধ্যাপক। আমার জীবনের উপর এই অধ্যাপকের প্রভাব সবচাইতে বেশী। আমি তাঁর শরণার্থী হলাম। পিতার নির্দেশ পালন করার জন্য তিনি আমাকে উপদেশ দেন এবং বলেন, আগে কোন একটা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করো, দায়িত্ব উপলব্ধি করো এবং বাঁচার ব্যবস্থা করো। যদি লিখতেই চাও তবে এগুলো তোমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।'

'এলঁ খ্যাতনামা লেখক। আমার উপর তাঁর প্রভাব সবচাইতে বেশী। ফরাসী ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রাঁসের পুস্তকাবলী, ফরাসী ক্লাসিক সাহিত্য এবং বৃটিশ লেখক কিপলিং-এর রচনাও আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিপলিং-এর মতবাদ আমাকে আকৃষ্ট করে।'

'আঠারো বৎসর থেকে ছাব্বিশ বৎসর বয়সকাল অবধি আমি আমার

পিতার কারখানায় নিযুক্ত থাকে। এ সময়ে ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। আমি ইংরেজী জানতাম বলে আমাকে বৃটিশ বাহিনীতে প্রথমে দোভাষী এবং পরে সংযোগ অফিসারের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত থাকাকালে আমি আমার নিজের তৃপ্তির জন্য লিখতে আরম্ভ করি এবং আজীবন আমি নিজের আনন্দের জন্যই লিখেছি। যা দেখতাম তাই লিখে যেতাম। কিন্তু লেখা প্রকাশের বাসনা তখনও আমার মনে জাগে নি। আমার সহকর্মী জনৈক ফরাসী সামরিক কর্মচারী আমার সেই রচনাগুলো পাঠ করেন। আমি ওগুলো প্রকাশ করি না কেন তিনি এ প্রশ্ন করলে আমি বলি যে, কোন প্রকাশকের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তখন তিনি নিজেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্যারি যান এবং অনতিবিলম্বেই তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এটিই আমার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক যার নাম 'লা সাইলেন্সেস দ্য কর্ণেল ব্র্যাম্বেল।'

১৯১৯ সালে বইটির ইংরাজী অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দ্রে মরোয়াঁর খ্যাতি ফরাসী দেশের বাইরে বহত্তর দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পুস্তকটির চাহিদা তিরিশ দশকোত্তরকালেও অব্যাহত ছিল। আমরা পুস্তকটি তিরিশের দশকেই পাঠ করি। এরিখ্ মারিয়া রেমাকের 'অল কোয়াইট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'-এর মতোই ব্যাপক প্রচার লাভ করে মরোয়াঁর এ-পুস্তক।

এই অপ্রত্যাশিত সাফল্য মরোয়াঁকে বিশেষভাবে প্রেরণা দেয়। তিনি পিতার কারখানা ত্যাগ করে লেখাকেই জীবনের একমাত্র বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন।

আঁদ্রে মরোয়াঁ প্রথমে ঔপন্যাসিকরূপে খ্যাতি লাভ করলেও জীবনী রচনায়ই তিনি তাঁর চূড়ান্ত শৈল্পিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর পথ প্রদর্শক লিটন স্ট্র্যাচি। মরোয়াঁর রচনায়ও স্ট্র্যাচির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ্যারিয়েল নামে ইংরেজ কবি শেলীর জীবন-কাহিনী রচনায় মরোয়াঁ যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন তার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। এ্যারিয়েল পাঠ করলে মনে হয়, জীবনী অধ্যয়ন করছি না, উপন্যাস পড়ছি। বস্তুতঃ জীবনীকে উপন্যাসরূপে উপস্থিত করা এবং উপন্যাসকে জীবনীরূপে উপস্থিত করার মধ্যেই মরোয়াঁর শিল্প-সাধনার সত্যিকার পরিচয় মেলে।

তবে শেষোক্তের চাইতে প্রথমোক্ত বিষয়েই তিনি অধিকতর দক্ষতা অর্জন করেন। জীবনী রচনার স্ট্র্যাচি প্রবর্তিত এই নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি তাঁর কোন লেখায় বলেছেন যে, 'খোঁজ করলে প্রত্যেকটি ইতিহাস-খ্যাত ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধেই কিছু না কিছু নতুন তথ্য পাওয়া সম্ভব। পূর্বের জীবনীকাররা সেগুলো অনুল্লেখযোগ্য বিবেচনায় বর্জন করে গেছেন; কিন্তু মুক্ত মনে বিচার করলে হয়ত দেখা যাবে, সেই উপেক্ষিত তথ্যের মধ্যেই, যার সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে, তার সত্যিকার মানবিক স্বভাবের সাক্ষ্য বিদ্যমান'।

মরোয়াঁর প্রকাশভঙ্গী অত্যন্ত রোমান্টিক সন্দেহ নেই; কিন্তু এই রোমান্টিকতার মধ্যে তাঁর সংবেদন ও সহানুভূতিশীল মহৎ শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত জীবনী পড়তে পড়তে অনেক সময় মনে হয় তিনি যেন পরমাত্মীয়ের বিয়োগ শোক কুন্দ হৃদয়ের ভাষায় কথার মালা গেঁথে যাচ্ছেন। সাগর-বুকে শেলীর যাত্রা এবং আর ফিরে না আসার বিবরণ পাঠ করার সময় হিমরক্ত নৈয়ায়িক পাঠকের পক্ষেও অশ্রুসংবরণ করা কঠিন হয়।

আরম্ভেই পাঠককে আকৃষ্ট করার কৌশল মরোয়াঁ যে কতটা আয়ত্ত করেছিলেন নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইতালীয় কবি গিয়াকমো লিওপার্ডির উপর লিখিত মরোয়াঁর রচনাটির আরম্ভ এই:

"মুসে-এর রচনা পল ভ্যালেরির ভালো লাগতো না। তাঁর মতে ফোঁপানি গান নয়, বরং গানের ঠিক বিপরীত বস্তু। তার কথা অকাট্য। সঙ্গীত মাত্রই সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল। কিন্তু সঙ্গীতের এই নিয়মশৃঙ্খলের মধ্যে যখন আহাজারির সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়, তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে কবি প্রকাশ করেছেন এবং কোন সাফল্যের শিখরে অধিকৃত—তাঁর রচনাও মহান। হৃদয়াবেগ প্রকাশের, কবিতা স্মৃতি মন্থন করে স্থির মহিমায় বর্ণিত আবেগ। প্রথমে চাই জীবনের অভিজ্ঞতা এবং আবেগ। তারপর সেই আবেগ ও অনুভূতি আত্মস্থকরণ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আত্মস্থ অভিজ্ঞতা ও আবেগ শব্দ-সুষমার সাথে প্রকাশ করা। এ হচ্ছে অতীতকে ফিরে পাওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা। লিওপার্ডির কবিতার তাৎপর্যও তাই।"

লক্ষণীয় যে, মরোয়াঁ এখানে কয়েকটি বাক্যে সঙ্গীত ও কাব্য সম্বন্ধে মুসে, পল ভ্যালেরি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতামত এবং প্রকৃতের শিল্প-কৌশলের প্রতি

পাঠকের মনোযোগ অত্যন্ত সহজ স্বচ্ছন্দতার সাথে আকর্ষণ করেই শুধু ক্ষান্ত হন নি, উপরে উক্ত চার ব্যক্তির মতামত ও শিল্পকৌশলের মূল্যও যেন তর্কাতীত এমন একটা ছাপও রেখে যাচ্ছেন তার মস্তিষ্কে। যে দু'টি পদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রবন্ধটি আরম্ভ করেছেন তার তাৎপর্যও কম নয়। মরোয়াঁ এমন একজন কবির পরিচয় দিতে যাচ্ছেন যার কোন স্বাভাবিক দৈব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। সুতরাং তার কাব্যও নৈরাশ্যপূর্ণ। মুসে-এর পংক্তি দু'টিতে 'নৈরাশ্যের গানকে' সবচাইতে সুন্দর বলা হয়েছে। গিয়াকোমো লিওপার্ডি সারাজীবন সেই নৈরাশ্যের গানই গেয়েছিলেন, কিন্তু তা সঙ্গীত না হয়ে হলো একান্ত কাব্য। পংক্তি দু'টি বেছে নিয়ে মরোয়াঁ এ কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন। [illegible]—এই সহজ এবং অকাট্য কথাটিকে শৈল্পিক সৌন্দর্য দিয়েছেন। আবার এই উদ্ধৃতি দিয়ে স্মৃতিকে জীবন্ত করে তুলে তার মধ্যে আনন্দ পাওয়া এবং [illegible] চেষ্টা করেন কথা ফরাসী লেখক প্রুস্ত তার [illegible] গ্রন্থে। মরোয়াঁ লিওপার্ডির নাম উল্লেখ করবার অব্যবহিত পরে ঐ লেখকের নাম পাঠকের কাছে উপস্থিত করে লিওপার্ডি ও প্রুস্তের মনন ও ব্যক্তিগত জীবনের সাদৃশ্য অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত করেছেন। এরপর তো, চারজন বিশ্ববিখ্যাত লেখকের সাথে তুলনার পর ইতালীয় কবি লিওপার্ডি সম্বন্ধে লিখিত রচনার পরবর্তী অংশ নিয়মিত পাঠ করবার আগ্রহ বিদগ্ধজনের মনে জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অথচ, বিস্ময়কর বিষয় এই যে, মরোয়াঁর উদ্ধৃতাংশ পাঠ করলে প্রথমে মনেই হয় না, তিনি এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ অনুচ্ছেদটি লিখেছেন। এখানেই তাঁর জীবনী রচনার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য তিনি প্রায় সর্বত্র রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। যাঁর সম্বন্ধে লিখছেন, তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেবার সময়ও তাঁকে যথেষ্ট সজাগ ও সাবধান দেখা যায়। সচরাচর উদ্ধৃতি তিনি ব্যবহার করেছেন খুবই কম এবং উদ্ধৃতির বাহুল্যে কখনও রচনাকে ভারাক্রান্ত করেন নি।

আঁদ্রে মরোয়াঁ তাঁর ৮২ বৎসরের জীবনে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিরিশটির বেশী গ্রন্থ ইংরেজিতেই পাওয়া যায়। জীবনীর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এ্যারিয়েল, তুর্গেনিভ, ভলতেয়ার, বিয়, লেয়টি ডিসরাইলী প্রভৃতি।

আর্ট অব রাইটিং এবং আর্ট অব লিভিং তার অন্য দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং সর্বজন প্রশংসিত গ্রন্থ। প্রথমোক্ত গ্রন্থের প্রথম লেখা 'দ্য রাইটার্স ক্রাফট' বা লেখকের শিল্প-কৌশল এমন একটি অতুলনীয় রচনা যা যে কোন নতুন লেখকের জন্য অবশ্য পাঠ্যরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই গ্রন্থে সংযোজিত গোটে, রুশো, ভলতেয়ার, প্রুস্ত, লিওপার্ডি, ফ্লবেয়ার, বালজাক, স্তাঁদাল, চেকভ, গগোল, টলস্টয় প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত লেখকের উপর রচিত তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ রসোত্তীর্ণ এবং যে কোন সাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

অক্সফোর্ড, এডিনবরা, সেণ্ট এণ্ড্রুজ, প্রিন্সটন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় মরোয়াঁকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেন। মরোয়াঁ ফরাসী একাডেমী এবং লিজিয়ন অব অনারেরও সদস্য ছিলেন। ফরাসী দেশে সাহিত্যিকের এর চাইতে বড় সম্মান আর নেই।

[দৈনিক বাংলা]

বাংলার মহাকাব্য ফজলুল হক

দরিদ্র বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারে জন্মদিন পালিত হতো না ঃ জন্ম তারিখই লিখিত থাকতো না, তার আবার জন্মদিন। এখনও বাংলার সহস্র সহস্র গ্রামে, শহরের শত শত বস্তিতে প্রতিদিন অসংখ্য শিশু জন্মগ্রহণ করে, কেউ তাদের জন্ম তারিখ লিখে রাখে না। জন্ম যেমন অনুল্লেখ্য, মৃত্যুও তাদের তেমনি অলক্ষিত। এমন কি আত্মীয়-পরিজনেরাও কিছুদিন পরেই অনুপস্থিত লোকটিকে যে একদিন তাদের মধ্যে বিচরণ করতো, কাজ-রোজগারে এবং আনন্দ-নিরানন্দে অংশ নিত, তাকে বেমালুম ভুলে যায়। তৃতীয় পুরুষে নামটিও মুছে যায়। এটাই মহা নৈসর্গিক জগতের রীতি, এটাই জৈবধর্ম। বাংলার দরিদ্র মুসলিম সমাজের সকল বংশধরের জীবনে এই নিষ্ঠুর পরিণতি অতিক্রম করতে পারে নি।

ইদানীং নগরে-বন্দরে উচ্চবিত্ত সমাজে ইংরেজী রীতিতে জন্মদিন প্রতিপালিত হতে দেখি। কেক কাটা, ফুঁ প্রস্তাব করা, খানাপিনা ও হৈ হল্লোড় করা, সঙ্গীতের আসর না হলেও অন্ততঃ বাছাই করা রেকর্ড বাজানো ইত্যাদি অনেক কিছু অনুষ্ঠান এবং আমন্ত্রিতদের শুভেচ্ছার নিদর্শনসমূহের মধ্যে জন্মদিনের উৎসব শেষ হয়। যার জন্মদিন পালিত হলো, সে হয়ত এই ভেবে সুখবোধ করে যে, পরিবারের মধ্যে এবং বৃহত্তর সংসারে সে অনুল্লেখযোগ্য লোক নয়—সেও একটি স্মরণীয় স্তম্ভ—এক কথায় কেউকেটা। তবু এ ত সত্য নয়। যাদের জন্মদিবস পালিত হয় তারাও একদিন বাংলার দরিদ্র চাষী মজুরের মতোই বিস্মৃতির সমুদ্রে তলিয়ে যায়, পরবর্তীরা তাকে স্মরণ করে না এবং ক্রমে তার নামও ভুলে যায়। সুতরাং জন্মের দিন-তারিখ লিখিত হোক বা না হোক, জন্মদিন আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। টোস্ট, ভোজ সভা, উৎসব, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা কোনটাই বিগতপ্রাণ মানুষের স্মৃতিকে

পরবর্তীদের মধ্যে সতত জাগ্রত রাখে না। নশ্বরদেহের সাথে সাথে তার নামও লোপ পায়।

এই স্বাভাবিক রীতির যারা ব্যতিক্রম তারা ইতিহাসের মানুষ। কর্ম চির-স্থায়ী সাক্ষীরূপে সতত দণ্ডায়মান থেকে তাদেরকে মানব জাতির ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখে। এই মানুষও আবার দু'প্রকার—সু-মানুষ এবং কু-মানুষ। পাইকারীভাবে নরহত্যা, লুণ্ঠতরাজ এবং অত্যাচার-অবিচার দ্বারা যারা প্রভুত্ব বিস্তার করে, রাজ্য ও রাষ্ট্র স্থাপন করে তাদের নামও ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু মানবসমাজ ঘৃণার সংগে তাদের নাম উচ্চারণ করে। চেঙ্গিস, হালাকু, হিটলার, মুসোলিনী ঐতিহাসিক মানুষ, কিন্তু ঘৃণ্য মানুষ। পরবর্তীদের চিত্তে তারা স্নেহমায়া-মমতা এবং আত্মীয়তা-বোধ জাগ্রত করে না। কুকীর্তি সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থেকে ওদেরকে মানব সমাজের শত্রুরূপে চিহ্নিত করে রাখে।

পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত প্রভুত্ব বিস্তারের কল্পনাও মনে স্থান না দিয়ে যাঁরা সমগ্র সমাজের কল্যাণের পথকেই একমাত্র অনুসরণীয় পথরূপে বেছে নেন, যাঁরা আপন সত্তাকে সমাজ সত্তার মধ্যে বিলীন করে দিয়ে সমগ্র সমাজের উন্নতি-অবনতিকে নিজের উন্নতি-অবনতিরূপে বরণ করে নেন এবং আপামর জনসাধারণের জীবন ও জীবিকাকে সুন্দর ও সহজ করার কার্যে আত্মো-নিয়োগ করেন তাঁরা সুমানুষ। তাঁরা শুধু ইতিহাসের নির্জীব পাতায় নয় পুরুষ পুরুষানুক্রমে মানুষের অন্তরে এই পৃথিবী-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র যতটা অবিনশ্বর ঠিক ততটা অবিনশ্বর হয়ে, সদাজাগ্রত থাকেন। তাঁরা মানব সমাজের সততঃ অত্যুজ্জ্বল দীপশিখা; তাঁরা পরবর্তীদের পথের দিশারী, তাঁরা অর্ণবপোত যাত্রীর আলোকস্তম্ভ।

আবুল কাসেম মোহাম্মদ ফজলুল হক মুসলিম বাংলার তেমনি একজন মহাপুরুষ। বাংলার ঘরে ঘরে তিনি তাঁর সংক্ষেপিত স্বাক্ষর এ, কে, ফজলুল হক-রূপে পরিচিত ছিলেন এবং থাকবেন। তাঁর জন্ম কবে হয়েছিল, কবে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন, এসব কথা ইতিহাসে বিধৃত থাকবে—স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার জন্য তা মুখস্থ করবে। কিন্তু ফজলুল হকের জীবনে এটা কোন বড় কথা নয়: আরো বহু লোকের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ছাত্র-ছাত্রীরা মুখস্থ করে এবং ভবিষ্যতেও করবে। ফজলুল হকের জীবন স্মরণীয়

প্রমাদ গণতো। কে দেবে তাকে সেই প্রয়োজনীয় প্রশংসাপত্র যার মধ্যে লেখা থাকবে "আমি — — জেলার — — থানা ও গ্রাম নিবাসী — — এর পুত্র — — কে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। সে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ও সচ্চরিত্র। তাকে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা যায়।" ফজলুল হকই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি নির্দ্বিধায় এই প্রশংসাপত্রটি সকল প্রার্থীকে অকাতরে বিতরণ করতেন। হয়ত প্রশ্ন উঠবে, সেকালে একমাত্র ফজলুল হক ব্যতিরেকে আর কি কোন কৃতবিদ্য সম্মানী পুরুষ মুসলিম বাংলায় ছিলেন না, যিনি বা যাঁরা কলকাতার পথে পথে রুজি-রোজগারের ধান্ধায় বিচরণরত দরিদ্র-শিক্ষিত মুসলমান যুবকদিগকে 'নগণ্য' সাহায্যটুকু করতে পারতেন? যথার্থ প্রশ্ন। এবং তার উত্তর: ছিলেন—অগণিত না হলেও বেশ কিছু সংখ্যক ছিলেন। কিন্তু তিক্ত হলেও এটা সত্য যে, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাস্তবিকপক্ষেই সম্ভ্রান্ত। তাঁরা প্রায় সকলেই উর্দু বা ইংরেজিতে কথা বলতেন। গ্রাম বাংলা থেকে আগত অমার্জিত যুবকগণের পক্ষে তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়াটাই ছিল দুরূহ ব্যাপার। উর্দী-পরা দারোয়ান বা চাকর-বাকরদের ব্যূহ ভেদ করে কখনও কেউ সেইসব সম্ভ্রান্ত নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হলেও প্রথমেই তাকে বিজাতীয় ভাষায় কঠিন জেরার সম্মুখীন হতে হতো। কম্পিত দুরু দুরু বুক যুবক অনেক সময় নেতার প্রশ্ন বুঝতেই পারতো না; কিংবা বুঝলেও শুদ্ধ বিজাতীয় ভাষায় উত্তর দিতে পারতো না। অনেকে আবার "তোমাকে চিনি না. কেমন করে তোমার সচ্চরিত্রতা এবং আভিজাত্যের জামিন হবো আমি"? বলে সদন্তে অন্দরে চলে যেতেন। সুতরাং দ্বিতীয় প্রশংসাপত্রটিও ফজলুল হকের প্রশংসাপত্রটি দেখিয়ে সংগ্রহ করার চেষ্টা চলতো। অনেক পরে আসামের আবদুল মতীন চৌধুরী নির্দ্বিধায় এই সামান্য সাহায্যটুকু করতেন। এখন চিন্তা করুন, মুসলিম বাংলার কি দুর্দিন ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারটি দশকে! •

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যথাক্রমে আধুনিক বাংলা কাব্য এবং বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়ে থাকে। ফজলুল হক কাব্য করেন নি, গদ্য সাহিত্যও তিনি রচনা করেন নি: কিন্তু তবু তিনি এমন একটি মহা-কাব্যের রচয়িতা যা তাঁকে বাঙ্গালী হৃদয়ে সততঃ জাগ্রত রাখবে। তিনি বাঙ্গালী মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের প্রায় একক নির্মাতা। তিনি

আপামর বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের চেতনা দাতা। মা যেমন করে চামচের দুধে শিশুকে সবল করে তোলেন, ফজলুল হকও তেমনি করে ক্রমে ক্রমে বাংলার দরিদ্র চাষী-মজুর শ্রেণীকে তাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলেন। ফজলুল হক তাঁর জীবনকালে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা স্থাপন করেন, বহু শোষণ-বিরুদ্ধ কল্যাণকর আইন কানুন প্রবর্তন করেন—যার মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন এবং ঋণ-সালিসী আইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কিন্তু এগুলো তাঁর জীবনের একটি মহৎ দিক হলেও, প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক: তিনি বাংলার নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত নির্যাতিত মানুষের তিনি ছিলেন সরব প্রতিনিধি।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ভুল-ভ্রান্তি ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। এ অভিযোগও অনেকে উত্থাপন করতে পারেন যে, তিনি সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতেন না; অন্যকথায় ইংরেজিতে যাকে বলে স্টেটস-ম্যান—তিনি তা ছিলেন না। কোন মানুষের জীবনই ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। ফজলুল হকও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

কিন্তু এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন। শুধু কামনা করেই ক্ষান্ত হতেন না, সাধারণ মানুষের কল্যাণকর সমস্ত কার্যের তিনি ছিলেন প্রবক্তা, উদ্যোক্তা এবং পরিচালক। তাঁর রাজনৈতিক খ্যাতি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে ছিল বাংলার অত্যাচারিত-দারিদ্র-নিষ্পেষিত-মজলুম জনসাধারণের হিতার্থে কৃত কার্যাবলী। তিনি জনসাধারণকে ভালোবাসতেন, জনসাধারণও তাঁকে ভালোবাসতো। এই পারস্পরিক ভালোবাসা ও আত্মীয়তাবোধের গভীরতা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। রাজনৈতিক খ্যাতি ও ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেও তিনি জনসাধারণকে ভুলেন নি। জনসাধারণও তাঁকে তাঁর সর্বাপেক্ষা দুর্দিনেও ত্যাগ করে নি।

তাঁর জয়-পরাজয় বাংলার সাধারণ মানুষের জয়-পরাজয়। তাঁর প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা। আজ দিকে দিকে যে গণচেতনার জোয়ার দেখে আমরা বিস্মিত বিমূঢ় তা ফজলুল হকেরই অবদান। তিনি জনসাধারণের কাছ

থেকে প্রেরণা নিয়েছেন এবং জনসাধারণকে প্রেরণা দিয়েছেন।

ফজলুল হকের জীবন বাংলার সমাজ জীবনের মহাকাব্য। আজ তাঁর মৃত্যুদিনে এই জীবনময় মহাকাব্যের যত গভীরে যাই, ততই বিস্মিত হই। কাবুলী-উত্তমর্ণ পরিবৃত কালো আচকান ও তুর্কী টুপিধারী উন্নত শির, প্রসারিত বক্ষ, ইয়োরোপীয়ান এসাইলাম লেনের জীর্ণ ভাড়াটে বাড়ীর অধিবাসী ফজলুল হককে কি কোনদিন ভুলতে পারি?

[ইত্তেফাক—২৭. ৪. ৭০]